বিপ্লব দাশগুপ্ত

আফ্রিকা

বইমেলা.net

'কিলিমাঞ্জারোর দেশে' অনেকের ভালো লেগেছে। ওরাই আমাকে বাধ্য করলেন আফ্রিকা নিয়ে এই নতুন বই লিখতে। 'বাধ্য' বলাটা অবশ্য আদপেই ঠিক নয়। ভ্রমণ কাহিনী লেখা মানে পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া আমি ভ্রমণ কাহিনী লিখি আর একবার বেড়িয়ে আসার সেই আনন্দটা পাবো বলে।

এই বইটি পশ্চিম আফ্রিকার চারটি দেশ নিয়ে—নাইজিরিয়া, ঘানা, আইভরী কোষ্ট, সেনেগাল—যেখানে ১৯৪৪-৪৫ সালে যাই। পশ্চিম আফ্রিকায় আরো বহু দেশ আছে, তবু এই চারটি দেশে এখানকার মানুষের এবং প্রকৃতির সবরকম বিশেষত্ব আর সমস্যাই রয়েছে। নানা কারণে আমার কাছে পশ্চিম আফ্রিকাই আসল আফ্রিকা। দুপাশে আটলান্টিক, উত্তরে সাহারা, পূর্বে পাহাড় আর জঙ্গল, এখানকার সভ্যতা হাজার বছরের পুরনো, এখানে আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষের বাস। এখানে ব্রাস, কাঠ এবং হাতীর দাঁতের শিল্পের এক স্বতন্ত্র ধারা। এখানকার মানুষগুলো সুন্দর—সমস্ত সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ সত্ত্বেও।

নাইজিরিয়া ও সেনেগালের অংশ দুটি সংক্ষিপ্তভাবে ইতিমধ্যেই শারদীয়া 'প্রতিক্ষণ' ও 'যুব মানস-এ প্রকাশিত হয়েছে। দুটি শুধু এই বইয়ের জন্যই লেখা।

স্বপ্না দেব দেবেশ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, সৌমেন সেন, পবিত্র সরকার, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, রাজীব নিয়োগী, দীপক ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে পণ করেছেন যে আমাকে সাহিত্যিক না বানিয়ে ছাড়বেন না।

এই বইয়ের ফটোগুলির বড় অংশ পেয়েছি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কেন্দ্রীয় রোম অফিসের ফটো-লাইব্রেরী থেকে ওদের ধন্যবাদ। আমার তোলা ছবি সামান্য এবং পাতে দেবার মতো নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আরবান ইকনমিক স্টাডিজের ডঃ শুক্লা ভাদুড়ী মানচিত্র দুটি এঁকেছেন—তাকেও ধন্যবাদ।

বিপ্লব দাশগুপ্ত

এই বইয়ের ফটোগুলি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কেন্দ্রীয় রোম অফিসের ফটো-লাইব্রেরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দুপাশে আটলান্টিক, উত্তরে সাহারা, পশ্চিমে পাহাড় আর জঙ্গল—এরই মধ্যের অংশটা পশ্চিম আফ্রিকা। অনেকে বলবেন এটাই আসল আফ্রিকা। এখানকার সভ্যতা দু হাজার বছরের পুরনো, বহু সাম্রাজ্য এখানে গড়েছে ভেঙেছে। কাঠের কারুকার্যের জগতজোড়া নাম, যেমন নাম হাতীর দাঁত আর ব্রাসের তৈরি হাতের কাজের। সমস্যা অনেক। সেটসী এক বড় আতংক। যুগসন্ধিক্ষণের ঘূর্ণাবর্তে গ্রাম ভাঙে মহানগরী গড়ে ওঠে। গৃহযুদ্ধের বিষ অন্ধ করে মানুষের চেতনা। এরই মধ্যে মানুষ বাঁচে, সমাজ চলমান হয়। এই ভ্রমণ কাহিনীর ভিত্তি ওই মানুষগুলো, ওদের সমাজ সংস্কৃতি অনুভূতি দুঃখ, বা উপকূল জঙ্গল, ঘাসের বন আর কাঁটা-গাছের ঝোপকে ঘিরে সচল।

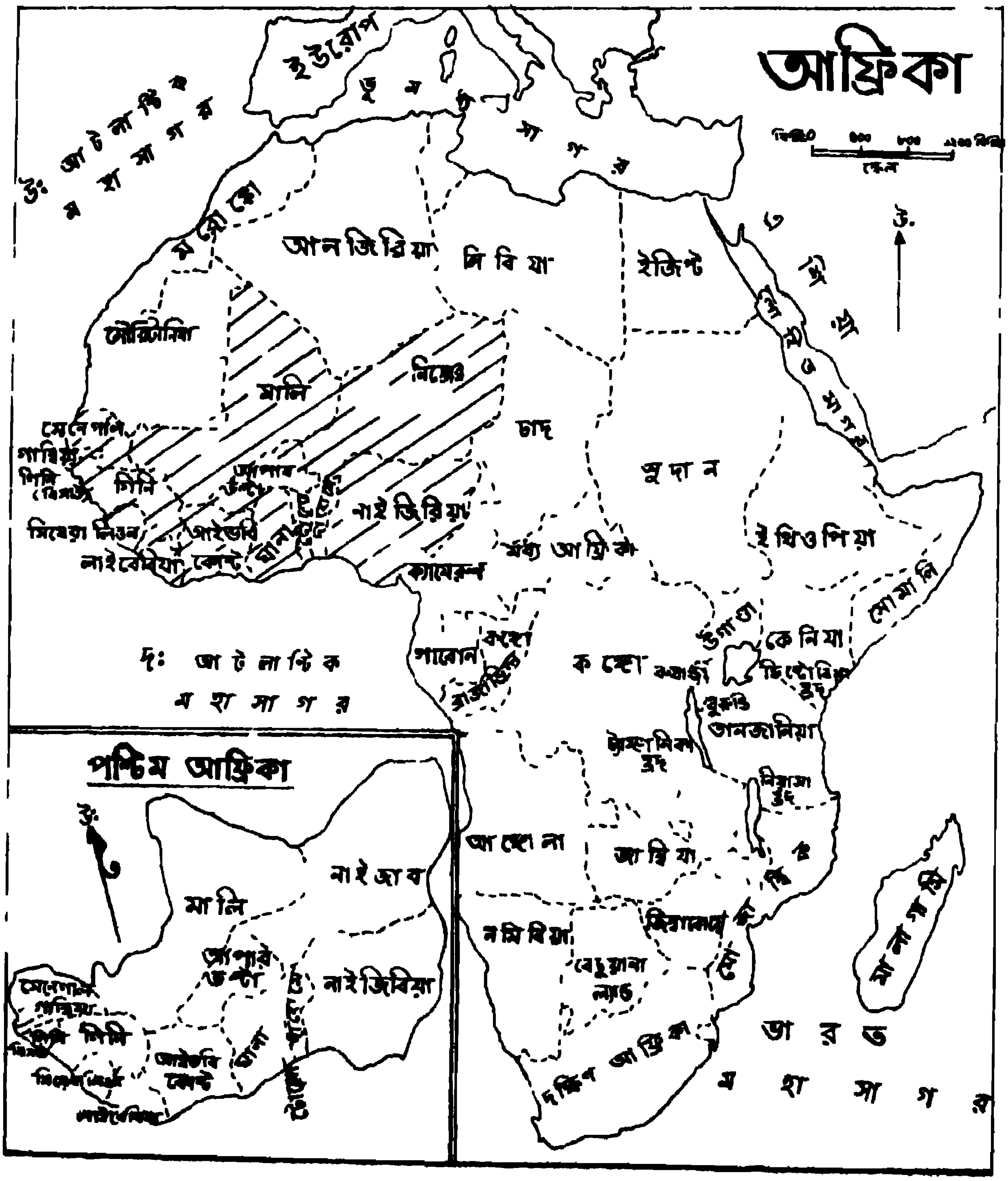
আফ্রিকা
ইউরোপ
উঃ আটলান্টিক মহাসাগর
মরক্কো
আলজিরিয়া
লিবিয়া
ইজিপ্ট
মৌরিতানিয়া
মালি
চাদ
সুদান
সেনেগাল
গিনি
সিয়েরা লিওন
লাইবেরিয়া
কামেরুন
মধ্য আফ্রিকা
সোমালি
কেনিয়া
গাবোন
কঙ্গো
দঃ আটলান্টিক মহাসাগর
তানজানিয়া
নামিবিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর
পশ্চিম আফ্রিকা
মালি
নাইজার
নাইজিরিয়া

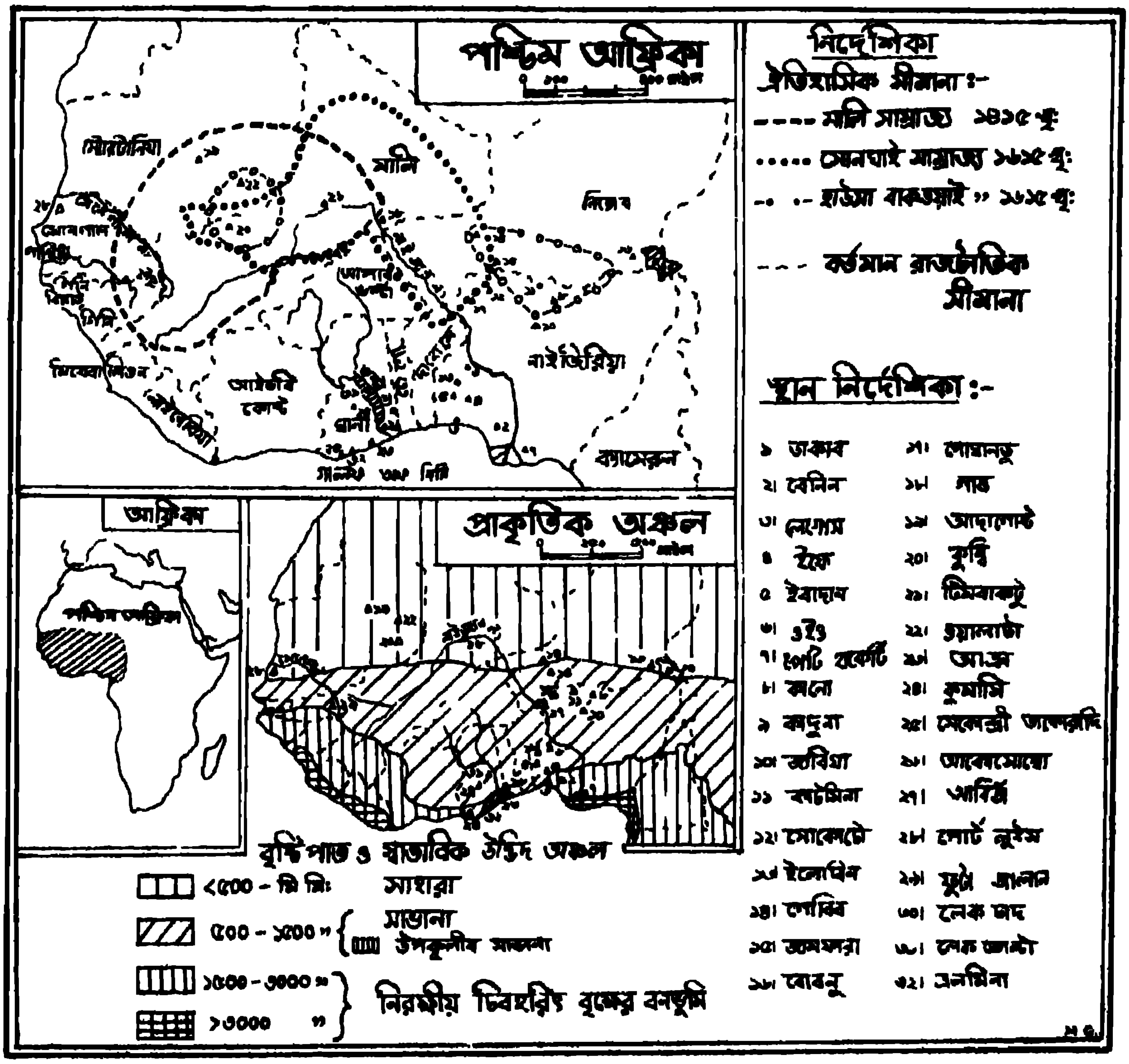
পশ্চিম আফ্রিকা
মৌরিটানিয়া
মালি
নাইজার
নাইজিরিয়া
আইভরি কোস্ট
ঘানা
সিয়েরা লিওন
লাইবেরিয়া
ক্যামেরুন
গিনি
আফ্রিকা
পশ্চিম আফ্রিকা
প্রাকৃতিক অঞ্চল
নির্দেশিকা
ঐতিহাসিক সীমানা:-
---- মালি সাম্রাজ্য ১৪১৫ খৃ:
..... সোনঘাই সাম্রাজ্য ১৬১৫ খৃ:
-. .- হাউসা রাজ্যগুলি ,, ১৬১৫ খৃ:
--- বর্তমান রাজনৈতিক সীমানা
স্থান নির্দেশিকা:-
১ ডাকার
২। বেনিন
৩। লেগোস
৪ ইফে
৫ ইবাদান
৭। পোর্ট হার্কোর্ট
৮। কানো
৯ কাদুনা
১০। জারিয়া
১১ কাটসিনা
১২। সোকোটো
১৩ ইলোরিন
১৬। বোরনু
১৮। গাও
২০। কুম্বি
২১। টিম্বাকটু
২২। ওয়ালাটা
২৩। আক্রা
২৪। কুমাসি
২৫। সেকেন্ডী তাকোরাদি
২৭। আবিজাঁ
২৯। ফুটা জালন
৩০। লেক চাদ
৩১। লেক ভোল্টা
৩২। এলমিনা
বৃষ্টিপাত ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল
<২৫০ - মি মি: সাহারা
২৫০ - ১৫০০ ,, সাভানা
উপকূলীয় সাভানা
১৫০০ - ৩০০০ ,,
>৩০০০ ,,
নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি

॥ এক ॥

সামনের ঢেউটার দিকে তাকিয়ে জগদীশকে বললাম, "লাফাও।" কিন্তু ঠিক করে বলবার আগেই দুরন্ত লোকোমোটিভের মতো বিরাট জলের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম। কতোবার ডিগবাজি খেলাম জানি না। শুধু জল আর জল—কানে তালা লাগবার মতো ভীষণ শব্দ। মনে হলো যেন ওই বিপুল জলস্রোতেই চিরকালের মতো হারিয়ে গেলাম। ঠিক তখনই পায়ে বালি ঠেকলো। কোনমতে হাতে পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম। ঢেউ ততক্ষণে আমাকে ওখানেই রেখে পারের দিকে ছুটে গিয়েছে।

সমুদ্র স্নানের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। কিন্তু সব সমুদ্র এক নয়। ব্রাইটনের সমুদ্র শান্ত, যদি না ঝড় ওঠে। ওখানের ছোট ছোট ঢেউতে প্রায় সুইমিং পুলের মতোই সাঁতার কাটা যায়। অথবা চিৎ হয়ে হাত পা না নেড়ে চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ ভেসে থাকা যায়। সমুদ্রের জল নাকে ঢুকলে অবশ্য অস্বস্তি। কিন্তু ঢেউগুলো সাধারণত সামান্য ওপরে তুলে আবার আলতো করে নীচে নামিয়ে রেখে চলে যায়। শীতকালে পুরীর বা বোম্বের সমুদ্রও এইরকম হতে পারে কখনো কখনো।

অধিকাংশ সমুদ্রেই অবশ্য সেই বিলাসিতার সুযোগ নেই। ঢেউ যখন আসে তখন ঢেউয়ের তালে নাচতে হবে বা জোরে ডাইভ দিয়ে ঢেউ ফুঁড়ে ওপাশে চলে যেতে হবে। দরকার কিছুটা সাহস—কিন্তু সমুদ্রকেও বুঝতে হবে। সমুদ্র যেন আধপোষা বন্য জন্তু। কখনো হাত থেকে খাবার খাবে আদর খাবে কখনো বা আদিম হিংস্রতার রূপ নেবে। সমুদ্রকে তাই বিশ্বাস নেই।

পুকুর আর সুইমিং পুল, নদী আর সমুদ্র, চৌবাচ্চা আর রাস্তার কল, বাথটব আর সাওয়ার। স্নানের কতরকমের ব্যবস্থা। তবু বলবো সমুদ্রে স্নানের মতো কোন কিছু হতে পারে না। একটার পর একটা যখন ঢেউ আসে, গায়ের ওপর ভেঙ্গে পড়ে বা ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, তখন শরীরের প্রতিটি কণায় বা শিরায় যে অনুভূতির বিদ্যুৎ চমক আনে তার জুড়ি কোথায়?

বিশেষ করে যখন সেই সমুদ্র আটলান্টিক। স্থানটা যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, বিষুব রেখার কিছুটা উত্তরে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সেনেগালের রাজধানী ডাকারের থেকে ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে।

জগদীশ-বীণার সঙ্গে আগেই চুক্তি ছিল যে সম্মেলনের পরেই সমুদ্রে নিয়ে যেতে হবে। সেই মত আসা। অবশ্য ডাকারও সমুদ্রের ওপরেই। কিন্তু সেই সমুদ্রের বীচ স্নানের দিক দিয়ে বিশেষ ভালো না। বীণার ঝাঁপিতে লুচি, তরকারী, মাংস, সন্দেশ থেকে স্যাণ্ডউইচ কোকাকোলা সবকিছুই রয়েছে। সমুদ্রে যাওয়া মানে শুধু স্নান করা নয়, সারাদিনটা কাটানো, বেড়ানো। সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেই আমরা বেরিয়েছি।

আমি জানতাম এখানকার সমুদ্রের ঢেউ খুব বড়। কিন্তু এতোটা বিশাল যে হবে ভাবতে পারি নি। প্রথমে দেখে খানিকটা সন্দেহ ছিল এতো বড় ঢেউ সামলাতে পারবো কিনা। তারপর সাহস করে নেমেই ডিগবাজি খেলাম। জগদীশ ততক্ষণে বালি থেকে সামান্য দূরে হাঁটু জলে

দাঁড়িয়ে। ও আর এগুবে না।

তখনই চোখে পড়লো পাশের ওই দৃশ্য। সমুদ্র সৈকত প্রায় খালি। কিচির মিচির শব্দ আগেই কানে এসেছে। এখন দেখলাম ওই শব্দ পাখীর আলাপন নয়। প্রচুর কালো উলঙ্গ বাচ্চা—আট থেকে বারো বছর হবে, এবং অন্তত পঞ্চাশ ষাটজন—ওরা জলের মধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছে, গল্প করছে, চিৎকার করছে। এক একটা ঢেউ ওদের আকাশে তুলে দিয়ে তারপর সেখানেই নামিয়ে দিয়ে পাড়ের দিকে ছুটছে। ওদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। কালো না হলে দূর থেকে এক ঝাঁক ভেসে থাকা সী গাল বলে মনে হতে পারতো। আমাদেব দেশের গ্রামের ছেলেরা যেমন স্বচ্ছন্দে বালি মাখে বা ধূলো মাখে তেমনি ওরাও যেন জল মাখছে। এই সমুদ্রে স্পীড বোটের ভোঁ ভোঁ শব্দ নেই, জেলে নৌকোর সারি নেই, দূরে জাহাজ দেখলাম না। সমুদ্রের বালির ওপাশে কোন হোটেল নেই, এমনকি চায়েব দোকান বা ধাবা নেই। শুধু জামাকাপড় পাল্টাবার জন্য কিছু 'কটেজ'—তার ওপাশে নানা গাছের ঝোপ। প্রকৃতি এখানে নিজের রূপেই বিরাজমান—কোন কসমেটিক লাগে নি। ওখানে যেন আমরাই সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে সেজেগুজে স্নান করতে নেমে বেমানান। এই সমুদ্র ওই নগ্ন সোচ্চার বাচ্চাগুলোর।

কিন্তু বাচ্চাগুলোই আমাকে ওদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। দুজন দুহাত ধরলো, বাকিরা চারপাশে ভীষণ চিৎকার করে ঠেলে নিয়ে গেল বড় ঢেউয়ের মুখে। সেই ঢেউ কাটিয়ে আরো বড় ঢেউয়েব নাগরদোলায়। তারপর অবাক হয়ে দেখলাম আমিও স্বচ্ছন্দে আকাশে উঠে যাচ্ছি, আর চারপাশের বাচ্চাগুলোর মতোই ভীষণ জোরে চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়ছি। এ যেন শুধু সমুদ্রে স্নান নয়, আফ্রিকায় অবগাহন। ঢেউয়ের ধাবমান প্রাচীর ভেঙ্গে রাশি রাশি আফ্রিকার ফোয়ারা আমার শরীর আর মনকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

আফ্রিকা আফ্রিকা আফ্রিকা।

প্রথম কখন আফ্রিকার কথা শুনলাম স্মরণে নেই। তবে 'কাফ্রিদের' আগেই দেখেছি। খুব ছোটবেলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কোলকাতার রাস্তায় বেশ কিছু বিদেশী সৈন্য এবং মানুষ। তাদেরই একজন ওই মানুষটা—ভীষণ লম্বা, কুচকুচে কালো, নাক মুখ আমাদের থেকে আলাদা—দেখি ট্রাম থেকে নেমে দৌড়চ্ছে। পিছন পিছন ওকে ধরবার জন্য ছুটছে চার পাঁচজন 'গোরা সৈন্য'। ওই কালো মানুষ যেদিকে ছোটে সেদিকের লোকেরাই পড়িমড়ি করে পালায়। ওই লোকটার ভয়ে না পিছনের গোরা সৈন্যের ভয়ে জানি না। লোকটাও বা কেন ছুটছে জানা গেল না। ও কি ক্রিমিন্যাল বা আর্মি ডেজার্টার, না কোন মারামারির ব্যাপার, বা অন্য কিছু! বলা চলে কিছুই বুঝলাম না, জানলাম না—কিন্তু প্রথম আফ্রিকার মানুষ দেখলাম। এই কথাটাও নিশ্চয়ই ভুল, কেননা খুব সম্ভবত ওই মানুষটি আফ্রিকার নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মেজদার সঙ্গে যাচ্ছিলাম, মেজদা বললেন, "ওই লোকটা কাফ্রি।"

'কাফ্রি' কথাটা আজকাল কেউ বলে না—কিন্তু এক সময় খুব চালু ছিলো। 'নিগ্রো' কথাটা অবশ্য তখনও বলতো। এখনও বলে—তবে পরে জেনেছি কালোরা নিজেরা এই শব্দটা পছন্দ করে না। আমার ছোটবেলা কেউ কেউ ওদের 'হাবসী' বলতো। হাবসী কথাটা—আবিসিনিয়া (আজকের ইথিওপিয়া) থেকে এসেছে—কিন্তু আমাদের কাছে আফ্রিকার সমস্ত মানুষই ছিল হাবসী। হাবসী মানেই ছিল দাস, খোজা, নপুংসক—যাদের নপুংসক করা হতো সম্রাটদের হারেম পাহারা দেবার জন্য। সত্যিকারের পুরুষের মতো পুরুষ যারা চেহারায়—তারাই ছিল দাস, এবং পুরুষত্বহীন। কিন্তু সেই হাবসীরাই এক সময় বাংলার সিংহাসন কিছুদিনের জন্য দখল করতে পেরেছিল। আফ্রিকার মানুষ, দাস, নপুংসক, অথচ ভারতে সাম্রাজ্যের কর্ণধার—এ যেন

ভাবাই যায় না।

ছোটদের জ্ঞানের এক বড়ো উৎস ছোটরাই। আমাদের থেকে খানিকটা বড়ো ছনু একদিন রাস্তায় টেনিশ বল নিয়ে ফুটবল খেলার পর রোয়াকে গল্প করতে করতে বললো, "বুঝলি নিগ্রোরা খুব অসভ্য। ওরা ন্যাংটো থাকে। একদম কিছু পরে না। কাঁচা মাংস চিবিয়ে খায়, রান্নাবান্না করে না।"

"মাংস পায় কোথায় ? ওখানে কসাইর দোকান আছে ?" আমার নির্দোষ প্রশ্ন।

"দূর বোকা, তুই কিছুই জানিস না। ওখানে আবার দোকান থাকবে কি করে ? ওরা তো জঙ্গলেই থাকে। বাঘ ভালুকের মতোই থাকে।" চিনাবাদাম ঝাল নুনে মিশিয়ে মুখে দিতে দিতে ছনু বলে।

তখনো জানবার কথা নয় যে আফ্রিকায় ভালুক বা বাঘ নেই। আমাদের চেতনায় জঙ্গল মানেই ওই দুটো প্রাণী। আফ্রিকানরা যখন অসভ্য, জঙ্গলে থাকে, তখন নিশ্চয়ই ওই জন্তু জানোয়ারেরই মতো।

"কিন্তু জঙ্গলেই বা শোয় কোথায় ? ওদের কি বিছানা আছে ? বালিশ আছে ?"

"দূর পাগলা।" বিজ্ঞ ছনু আমার অজ্ঞতায় আরো খুশী, "ওরা গাছের ওপর ডাল আর পাতা দিয়ে বাড়ী বানায়, সেইখানে রাত্রে থাকে। সকালে নীচে নামে।"

"কিন্তু মাংস পায় কোথায় ?" আমার পুরনো প্রশ্নে ফিরে আসি।

ছনু নতুন একটা বাদামের খোসা ছাড়িয়ে খোসাটা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে বলে, "কেন, মাংস তো জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা গাছের ওপব বসে থাকে। গাছের তলা দিয়ে হরিণ গেলেই ঝাঁপিয়ে পডবে। তাবপব গলা টিপে মেরে দু হাত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।" ছনু বলে, এবং দেখায় কিভাবে দু হাত দিয়ে ধববে, ছিঁড়বে এবং মুখে পুরবে।

"যদি খাবাব না পায় ?"

ছনু এবাব চাবপাশে তাকায়, এবং একটু থেমে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "ওরা নবখাদক। ওবা মানুষ খায়। হরিণ না পেলে মানুষ হলেই ওরা খুশী।"

তবে কি ওবা বাক্ষস ? মহাভারতের বক বাক্ষসেব কাহিনী ততোদিনে বাবার কাছ থেকে শুনে আদ্যোপান্ত মুখস্ত। ওরা রাক্ষস, এই উপলব্ধির পর বুঝতে অসুবিধা হলো না, কেন সেদিন ট্রাম থেকে নেমে দৌড়নো ওই কালো লোকটাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছিল। সত্যিই তো, ভয় পাবারই কথা।

আর একটু বড হবার পর পাড়ার লাইব্রেরীর সভ্য হলাম। কিশোর বিভাগে। সেখানে নানা বই। ভোম্বল সর্দার, হোঁদল কুৎকুৎ, আবার যখের ধন, কালো ভ্রমর, রক্তলোভী নিশাচর। সঙ্গে আফ্রিকার ওপর কিছু বই। সিংহের গল্প, বন্য মোষের গল্প, শিকারীর গল্প। সেই সব গল্প পড়ে গা ছমছম করে। আফ্রিকা মানেই জঙ্গল ! সেই জঙ্গল এতো গভীর যে সূর্যের আলো ঢোকে না—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অসাবধান হলেই জঙ্গলে পথ হারাবে, হিংস্র জন্তুরা তখন টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সেই গল্প পড়ে যেমন ভয় পেতাম তেমনই আফ্রিকার প্রচণ্ড আকর্ষণ আমাকে টানতো। ভাবতাম বড়ো হলে ওই রকম শিকারীর মতো বুট পরে টুপি পরে জঙ্গলে যাবো, হাতে দোনলা বন্দুক, সঙ্গে বিশ্বস্ত আফ্রিকান কুলীরা এবং আরও বিশ্বস্ত শিম্পাঞ্জী।

শিম্পাঞ্জী অবশ্য চেতনায় পরে ঢুকেছে—নিশ্চয়ই টারজানের সিনেমা দেখে। এক সময় টারজান ছিলো আমার হীরো। নগ্ন পেশীবহুল দেহ, শুধু জাঙ্গিয়া পরা, কোমরে ছুরি, কিন্তু বিনা আয়াসে গাছের দড়িতে ঝুলে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে ঢুকছে, সিংহ-চিতাবাঘ-সাপ কারোকে ভয় পায় না। অনায়াসে সমুদ্রে ভেসে হাঙ্গরের সঙ্গে, অজগরের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

শিম্পাঞ্জী—চিয়া একই সঙ্গে বন্ধু, চর, দূত, খেলার সঙ্গী। আর আছে হাতীরা, টারজান গলা ছেড়ে আ-আ--- করে ডাকলেই হলো। দলে দলে ওরা জঙ্গল ভেঙ্গে নদী সাঁতরে আসবে টারজানের পাশে। যে বিপদে পড়ে টারজান তার সহায়। টারজান দুষ্টু লোকের দুষমন। টারজান আমার হীরো।

টারজানের আফ্রিকা সাদা মানুষের আফ্রিকা। কালোরা গৌণ। ওবা ভৃত্য, পার্শ্বচব, বা শত্রু—কিন্তু টারজানের সমান নয়। নগ্নদেহ, স্ফীত পেশী, পরম শক্তিশালী টারজান সাদা, জঙ্গলে থেকেও ঠিক জংলী নয়। আফ্রিকার মানুষ জংলী, যদি না সাদা মানুষ তাকে সাহায্য করে সভ্য হতে, জামা কাপড দেয়, আচার আচবণ শেখায়।

বোধহয় সুনির্মল বসুরই একটা বইতে ছিলো আফ্রিকানদের গান, যা এখনও মনে আছে :

হিতেল দিলো দম্বু চিরাক, দম্বু জম্বু হোয়াম বো।

হুদেল ভ্যাদাক, হুদেল ভ্যাদাক, দম্বু জম্বু হোযাম বো।

আফ্রিকানরা এই গান গেয়ে নৌকো বেয়ে চলতো। বোঝা গেল শুধু মানুষগুলোই অদ্ভুত নয়, ভাষাটাও অদ্ভুত। যেমন মানুষ তেমন ভাষা। ওবা কি সভ্য যে ইংরাজী বা বাংলা বলবে? অনেক পরে অবশ্য সন্দেহ হয়েছে, লেখক গানটা নিজেই বানাননি তো? ওদেব কথা ভেবে মনে খানিকটা প্রশান্তি ছোটবেলাও আসতো। ইংবেজবা না হয় আমাদের দাবিযে বেখেছে, কিন্তু সান্ত্বনা যে আফ্রিকার মানুষ আমাদের থেকেও ঢেব ঢেব বেশী পিছিয়ে। ওদেব জামা নেই, কাপড় নেই, শিক্ষা নেই, বাড়ী নেই, ওবা কাঁচা মাংস খায়, এমনকি মানুষ পেলে খায়। অন্তত ওদের চেয়ে আমরা এগিযে। এই কথা ভেবে খুশীতে এমনকি ইংবেজদের প্রাধান্যটাও খানিকটা মেনে নেবার মতো বলে মনে হতো।

আরো বড়ো হয়ে দেখেছি "কিং সলোমনস মাইনস।" নাযক ষ্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার, সাদা জুলফি, হাতে বন্দুক—গুপ্তধনেব সন্ধানে। কিন্তু সেখানেও সাদা মানুষই হীরো। তবে ওই বইযেব একটা ছবি এখনও চোখেব সামনে ভাসে। জঙ্গলে দাবানল, তাই জঙ্গল ভেঙ্গে পশু প্রাণী ছুটছে ঘাসের বন পার হয়ে প্রাণের ভয়ে। জিব্রা তাব সাদাকালো চেহারা নিযে, হরিণ বড় বড় লাফ দিযে, আর জিরাফ তার বিরাট লম্বা লম্বা পা ফেলে। গ্রেঞ্জাবের নির্দেশে মানুষেরা ওদের মালপত্র সামনে রেখে মাথা আড়াল করে শুয়ে পড়লো, আব ওদের চারপাশ দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বিরাট শব্দ করে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে গেল হাজার হাজার জন্তু।

কলেজে পড়বার সময় কিছু কিছু ছুটকো ছুটকা দেখা হলো আফ্রিকান মানুষের সঙ্গে। একটি ছেলের নাম জো-ই, সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তো, ডিবেট করতো। মনে আছে একবার হাওড়ার ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কে ও যোগ দেয। দেখা হলো কিন্তু আলাপ ঠিক হলো না। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছরই কিছু ছাত্র দল বেঁধে আসতো কোলকাতায়—তাদের মধ্যেও দু একজন কালো থাকতো। ওদের কারো সঙ্গেই আমাদের ছোটবেলার আফ্রিকার ভাবমূর্তির মিল ছিল না। ওদের যেন পুরোই আমেরিকান মনে হতো—রঙ বা চেহারা সত্বেও।

ওদের চেহারা ছিল এক বড় আকর্ষণ। বিরাট লম্বা, দারুণ কালো। পুরু ঠোঁট, উঁচু চোয়াল। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগতো ওদের চুল। এতো শুধু কোঁকড়া নয়—একরাশ মাথা ভরা চুল, কুঁকড়ে কুঁকড়ে কি ভীষণ ঘন। প্রতিটি চুলই বিরাট লম্বা, কিন্তু এতো কোঁকড়ানো যে দেখে খুব ছোটই মনে হবে।

আফ্রিকা-পরিচিতির আর একটা উৎস ছিলো—ভূ-পর্যটকদের নিয়ে লেখা। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলী, মুঙ্গোপার্ক, আরো কতো জন! এরা অজানাকে জানতে চেয়েছে, গভীরতম জঙ্গল আর

উচ্চতম পাহাড়ের বাধা মানেনি। স্রোতস্বিনী নদী বেয়ে, নানা জ্বরজ্বারি অসুখবিসুখ সহ্য করে ওরা আফ্রিকা খুঁজে বেড়িয়েছে। এ যেন এক নেশা। একবার গিয়ে ফিরে এসে ওরা আবার গিয়েছে।

কিন্তু শুধু কি গতির নেশা? ডেভিড লিভিংস্টোনের জবানীতেই জানি, উদ্দেশ্য ছিলো তিনটে—খৃশ্চিয়ানিটি, কমার্স, সিভিলাইজেশন। লিভিংস্টোন ছিলেন পাদ্রী, তাই ওঁর কাছে খৃষ্টের বাণী প্রচারই ছিল এক বড়ো কথা। কিন্তু বৃটিশ সরকারের সাহায্য কেন এলো? কেনই বা তাকে আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের কন্সাল করা হলো? রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটিও বা কেন এত টাকা ঢাললো? শুধু কি যীশু খৃষ্টের বাণী পৌঁছে দিতে? আসলে 'কমার্স' বা বাণিজ্যই ছিল ওদের কাছে বড় কথা।

আফ্রিকার উপকূল তখন ডাচ এবং পর্তুগীজদের হাতে। ওদের হাতে দাস ব্যবসা। বৃটিশরা চাইলো, ডাচ বা পর্তুগীজদের এড়িয়ে আফ্রিকার বনজঙ্গল ভেঙ্গে বাণিজ্যের পথ তৈরী করতে—আফ্রিকার মানুষের বড় অংশ যেখানে বাস করে সেখানে পৌঁছতে। তখন নদীই ছিল যাতায়াতের সবচেয়ে ভালো পথ। তাই লিভিংস্টোনের প্রচেষ্টার এক বড়ো উদ্দেশ্যই ছিল নদীর উৎস খোঁজা, দেখা কোন নদী দিয়ে যাওয়া সহজ, কোন নদী বড্ড বেশী খর স্রোতা, কোথায় দূরন্ত জলপ্রপাতের তোড়ে জাহাজ বা নৌকো কাগজের নৌকোর মতো চুপসে যাবে বা উল্টে যাবে। লিভিংস্টোন জাম্বেসী নদীর মানচিত্র তৈরী করলেন, গেলেন কঙ্গো অববাহিকার দিকে, এবং শেষপর্যন্ত নীল নদীর উৎস সন্ধানে। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট—এই মানচিত্র ধরে আসুক বৃটিশ বাণিজ্যের পসরা, ওদের লাভের অঙ্ক বাড়ুক, ডাচ বা পর্তুগীজরা ঢুকবার আগেই ওই বাজার দখল হোক।

খৃশ্চিয়ানিটি, কমার্স, সিভিলাইজেশন। শেষ কথাটা হওয়া উচিত 'কলোনাইজেশন'—দখল করে বসে পড়া। সেই কাজ লিভিংস্টোন নিজে করেননি, কিন্তু লিভিংস্টোনের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে শেষপর্যন্ত এখানে বৃটিশ সাম্রাজ্য তৈরী হলো।

তবু এটা বলা যায় যে লিভিংস্টোন ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য কিছু চাননি—হয়তো ইতিহাসের পাতার এককোণে নামটা ছাড়া। বারবার আফ্রিকা ফিরে গিয়েছেন, নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। সিংহের কামড়ে বাঁ হাত পঙ্গু, জলস্রোতে নৌকো ভেঙ্গেছে, ইংরেজ সহকর্মীদের সঙ্গে নানা কোঁদল, অভিযাত্রীদলের এক বড় অংশ তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছে। তা সত্বেও তিনি হেঁটেছেন, এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে গিয়েছেন, ওখানকার মানুষের সঙ্গে থেকেছেন। একসময় তো হারিয়েই গেলেন দীর্ঘদিন। স্ত্রী, পরিবার, সন্তান সব কিছুর থেকে বড় হয়ে উঠেছিল আফ্রিকা এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লিভিংস্টোনের উত্তরসূরী হেনরী মর্টন স্ট্যানলী। এক দরিদ্র ওয়েলশ ঘরের অপজাত সন্তান, দাদুর কাছে মানুষ, শেষপর্যন্ত এক মার্কিনী ব্যবসায়ীর দত্তকপুত্র। পুরোপুরি 'সেলফ-মেইড', সাংবাদিক, এ্যাডভেঞ্চারার। খুব একটা নীতিবাগিশ মানুষ ছিলেন না, কিন্তু সাহস ছিল দুর্জয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। একজন খাঁটি পেশাদার মার্সেনারি। ১৮৩৯ সালে নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা ওকে দায়িত্ব দিলো—লিভিংস্টোনকে খুঁজে আনো। তখন প্রচার ছিল লিভিংস্টোন মৃত; এবং পত্রিকা চেয়েছিল এক চমকপ্রদ খবর—লিভিংস্টোন বেঁচে। সেই কাজে স্ট্যানলীর মতো যোগ্য মানুষ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

স্ট্যানলী ঠিক খুঁজে বের করলেন লিভিংস্টোনকে। আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব অংশের এক গ্রামে। রোগ জর্জরিত, দুর্বল, অকাল-বৃদ্ধ মানুষটাকে চেনা শক্ত, তবু তাঁকে দেখে প্রথম প্রশ্ন, "আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ডক্টর লিভিংস্টোন।" তার পর লিভিংস্টোনের সঙ্গে বেশ

খানিকটা ঘোরাঘুরি। ফিরে এসে যখন সেই খবর জানালেন তখন প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো অবিশ্বাসের। পরে অবশ্য স্বীকৃতি পেলেন, এবং লিভিংস্টোনের মৃত্যুর পর ওঁর অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করাই হলো স্ট্যানলীর লক্ষ্য। স্ট্যানলীর মূল সাফল্য কঙ্গো নদীর উৎস থেকে পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত যাত্রা—মধ্য আফ্রিকা, বিষুবরেখার আফ্রিকার পথ পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে খুলে দেয়া। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের কঙ্গো রাজ্য তৈরীর পিছনে ছিলো স্ট্যানলীর এক বড়ো প্রচেষ্টা। ধর্ম বা বাণিজ্যের থেকেও 'কলোনাইজেশন-ই' ছিল স্ট্যানলীর ব্রত।। আফ্রিকানরা ওঁর নাম দিয়েছিল 'বুলা মাতারি', যে মানুষ পাথর ভেঙ্গে পথ করে নিয়ে চলেন।

লিভিংস্টোন বা স্ট্যানলী কখনো পশ্চিম আফ্রিকায় আসেননি। সেই কাজ মূলত করলেন মুঙ্গোপার্ক। লিভিংস্টোনের মতোই স্কটিশ, এবং ডক্টর—তবে পাদ্রী নয় চিকিৎসক। ১৭৯৫ সালে গেলেন পশ্চিম আফ্রিকায়। উদ্দেশ্য-নাইজার নদীর উৎস সন্ধান। শুরু করলেন আটলান্টিকের ধার দিয়ে গাম্বিয়া নদী ধরে, এবং শেষ হলো আজকের সেনেগাল, মালি, নিজের পার হয়ে নাইজিরিয়ায়। ফুটাজালান মালভূমিতে নাইজার নদীর উৎস ধরে দক্ষিণে গালফ অফ গিনি অবধি যাবার কথা ছিল—কিন্তু পৌঁছতে পারলেন না। স্থানীয় মানুষদের আক্রমণে মারা গেলেন। মুঙ্গো পার্কই প্রথম জানালেন যে নাইজার-নদী পশ্চিম থেকে পূর্বে, তারপর দক্ষিণ পূর্ব ঘুরে ছুটেছে ; আটলান্টিকের এতো কাছে জন্ম, তবু উল্টোদিকেই গতিপথ। পার্কের কাজ শেষ করলেন ১৮৩০ সালে রিচার্ড ল্যাণ্ডার, কিন্তু উল্টোপথে, গাল্ফ অফ গিনি থেকে, যেখানে নাইজার নদী আটলান্টিকে এসে মিশেছে। সেখান থেকে ফুটা জানাল মালভূমি পর্যন্ত—এক সফল অভিযান।

একটার পর একটা অভিযান। কতো এ্যাডভেঞ্চার ! সত্যিই নেশা লাগবার মতো। বিশেষ করে অল্প বয়সে। তবু যেন মনে হতো কোথায় একটা ফাঁক আছে। ওই সাহসী মানুষগুলো নিশ্চয়ই আফ্রিকাকে ভালোবাসতেন, না হলে বারবার নিজের দেশের নিরাপত্তা এবং পরিবার ছেড়ে কেন ছুটবেন ওই অজানা ভূখণ্ডে। তবু মনে হয়েছে, ওরা ভূখণ্ডটাকে ভালোবেসেছেন মানুষগুলোকে নয়। স্ট্যানলী এ কথা কখনও গোপন করেন নি যে আফ্রিকার মানুষকে ওঁর ভালো লাগে নি। নদী পথে যাবার সময় পার থেকে বারবার আক্রমণ হয়েছে। ওরা তীর ছুঁড়েছে বর্শা ছুঁড়েছে, ছোট ছোট ক্যানোতে করে স্ট্যানলীর জাহাজের দিকে ধেয়ে এসেছে। স্ট্যানলীর আদ্ধেক আফ্রিকান সহযোগী বাঁচেনি, মাত্র তিনজন ইউরোপীয় বেঁচেছিল। কিন্তু সেটা কি অস্বাভাবিক কিছু? ওদের দেশের মানুষ তো ভাবতেই পারে স্ট্যানলীরাই আক্রমণকারী। এবং যতটুকু জানা যায়, স্ট্যানলী ছিলেন যাকে বলে 'ট্রিগার-হ্যাপি'। ওদের অভিযাত্রীদের গুলীতে কতো আফ্রিকান মরলো তার হিসাব কোথায় ? এই নিয়ে পরে স্ট্যানলীর সমালোচনাও হয়েছে বৃটেনে। মোট কথা, স্ট্যানলীর কাছে আফ্রিকার মানুষ ছিলো শত্রু। লিভিংস্টোন অবশ্য ছিলেন ব্যতিক্রম—তাই তাঁর মৃত্যুর পর আফ্রিকার মানুষরা ওঁর মলম দেয়া মৃতদেহ মাথায় করে নয় মাস হেঁটে পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের উপকূলে পৌঁছে দিয়েছিলো।

ওই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের 'আবিষ্কারে'র অনেক আগে থেকেই আফ্রিকা ছিলো। এমন নয় যে ইউরোপীয় চোখে 'আবিষ্কৃত' না হলে কোন অঞ্চলের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আফ্রিকাকে আমরা ছোটবেলা থেকেই ইউরোপীয় চোখ দিয়েই চিনেছি। আমরা নাক কুঁচকেছি, পিঠ চাপড়েছি, কিন্তু আফ্রিকাকে বুঝিনি, ভালোবাসিনি। রবীন্দ্রনাথের কালোত্তীর্ণ কবিতা 'আফ্রিকা' হয়তো এক বড় ব্যতিক্রম।

॥ দুই ॥

সমীর আমিনের আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে নেচে উঠলাম। সমীর 'ইডেপে'র ডিরেক্টর। ইডেপ হলো আফ্রিকার রাষ্ট্রসংঘের গবেষণাসংক্রান্ত ইনস্টিটিউট। কেন্দ্র—ডাকার, সেনেগালের রাজধানী। সেনেগাল আফ্রিকার পশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূলে, এক কালের ফরাসী উপনিবেশ। এক সময় ডাকার ছিল ফরাসী নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী।

সম্মেলনের বিষয় : বহুজাতিক সংস্থা এবং আফ্রিকার অর্থনীতি ও সমাজে ওদের প্রভাব। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ব্যাপারে খানিকটা গবেষণাও আগে করেছি। কিন্তু আমার উৎসাহটা যতো না সম্মেলনে ও তার আলোচনায় তার চেয়ে ঢের বেশী পশ্চিম আফ্রিকায়। সম্মেলন মানে শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা নয়। ইডেপ আফ্রিকার বুদ্ধিচর্চার এক মূল কেন্দ্র। গোটা মহাদেশেরই ভারী ভারী অধ্যাপক, গবেষক আর প্রশাসকের সেখানে ভীড়। এ এক বিরাট সুযোগ আফ্রিকাকে জানবার আর বুঝবার। সবকিছু বই পড়ে বোঝা যায় না—মানুষগুলোকে দেখে কথা বলে বোঝার গভীরতা অনেক বেশী। এই সম্মেলন যেন পুরো আফ্রিকাটা হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেবে। অতএব ডাকারের দিকে রওনা হলাম—প্লেনে।

স্ট্যানলী, ল্যাণ্ডার বা মুঙ্গোপার্করা যেভাবে আফ্রিকায় যেতেন তার ধরনটা অবশ্য একটু অন্যরকম ছিল। ওদের একটা বড় সময় যেতো টাকা যোগাড় করতে। সরকার, জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, দাতা কোটিপতি, সকলের কাছে যেতে হবে টাকার জন্য। তারপরে লোক যোগাড় করা। এমন লোক যারা সাহসী, উদ্যোগী, কুশলী এবং শৃঙ্খলা মানবে, সমস্ত রকমের বিপদের মুখেও ভয় পাবে না, নার্ভ হারাবে না বা নিজের মতো চলবে না। তারপর রসদ কেনো, ব্যবস্থাপত্র করো। খাবার, তাঁবু, বন্দুক, ওষুধ, এইসব তো আছেই—এইসব শস্তায় কিনতে হবে, ভালো করে প্যাক করতে হবে, যাতে জাহাজে বা জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া যায়। এমন কিছু জিনিসও নিতে হবে যা উপহার হিসেবে দেয়া যাবে, ওখানকার মানুষের সঙ্গে ভাব করবার জন্য—যেমন সিগ্রেট, ঘড়ি বা লাইটার। ওদের বৌ-ছেলেমেয়েদের কথা ভাববার সময় ছিল না— কবে ফিরবে ঠিক নেই, যদি আদৌ ফেরে। এত হাজারো রকমের সংকট হতে পারে, বেঁচে ফিরে আসাটাই আশ্চর্য।

আমার যাওয়ার মধ্যে কোন এ্যাডভেঞ্চার নেই। যাত্রাপথে ছুরি হাতে কোন গুপ্তঘাতক পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে না। অন্ধকারের মধ্য থেকে কোন হিংস্র জানোয়ার অজান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এমন হয় না যে মৃত্যুর মুখ থেকে অনেক জন্মের ভাগ্য নিয়ে ফিরে এসেছি। এখন পায়ে হেঁটে বা নদী পথে যেতে হয় না। পায়ে হাঁটতে গেলেও সেটা হয় প্রমোদ ভ্রমণ। নদীতে হাঙ্গর-নাগিনী কিলবিল করছে কিনা জানার উপায় নেই, কেননা কেউ বোট থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় না এবং স্বইচ্ছায় চলন্ত বোট ছেড়ে জলে নামবার বাসনা কখনো হয়নি। প্লেন আছে, এয়ারপোর্ট আছে, যেতে সময় লাগে না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পৌছনো যায়। প্লেনে উঠলেও হাইজ্যাক হয় না উইংস খসে পড়ে না, বা দারুণ ঝড়ে

প্লেন ঘুড়ির মতো ওলোট পালোট খায় না। টেলিফোন আছে, টেলিগ্রাম আছে, ডাকের ব্যবস্থা আছে—তাই পৌঁছবার আগেই সমস্ত কিছু তৈরী। কোথায় থাকবো চিন্তা নেই, হোটেল বুক করা আছে। কোথায় সভা বা সম্মেলন আগে থেকেই জানানো, মায় যাবার পথ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য কাষ্টমস চেক না কবেইছেড়ে দেয় সম্মেলনের লোক বলে। ঘুরবাব জন্য গাড়ী দরজায় প্রস্তুত। চেষ্টা করলেও মুঙ্গোপার্ক, ল্যাণ্ডাব বা স্টানলী হবাব উপায নেই। এমন কল্পনা শক্তি নেই যে যা ঘটেনি তাও পাঠকেব মন যুগিযে উত্তেজনায় ঠেসে, আবেগে প্যাক কবে পাঠাবো। আমাব আফ্রিকা ভ্রমণ তাই খুবই সাদামাটা সাধাবণ ব্যাপাব। মাত্র একবাবই মনে হযেছিল দারুণ এ্যাডভেঞ্চাবেব কাছাকাছি পৌঁছেছি—সেটা আফগানিস্তানে। সেই গল্প আগেও লিখেছি, পবেও লিখবো। আপাতত আমি আফ্রিকায়, আমাব সামনে দিয়ে একগাদা মানুষ হেঁটে যাচ্ছে।

আফ্রিকার গহণ অবণ্য, খবস্রোতা নদী, তুষাব-শীর্ষ উঁচু পাহাড়, বিস্তীর্ণ মরুভূমি আব ঘাসেব বন সবকিছুই আমায টানে। কিন্তু সবচেযে বেশী টানে মানুষ। আমি ওদেব জানতে চাই বুঝতে চাই। এটাই আমাব পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণেব মূল কথা।

'হোমো সেপিযেন' বা মানুষেব থেকে আকর্ষণীয আব কি জানোযাব আছে? সব জন্তু জানোযাবই থাকে একটা নির্দিষ্ট পবিবেশে—তাপ মাত্রা বাড়লে কমলে ঘাস বা অন্য উদ্ভিদ ঠিকমত না পেলে বাঁচবে না। খুব অল্প জন্তুই এই পৃথিবীব সবত্র ছড়িযে। মানুষ সর্বত্র—হিমশীতল তুন্দ্রা, গনগনে আগুনেব মতো মরুভূমি, ভ্যাপসা ঘামঝবা জঙ্গল, সব জাযগাতেই মানুষ থাকে আব বাঁচে। অন্য জানোযাববা পবিবেশকে মেনে নেয, মানুষ সেই পরিবেশকে নিজেব মতো কবে সাজিযে নেয। অন্য জানোযাববা আজ এবং কালকেব দবকাবেব বেশী ভাবতে পাবে না, মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে চায, পবিকল্পনা কবে। অথচ মানুষেব মতো দুর্বল জানোযাব নেই—না পাবে ভালো ছুটতে, না আছে শিং বা ধাবালো নখ-দাঁত। তবু মানুষই পৃথিবীটা চালায—ওই ভযংকব শক্তিশালী জন্তুবা নয।

সেই মানুষেব জন্ম আফ্রিকায, সম্ভবত পূর্ব আফ্রিকায। বিবর্তনেব মধ্য দিযে যে স্তরে পৌঁছলে মানুষ বলা যায, সেই স্তবেব প্রাচীনতম প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আফ্রিকাতেই পাওয়া গিয়েছে। আজকেব আফ্রিকা যতোই পশ্চাদপদ হোক, অন্য জাযগায ছড়িযে যাওযা মানুষেব বঙ, চেহাবা যতোটাই পাল্টাক, প্রথম মানুষ যে আফ্রিকান, সেটা অস্বীকাব কবা যাবে না। ওই মানুষগুলোকেই দেখতে চাই ভালো কবে।

ডাকারে আমাব বন্ধু জগদীশ আর বীনা—উত্তব প্রদেশেব মানুষ। জগদীশ ইডেপে কাজ কবে, লম্বা, স্বাস্থ্যবান চেহাবা, গোঁফসহ ইজিপ্টেব প্রাক্তন বাষ্ট্রনাযক গামাল আবদেল নাসেবেব মতো দেখতে। বীনা ছোটখাটো, সবসময় শাড়ী পবে—স্কার্ট বা অন্য কিছু পছন্দ নয। ওদের সঙ্গে আলাপ যখন ওরা ব্রাইটনে কিছুদিন ছিল। ডাকাবে এবাই আমাব অভিভাবক। সম্মেলনের শেষে হোটেল ছেড়ে ওদের সঙ্গেই দু সপ্তাহ থাকলাম আব ঘুরলাম।

সংস্থা যতোই বড হোক, নামধাম যাই থাক, ইডেপের ঠাট কম। ওদের অফিস তাই প্রাসাদোপম নয়, প্রায় সাধারণই বলা যায়, যেটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছে। সাধারণত আফ্রিকায়, যেমন আমাদের দেশেও, বাড়ীঘর এই সব যথেষ্ট মূল্য পায়। অফিসের মধ্যেও কার ঘরে কতটুকু কার্পেট, কে কটা জানলা পেলো, ঘরের মাপ কি, এয়ার-কণ্ডিশনিং-এব ধরন কি, এগুলোই হয়ে দাঁড়ায় একজন মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি। সেখানে ইডেপে, আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীদের এক মূল কেন্দ্রে, সবকিছুর মধ্যেই একটা সাদামাটা অনাড়ম্বর ভাব। যে হলে সভা হলো, সেখানে থাক থাক গ্যালারি উঠে গিয়েছে, কিন্তু বড়ো নয়। আমরা জনা চল্লিশের মতো মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভালো করেই বসলাম—কিন্তু পুরো গদী আঁটা আলাদা

চেয়ারের মাহাত্ম্য ছিল না। ওপরের লাইব্রেরীতে প্রচুর বই, বিশেষ করে সম্মেলনের প্রয়োজনে বহুজাতিক সংস্থার ওপর লেখা দেশবিদেশের বহু বই আলাদা করে সাজানো। বুঝতে কষ্ট হয় না যে পড়াশুনো এবং চিন্তার এক ছিমছাম সহজ পরিবেশ এখানে আছে। কিন্তু সেখানেও নজরটা বইয়ের ওপর, বইয়ের বিন্যাসের ওপর, পড়ুয়াদের স্বাচ্ছন্দ্যের ওপব, কিন্তু তাক লাগাবার মতো হল বা ভাস্কর্য নেই।

কারণটা হয়তো অনেকখানি এই সংগঠনেব নেতৃত্ব। সমীব আমিনের নাম দীর্ঘদিন ধরে জানি, এখন জগদীশ আলাপ কবিয়ে দিলো। যে সময়ের কথা বলছি তখন হয়তো পঁযতাল্লিশ ছেচল্লিশ বছব বযস হবে। চেহাবাব মধ্যে একটি মিষ্টি, মার্জিত ভাব। লম্বা চওড়া নয়, দাড়ি-গোঁফ ভালোভাবে কামানো, সামান্য ঢেউ খেলানো চুল, টিকোলো নাক, সৌম্য সুন্দর মুখ। গায়ের রং ফর্সা, কেউ না বলে দিলে ফ্রেঞ্চ বলে মনে হতে পারে।

মোট কথা চেহারাটা মোটেই আফ্রিকান নয়। সমীব অবশ্য জোব গলায বলে, "আমি আফ্রিকান", এবং ভৌগোলিক অবস্থানেব বিচাবে সে কথা নিশ্চযই ঠিক। সমীব ইজিপ্সিয়ান—ইজিপ্টেব বড়ো অংশটাই আফ্রিকা। কিন্তু, আমাদের চিন্তায বিবেচনায ইজিপ্টকে আমবা আফ্রিকা বলে ভাবতে অভ্যস্ত নই। সাধাবণ ভাবতীয ধাবণা আফ্রিকা মানে দারুণ পশ্চাদপদ, বর্বব কোন অঞ্চল, সেখানে মিশবেব সভ্যতা ভাবতেব সিন্ধু-গাঙ্গেয উপত্যকার সভ্যতাব চেয়েও পুবনো। ফ্যাবাওদেব গল্প, পিবামিড, মমী, বানী ক্লিওপ্যাট্রাব সঙ্গে রোমের জুলিয়াস সীজাব বা মার্ক এ্যান্টনীব বোমান্সেব কাহিনী—এব এক বড় অংশটাই শিক্ষিত ভারতীয়বা জানে, যেখানে আফ্রিকা সম্বন্ধে ধাবণা স্ট্যানলী লিভিংস্টোনে সীমাবদ্ধ।

জগদীশও বলে, "শুধু ইজিপ্ট কেন, গোটা উত্তব আফ্রিকাটাই যেন অন্য কিছু মনে হয। আসল আফ্রিকা সাহারাব দক্ষিণে। বঙ, জাতি, সংস্কৃতি আচাব-ব্যবহাব সবকিছুব বিচারেই বলতে পাবো, সাহাবাব উত্তব আব দক্ষিণ একেবারে আলাদা।"

জাত। উত্তবে মূলত আবব বা বার্বাব, ওবা নিগ্রো। বঙ। ওবা যথেষ্ট ফর্সা, গ্রীক, স্প্যানীশ ইটালীযান বা অন্য দক্ষিণ ইউরোপীযদেব মতো, এরা আবলুস কালো। চেহাবায তফাৎও চোখে পড়বে—নাক তীক্ষ্ণ না থ্যাবড়া, ঠোঁট পাতলা না পুরু, চুল কতখানি কোঁকড়া। সাহাবার উত্তর আব দক্ষিণ এক নয—সাহারাই এক মস্তোবড় দেড় হাজাব মাইলেব ব্যবধান। মরুভূমির রুক্ষ প্রস্তব প্রান্তর আব বালুবাশি ওদেব আলাদা ভাবে গড়ে তুলেছে।

তবু যোগাযোগ হযনি এমন নয়। সাহাবার উত্তবেব অনেক জাতি সাহাবা পার হয়ে দক্ষিণে অনেক দূব গিয়েছে। যেমন, কেনিয়াব মাসাই বা লুও। সাহেল আর সাহাবাব ফুলানিরাও সেইরকমই হয়তো। ওদের চেহারার ভাবে উত্তব আর দক্ষিণ দুটোরই ছোঁয়া রয়েছে। আবলুস কালো রঙ, ঘন কোঁকড়া চুলের সঙ্গে মিশেছে অন্য ধরনেব নাক, ঠোঁট বা দেহের অন্য দু একটা অংশ যা পুরোপুরি ককেশীয়। সাহাবার দক্ষিণ প্রান্তে এরকম অনেক জাতি রযেছে। উত্তরের ইসলামের ঝাপটাও দক্ষিণে এসে লেগেছে, উত্তব আর দক্ষিণ পুরোপুরি সমান্তরাল ধারায় চলতে পারেনি। এসবই ঠিক, তবু তফাৎটা খুব বড়। তাই সাহারা না পাব হলে আফ্রিকা এসেছি বলে ঠিক মনে হয় না।

পূর্ব আফ্রিকা! ঠিকই পশ্চিম আফ্রিকার মতোই পূর্ব আফ্রিকা কৃষ্ণ সুন্দর। বন্য সম্পদের বিচারে পূর্ব হয়তো আমাদের সনাতনী আফ্রিকা চেতনার অনেক কাছাকাছি। কিন্তু তবু আফ্রিকা বলতে পশ্চিমই আমার কাছে প্রামাণ্য মনে হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার একটা দীর্ঘদিনের ইতিহাস আছে। বহু বড় বড় সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছে, ভেঙ্গেছে, নতুন সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছে। শিল্পকলা, বিদ্যা চর্চার প্রসার হয়েছে, শহর বেড়েছে, আফ্রিকার যে কোন অঞ্চলের থেকে অনেক অনেক

বেশী মানুষ এখানে এসে ভীড় করেছে। এ সবই ঘটেছে ইউরোপীয়রা আসবার আগেই। সেটাও আমার আকর্ষণের এক বড় কারণ।

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর ছাড়াও আরো দুটো অঞ্চল বাদ থাকছে—মধ্য আর দক্ষিন। এ দুটো অঞ্চল দেখিনি। মধ্য অঞ্চল, আজকের জাইরের আমাদের ছোটবেলার কঙ্গো দেখার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে মেটেনি। জাইরের, এ্যাঙ্গেলা, রুয়াণ্ডা—এই অঞ্চলগুলো থেকেই আফ্রিকার অন্যান্য অংশে বাণ্টুরা ছড়িয়ে পড়েছে বলে শোনা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার তো প্রশ্ন আসে না। আমার পাশপোর্টে লেখা আছে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আমি যেতে পারি, ইসরাইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে। একদিন হয়তো রাজনৈতিক অবস্থা পাল্টাবে, এই দক্ষিন আফ্রিকা আর থাকবে না, পাশপোর্টের বাধা চলে যাবে—সেদিন হয়তো ওখানে যাবো।

মোট কথা আফ্রিকার সবচেয়ে পরিচিত বুদ্ধিজীবী, সমাজবিজ্ঞানী চিন্তাভাবনার মূল উৎস ওই মানুষটাকে দেখে মোটেই আফ্রিকান মনে হবে না। না জানলে বরং ফরাসী বলে ভাবাটাই স্বাভাবিক—যেমন চেহারায় তেমনই কথা বার্তার ভঙ্গিতে।

ফরাসী আর ইংরেজ—দুটো স্বতন্ত্র ধারা। ইংরেজরা বাক সংযত। ওরা কম কথা বলে, বলতে গিয়ে সবচেয়ে দরকারী কথাটা সোজাসুজি বলতে পারে। বলবার সময় আবেগ দেখাতে চায় না। মনের মধ্যে একটা চিন্তা যতোই টগবগ করুক যতোই রাগ হোক, ঘৃণা হোক বা অনুরাগ হোক, সেই ভাবকে সংযত করে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বলতে হবে। তোমার বক্তব্যটাই মূল হোক—মুখভঙ্গি নয় হাত পা নাড়া নয় এইটা হচ্ছে বৃটিশ কায়দা।

আমার মনে আছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপকদের প্রথম সভার কথা। আমি নতুন কোন কথা বলিনি, শুনেছি। অনেকেই অনেক কিছু তাও সংযতভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে বললেন, বেশ সহজ সুন্দরভাবেই সভা শেষ হলো—অন্তত সেইরকমই আমার মনে হলো। সভার শেষে আমার দুই স্কটিশ অর্থনীতিবিদ সহকর্মী, বিল ওয়ারেন আর টেরি বায়াস উত্তেজিতভাবে বললো, "দেখলে কি দারুণ ঝগড়া হলো? বাব্বা এমন কথা কাটাকাটি বহুদিন হয়নি।" আমি শুনে অবাক। বুঝলাম ওদের ভাষাটা পুরোপুরি বুঝিনি। ভাষা মানে শুধু ইংরাজী শব্দগুলো নয়।একটা শব্দের মানে যাই হোক কোন অবস্থায় কিভাবে ব্যবহার করলে সেটা পুরোপুরি পাল্টে অন্য কিছু হয়ে দাঁড়ায় সেটাও জানতে হবে—এবং সেটা জানতে গেলে ভাষা পার হয়ে সংস্কৃতি, আচার বিচারে ঢুকতে হবে।

ইংরেজদের বলবার একটা কায়দা হলো, যে কথাকে জোর দিতে চায়, সেই কথাকেই আপাত দৃষ্টিতে সবচেয়ে কম জোর দেয়া। যেমন আমরা হয়তো বলবো, "এটা দারুণ জঘন্য অন্যায় হচ্ছে"। ওরা একই ভাব প্রকাশ করবে এই বলে যে "আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারে যেন খানিকটা অন্যায় করা হচ্ছে।"

ইংল্যাণ্ড ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে। যতো দক্ষিণে এবং পূর্বে যাবেন ততোই যেন আমাদের দেশের ভাবসাবের আমেজ পাওয়া যাবে। যেমন ইটালীর মানুষগুলো যেন কথাবার্তায় চাল চলনে অনেকখানি আমাদেরই মতো। আমার এক প্রবীণ বন্ধু, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামকরা অধ্যাপক—মরিস জোনস। আমাদের দুজনের একসঙ্গে লেখা একটা বই আছে। মরিস অবশ্য ইংরেজ নয়, ওয়েলশ—কিন্তু যেটা বলবার জন্য লিখছি, ওর স্ত্রী গ্রিজেলা ইটালীয়ান। মরিস বহুবার ভারতবর্ষে এসেছে, প্রচুর ভারতীয় বন্ধু আছে, এবং ভারতকে জানে। মরিস আলোচনার সময় প্রায়ই ইটালীয়ান এবং বাঙালীদের মধ্যে তুলনা করতো—এবং তুলনা করবার সময় নিজের বউকে টেনে আনতো।

"একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তা থেকেই বুঝবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সব সমাজেই হয়, তোমাদের মধ্যেও হয়, আমাদেরও হয়—কিন্তু রাগ দেখাবার কায়দাটা এক না। যেমন, আমার যখন রাগ হয় তখন আমি নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিই, আমার পড়ার ঘরের সোফায় বসে চুপচাপ পড়াশুনো করি, বউয়ের সঙ্গে কথা বলি না, বউ কিছু প্রশ্ন করলে এক আধ কথায় জবাব দিই। আমি চিৎকার করি না, ঝগড়া করি না, খারাপ ব্যবহার করি না, বউ কিছু বললে মুখ ঘুরিয়ে থাকি না। কিন্তু দারুণ 'কোল্ড' হয়ে যাই। এমন জমাটি ঠাণ্ডা যে বউ না বুঝে পারে না যে আমি দারুণ চটে গিয়েছি। কিন্তু উল্টোটা ধর—যখন আমার বউ রেগে যায়! তখন গলগল করে মুখ থেকে কথা বেরোয়, ও চিৎকার করে, ছুটোছুটি করে, হাত নাড়ায়, পা নাড়ায়, ছেলেমেয়েদের ডেকে বলে, চোখের জল ফেলে—এক হৈ হৈ চৈ চৈ কাণ্ড। ঠিক তোমাদের বাঙালীদের মতো।" মরিস বলে।

সমস্ত বাঙালী বউ নিশ্চয়ই এই মন্তব্য মানবেন না—আমার বউ তো নয়ই। তবু খানিকটা সত্য কি নেই এই তুলনায়?

ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে, পূর্বে যদিও না। তাই ইটালীয়ানদের মতো অতোটা না হলেও, বৃটিশদের সঙ্গে তফাৎটা চোখে না পড়ে পাবে না। বৃটিশরা আবেগপ্রবণতা পছন্দ করে না—ফরাসীরা বরং বহুক্ষেত্রে আবেগেরই প্রাধান্য দেয়। ওখানে রাগ, অনুরাগ, বিরাগ দেখানোটা ততোটা লজ্জাব ব্যাপার নয়। ইংরেজবা যেমন সহজে ভাব করতে চায় না, একবার ভাব হলে দারুণ বন্ধু, ফরাসীরা অনেক সহজে ভাব করে এবং ঝগড়াটাও খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে।

আমার ছোটবেলার চেতনায ফবাসী জাতির মূল কথাই হলো 'কালচার'। ফ্রান্স মানেই 'কালচার' এমন একটা ধারণা পত্রপত্রিকা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে ঢুকেছিল। ইউরোপে ফরাসী ভাষারই চল, ইংরেজী নয়। প্যারিসের ফ্যাশন শো থেকে ঠিক হবে আগামী কয়েক বছর পৃথিবীতে কোন কাটের কি ধরনের পোষাক চলবে। প্যারিসের পারফিউম জগদ্বিখ্যাত। এখন অবশ্য অনেক কিছু পাল্টেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, মার্কিনী টাকায় আর সৈন্য শিবিরের কল্যাণে, ইংরাজিই এখন ইউরোপের অগ্রণী ভাষা। ফ্যাশন, পপের বিচারেও লণ্ডন এখন প্যারিসকে বহু সময় ছাড়িয়ে যায়। 'কালচার' মানে ফ্রান্স এই কথাটা এখন আর সেইভাবে শোনা যায় না।

তবু সমীর আমিন যখন কথা বলে—ফরাসী ভাষায়—তখন কথাগুলোর স্পষ্টত্ব এবং মিষ্টত্ব বিচার করে, কখনো কখনো মনে হয়, না ফ্রেঞ্চ মানে এখনও কালচার। ফ্রেঞ্চ জানি না, হেডফোন কানে দিয়ে ইংরাজি অনুবাদ শুনি, মাঝেমধ্যে হেডফোন খুলে না বোঝা ওই ভাষার শব্দ ঝংকার উপলব্ধির মধ্যে আনবার চেষ্টা করি।

অনুবাদ শুনে এইটা বুঝি যে শুধু ভাষাটাই আলাদা নয়, ওদের ভাব প্রকাশের পদ্ধতিটাও অন্যরকম। ইংরেজদের আলোচনার ধরনটা হলো, 'টু দি পয়েন্ট' কথা বলা, সেই আলোচনার চৌহদ্দীর বাইরে না যাওয়া। ফরাসীদের আলোচনার ধরনটা অনেক বেশী ছড়ানো—ওরা বিষয়ের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা শুরু করবে, সুযোগ পেলেই তত্ত্বকথায় চলে যাবে। এবং বলতে গিয়ে ঘন ঘন মুখের ভাব পাল্টাবে, ইংরেজদের মতো ভাবলেশহীন নয়—যেখানে কখনো ক্রোধ, কখনো ঘৃণা, কখনো উত্তেজিত সংকল্প।

অনুবাদ থেকে এটাও বুঝি যে ইংরেজীর তুলনায় ফরাসী ভাষা 'কমপ্যাক্ট' কম, ঘন কম। সেটা টের পেলাম বলতে উঠে। আমি ইংরেজীতে বলছি, তাৎক্ষণিক ফরাসী অনুবাদ হচ্ছে। এক মিনিটের মধ্যেই চাপা-ফিসফাস, অনেকের মুখে হাসি। ডায়াস থেকে সমীর আমিন বললো,

"তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি বলছো—এতে অনুবাদকদের অসুবিধে হচ্ছে। একটু আস্তে আস্তে বলো।" বাধ্য হলাম আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলতে। কিন্তু আমার পরের জন, মনে হলো ফরাসী ভাষায় ঝড়ের মতো বলে গেলেন, কিন্তু অনুবাদকবা কোন আপত্তি করলো না। ইংরাজিতে বলতে গিয়ে এই সমস্যা অন্যত্রও হয়েছে। কারণটা পরে জেনেছি। একই কথা ফরাসীতে বলতে ইংরাজীর তুলনায় শতকবা কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগ বেশী শব্দ লাগে। তাই যারা একটু তাডাতাড়ি ইংবাজী বলেন, তাদের সঙ্গে তাল বেখে তাৎক্ষণিক ফরাসী অনুবাদ করা যায় না।

এখানে ওই ভাষাগুলোয় যারা কথা বলছে তাদেব মধ্যে মাত্র দু চারজনই ইংরেজ বা ফরাসী। যারা ইংরাজী বলছে তাদের মধ্যে আছে নাইজিরিয়া, ঘানা, গাম্বিয়া, সিয়েরালিওন, কেনিয়া, লাইবেবিয়া, টানজানিযা—এই সব দেশের মানুষরা। যারা ফরাসী বলছে তারা এসেছে আইভরী কোষ্ট, সেনেগাল, মালী, নিজেব, আপার ভোল্টা, এই সমস্ত দেশ থেকে। ভাগটা ঔপনিবেশিক এবং স্পষ্ট, ভুল হবার উপায নেই। তবে মনে হলো যেন তুলনায় ফরাসী আফ্রিকানবা একটু বেশী ফবাসী।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় সম্মেলনের শেষে রিসেপশন। সুদৃশ্য কার্পেট শোভিত বড় ঘরের একপাশেব টেবিলে বোতল আর ঝকঝকে কাঁচেব নানা ধরনের গ্লাসের সমাবেশ। শেরী, বেড ওয়াইন, হোযাইট ওযাইন, টম্যাটো, পাইন-এ্যাপল, কোক—যার যেটা রুচি। আর এক পাশের টেবিলে প্লেট, ছুরি, কাঁটা, এবং নানা ধবনের বাদাম, স্ন্যাক্স, স্যাণ্ডউইচ—কোনটার মধ্যে শসা, টম্যাটো, কোনটায পর্ক, হ্যাম, বা স্যামন। সম্মেলনেব সবাই ঘরময় ছড়িয়ে গল্প করছে।

ঘরেব দবজায সমীর দাঁড়িয়ে। স্যুট আব টাইয়ের বঙ মেলানো। এক একজন ঢুকছে, আর করমর্দনেব সঙ্গে মাপা-হাসি উপহাব দিচ্ছে, পরক্ষণেই তাকে ভুলে পরের জনের সঙ্গে করমর্দন আর মাপা-হাসি। হোষ্টের এটাই দায়িত্ব—কাযদাটা পুরোপুরি ইউবোপীয়, ঠোঁটের হাসির মাপটুকুও ইউবোপীয কাযদায বানানো। পাশে সমীরেব স্ত্রী—ফ্রেঞ্চ। সমীব আলাপ করিয়ে দিলো।

জগদীশ ফিসফিস কবে বললো, "সমীরের মা-ও ফ্রেঞ্চ।"

সমীব ঘুরে ঘুবে গল্প কবছে, যেটা ভালো হোষ্টের লক্ষণ। হোষ্টেরা মৌমাছির মতো.ফুল থেকে ফুলে ঘুরে বেড়ায—কাবোকে দেখে হাসে, কখনো হাত নাড়ে, কখনো 'হ্যালো' বলে, কখনো দুটো রসিকতা, কখনো কথা না বলে শুধু একবাব কাঁধে হাত রেখে চলে যায়। এটাই হলো দস্তুর। হোষ্ট কারো মনোপলি নয়, সে নিরপেক্ষ। সবাই তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়। কোন আলোচনায জমে যাবার অধিকার তার নেই। কখনো কখনো স্যাণ্ডউইচের ট্রে হাতে নিয়ে ভীড়ে ঘুববে—প্রত্যেকের সামনে ট্রে বাড়িয়ে দেবে।

এই সব কাজগুলো সমীর দারুণ ভালোভাবে করে। নিয়মমাফিক কেতাদুরস্ত। কোন খাঁটি ফরাসীও এতো ভালোভাবে পারতো না।

চারপাশের মানুষগুলোর ভীড় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। এই তো ডঃ ফৌজি, পঞ্চাশের মতো বয়স, কাঁচা-পাকা চুল, সামান্য টাক, চোখে চশমা, সৌম্য, সংযত—যেমন একজন অধ্যাপকের হওয়া উচিত। কিন্তু ওর চেহারার আদলে আমার চেনা খাঁটি বাঙালী উকিল সুজন সমাদ্দারের কি ছাপ নেই? নাইজিরিয়ার এনজিমিরো—গোলগাল বেঁটে ফুটবলের মতো চেহারা। সাধারণ নাইজিরিয়ানদের চেহারার মতো নয়। বয়স্ক, কিন্তু উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে, বয়সের ভাব একদম নেই। হাসিঠাট্টায় গল্পে জমিয়ে রেখে দেবে। আফ্রিকান ঘন কোঁকড়া চুল প্রায় অনুপস্থিত, সামনে খানিকটা টাক—দেখে কি খানিকটা আমাদের অভিনেতা জহর রায়ের কথা

মনে হয় না ? লাইবেরিয়ার টিপেটো, ঠিক উল্টো চেহারা—বিরাট লম্বা, শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা, দারুণ বামপন্থী এবং সিরিয়াস, চোখে চশমা। পরে একসময় কিছুদিন লাইবেরিয়ার মন্ত্রী ছিল। ওর রঙটা যদি একটু ফিকে হতো, চুলটা যদি একটু কম ঘন হতো তাহলে স্বচ্ছন্দে আমার চেনা দীর্ঘদেহী জন, নিতান্তই বাঙালী জনার্দন বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। ইথিওপিয়ার তায়ে গুরমু, স্বল্পভাষী, কিন্তু চিন্তাশীল—দূর থেকে দেখে একবাব দুবাব মনে হয়েছে, স্যুট-টাই পরে সমর চৌধুরী বসে নেইতো ? গুরমুও ১৯৭৫ সালেব ইথিওপিয়াব বিপ্লবেব পর কিছুদিন মন্ত্রী পর্যায়ের দায়িত্বে ছিল। ওই যে টে-কোফে, যাব নামেব মধ্যে চা এবং কফি দুইই উপস্থিত, কিন্তু যার গবেষণাব বিষয ঘানার কোকো—আর একটি পানীয়। চেহাবাতে সাধাবণভাবে বাঙালীত্বের ছাপ নেই—কিন্তু নানা আদলেব বাঙালীব মধ্যে কারো কারো সঙ্গে কোথায যেন একটা মিল দেখছি।

জগদীশ বলে, "সবটাই তোমার বানানো। তোমাব চিন্তা এখন আফ্রিকামযয। তুমি আফ্রিকার সবকিছুকেই বাঙালী বা ভারতীয় কোন ছাঁচে ফেলবাব চেষ্টা কবছো। এটা একেবারেই এ্যাবসার্ড। তোমার পাগলামি ছাড়ো, আমি তো একদম কোন মিল দেখছি না।"

বীনা বলে, "বিপ্লবদা, এটা তোমাব জেট-ল্যাগ। তুমি এখনও ঠিক আফ্রিকাতে পৌঁছওনি। আবো দু একদিন থাকো, তাবপব ঠিক হযে যাবে।"

বীনা লক্ষ্ণৌব মেয়ে, পশ্চিমবঙ্গেব সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। তবু বাঙালীদের ওই 'দাদা' বলার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে! ও সবাইকে নাম ধবে ডাকে, আমাকে ছাড়া।

আমি বলি, "বলতে পাবো জেট-ল্যাগ, বলতে পাবো পাগলামি। কিন্তু কোথায যেন একটা মিল দেখতে পাচ্ছি। জানিনা মিলটা কোথায—কিন্তু মিলটা আছে।"

বীনা বলে, "তবে এটা বলবো, আফ্রিকাব লোকগুলো যেমন ভেবে এখানে এসেছিলাম, সেবকম না। আমি তো আফ্রিকা শুনলে আগে ভযই পেতাম। যখন জগদীশ ইডেপে আসবে বললো, আমি তখন দুদিন ওর সঙ্গে কথা বলিনি। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, থাইল্যাণ্ড ঠিক আছে, কিন্তু আমার কপালে কিনা আফ্রিকা! এখানে এসে দেখছি, পশ্চিমী সব কিছুই এখানে আছে—বরং লক্ষ্ণৌ বা ভারতের অন্যান্য বড় শহবেব চেযে বেশীই। ভালো কবে থাকার কোন অসুবিধে নেই।"

"তুমি তো ভেবেছিলে এযারপোর্ট থেকে বেবোলেই জংলীরা বর্শা উঁচিয়ে তোমাকে দেখে তাড়া কববে", জগদীশ বলে।

বীনা মুখ লাল করে বলে, "না, কখখনো আমি সেটা বলিনি—তুমি এসব বলো না। বিপ্লবদা কি ভাববে বলতো। একেবারে বাজে কথা। বিপ্লবদা, ও সবকিছু বানাচ্ছে।"

"যেটা সত্যি সেটা বলছি।" জগদীশ অম্লানবদনে বলে।

ঝগড়াটা জমবার আগেই কথা ঘুরোনোর জন্য বলি, "জগদীশ, ধরে নিলাম এখানে তোমরা ভালোই আছো, কিন্তু আফ্রিকানদের কতোটা জানো ?"

জগদীশ বলে, "সত্যি বলতে কি, যোগাযোগটা সামান্যই। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার যেটা অসুবিধা, কাজের মধ্যে যদি দেখাশোনা না হলো তাহলে জানবোই না। আর এখানে সাধারণ আফ্রিকান কে আসবে বলো ? এই যে ওদের সব দেখছো, ওদের মধ্যে আফ্রিকাত্ব কতটুকু ? আমরা ওদের সঙ্গেই মিশি। মাঝে মধ্যেই ওরা আমাদেব বাড়ীতে খেতে ডাকে, আমরাও পাল্টা ডাকি, নানারকম আলোচনা হয়। সেই থেকেই যতটুকু জানি।"

বীনা খোঁচা দিয়ে বলে, "জগদীশদের সব বড় বড় ব্যাপার—বড় বড় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ। ও মুখে বড় বামপন্থী কথা বলবে কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল না হলে কথা বলবে না।

আমরা কিন্তু বলি। আমি বাজারে যাই, দরদাম করি, দুটো কথা বলি। আমাদের বাড়ীতে কাজের লোক আছে, ওদের সঙ্গে গল্প করি। আমরা মেয়েরা তোমাদের মতো পণ্ডিত না হলেও কম জানি না।"

জগদীশ একটু মৃদু হেসে বলে, "বীণু ঠিকই বলেছে, ও বেশ সুন্দর ফ্রেঞ্চ বলে, আর আমি এখনও ভাষাটা আয়ত্তে আনতে পারলাম না। ইডেপের মধ্যে ফ্রেঞ্চ না জানলেও লে—সবাই প্রায় দুটো ভাষা জানে। আমি মেনে নিচ্ছি আমাদের বৌদের এখানে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশী।"

কাঁধে এক বড় মাপের চড় মেরে কে বললো, "হাই ম্যান।"

পিছনে তাকিয়ে দেখি নর্মান। ডঃ নর্মান গির্ভান, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার লণ্ডনে ছাত্রজীবনের বন্ধু।

বললাম, "নর্মান! লং টাইম নো সি। হাই। কখন এলে?"

নর্মান ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হলেও ওর বং ফর্সা। ও মিশ্রজাতির, মুলাতো। কিন্তু ঘন কোঁকড়া চুল, আফ্রিকানদের মতোই। নাক, ঠোঁট, চিবুকে ককেশীয় ভাব। জামাইকার মানুষ, এমনি চুপচাপ, বেশী কথা বলে না। চোখে চশমা। কিন্তু সেটা হলো বাইরের পরিচয়। সম্মেলনের আলোচনায় যেটুকু বলে তার সবটুকুই প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরস্থির ভঙ্গিতে বলে, কিন্তু বক্তব্যটা অনেক সময়ই দারুণ জঙ্গী এবং বিতর্কমূলক। সম্মেলনের বাইরে ফূর্তি সন্ধানী। খেলা, সিনেমা, নভেল, সবকিছুতেই দারুণ উৎসাহ। সব ব্যাপারেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় এবং তর্কে যেতে প্রস্তুত।

আলোচনার মধ্যে ভাষার প্রশ্ন চলে এলো। আমি বললাম, "দেখেছো, আমরা যারা ইংরাজীভাষী তারা একপাশে গোল হয়ে কথা বলছি, আর এপাশে ফরাসী-জানা মানুষগুলোর জটলা। ভাষা কেমন ভাগ করেছে আমাদের, অথচ দু চারজন বাদ দিলে এই ঘরে কারো মাতৃভাষাই ইংরাজী বা ফরাসী নয়।"

নরম্যান বলে, "ঠিকই বলছো। আরো অদ্ভুত লাগবে যখন দেখবে একটা জাতই ভাষার ভিত্তিতে কেমন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। 'আকান'রা আইভরী কোষ্টেও আছে ঘানাতেও আছে, কিন্তু দুটো আলাদা ভাষায় কথা বলে। আইভরী কোষ্টের আকানরা ফ্রেঞ্চ বলে, ঘানার আকানরা ইংরাজী বলে। 'হাউসা'রা নিজের নাইজিরিয়া দু জায়গাতেই রয়েছে—দুটো আলাদা ভাষায় কথা বলে। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে তফাৎটা হয়তো কম, ওরা স্থানীয় আফ্রিকান ভাষাতেই কথা বলবে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষগুলো এক থাকছে না—এবং ভাষাগত তফাৎ থেকে অন্যান্য তফাৎও বাড়ছে। আবিজঁ, ডাকার, বা টিম্বাকটুর মানুষ বাইরে গেলে যাবে প্যারিসে। লেগোস, আক্রার লোক যাবে লণ্ডনে। যোগাযোগ দুটো আলাদা ধরনের, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্কও বাড়ছে দুটো আলাদা ধারায়। বিদেশী শাসন চলে গিয়েও যায়নি। অর্থনৈতিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক নির্ভরতা থাকছে, এবং কোন কোন জায়গায় বাড়ছে।"

আমি জিগ্যেস করি, "আচ্ছা, আফ্রিকায় তো নানা ধরনের বিদেশী শাসনের অভিজ্ঞতা। আমি ছোটবেলা শুনতাম ফরাসীরা নাকি বৃটিশদের চেয়ে অনেক বেশী ওদের উপনিবেশের মানুষের সঙ্গে মিশতো? এটা কি ঠিক?"

নর্মান হাসে, বলে, "তুমি একেবারে 'লে ম্যানের' মতো কথা বলছো। ফরাসীরা কেমন ভাবে ওদের উপনিবেশ চালাতো জানতে হলে জিগ্যেস করো আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম বা সেনেগালের মানুষকে। তুমি যা শুনেছো আর ওরা যা বলবে তার মধ্যে কোন মিল পাবে না। দূরের মাঠ সবসময়ই সবুজ। আলজিরিয়ার কোন কোন লোক হয়তো বলবে বৃটিশরা

ফরাসীদের চেয়ে অনেক বেশী ভদ্র ছিল। এই সব ধারণার কোন মূল্য নেই। বিদেশী শাসন মানেই জবরদস্তী।"

পর্তুগীজরা ?

তখনও আফ্রিকায় পর্তুগীজ শাসন চলছে—এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ, কেপভার্টে। নর্মান বলে, "এটা অবশ্য ঠিক যে ইংরেজ বা ফরাসীদের তুলনায় পর্তুগীজরা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বিয়েটিয়ে অনেক বেশী করেছে। কিন্তু তার থেকে প্রমাণ হয়না যে ওরা আফ্রিকানদের সামাজিকভাবে সমান বলে ভাবে। এ্যাঙ্গোলা বা মোজাম্বিকের ইউরোপীয়দের জন্য ক্লাবে কালোরা তো নয়ই, এমনকি মেষ্টি জো বা মুলাতোদের ঢোকাও বারণ। তারপর, একই কাজে তুমি দেখবে একজন পর্তুগীজ একজন আফ্রিকানের চেয়ে কুড়িগুণ অবধি বেশী মাইনা পাবে। তারপর ধরো যেভাবে ওরা জোর করে এত লক্ষ লক্ষ লোককে প্রতি বছর দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে কাজ করতে পাঠায়—এই ব্যবহার কি সমান ভাবলে করতো ? কোন পর্তুগীজ শ্রমিককে কি ওইভাবে আইন করে পুলিশ দিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে জোর করে পাঠাবে ?"

পার্টি তখনও পুরোদমে চলছে। আলাপ হলো পাপ কন আর ফ্রানসিনের সঙ্গে। পাপ সেনেগালের, ফ্রানসিন ফরাসী। পাপ সেনেগালের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ডাকারের এক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল, ফ্রানসিন ইডেপে কাজ করে—গবেষণার ব্যাপারে সহকারী হিসাবে।

পাপ নিজের নাম বলেই বললো, "পপ-কর্ন নয় কিন্তু।" সেটা অবশ্য আমি জানতাম। সাসেক্সে আমার ছাত্রী মরিন ম্যাকিনটস আগেই ওর কথা আমাকে বলে রেখেছিল, এবং এসেই ওর খোঁজ করবো বলে ঠিক করেছিলাম। আলাপ হয়ে ভালোই হলো।

জগদীশ বললো, "তুমি এলে ভালোই হলো। বিপ্লব একটু আগে বলছিল যে ফরাসী জানা আফ্রিকানরা আমাদের অচ্ছুৎ করে রেখেছে।"

পাপ বলে, "আমিও তোমাদের অচ্ছুতই মনে করি।এলাম শুধু ইংরাজীটা ঝালাতে, আর মরিনের মাস্টারকে দেখতে।"

পাপ আফ্রিকানদের তুলনায় ছোটখাটো, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। গায়ের রং ঝকঝকে পালিশ করা কালো—মুখে সহজ হাসি। ফ্রানসিন লম্বা, ভালো মানুষ গোছের চেহারা।

পাপ গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে, "তোমরা মনে করো সমস্ত আফ্রিকানই এক। সবাই দেখতে একরকম হবে, পোষাক, পছন্দ, চিন্তা-ভাবনা সমস্ত এক ছাঁচে হবে। তোমরা ভুলে যাও যে আফ্রিকা একটা দেশ নয় মহাদেশ, বাহান্নটা দেশ আছে এর মধ্যে। হিসেব করে দেখো, ভারতের মতো দশটা দেশ আমরা আফ্রিকায় ঢুকিয়ে দিতে পারি। তোমরা কি বলো, এশিয়ান ? না ভারত, চীন, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ? তাহলে আফ্রিকার বেলায় সমস্ত মহাদেশটাকে গোল্লা পাকিয়ে একটা দেশ বলে ভাবো কেন ?"

তারপর স্যাণ্ডউইচ মুখে পুরতে পুরতে বলে, "এই যে আমি আফ্রিকার লোক, আমি আফ্রিকার কতোটা জানি বলো ? আমি জানি সেনেগাল, আমার দেশ, গাম্বিয়া, সিয়েরালিওন, আইভরী কোষ্ট, বড় জোর পশ্চিম আফ্রিকা। কিন্তু বাকি আফ্রিকাটা ? আর তোমরা অল্প কদিন আফ্রিকার কোন একটা দুটো দেশে এসেই ভেবে নেবে যেন আফ্রিকার, গোটা মহাদেশটার সবকিছু জেনে ফেলেছো। এমনকি হয়তো ভ্রমণ কাহিনীও লিখে ফেলবে। 'সেনেগালে চার সপ্তাহ'। মোটা বই, নানা সরস উপাখ্যান, যা আফ্রিকা না এসেও লেখা যেতো। এমন আফ্রিকান সমাজের কথা লিখবে যা আজকাল আর নেই। কিছু মনে করো না এসব বলছি বলে, কিন্তু আফ্রিকান এক্সপার্টদের দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেল।"

কথা শুনে বুঝতে সময় নিলো না কেন মরিন বারবার বলেছে পাপ কনের সঙ্গে দেখা করবার

॥ তিন ॥

পশ্চিম আফ্রিকার গত সাড়ে পাঁচশো বছরের ইতিহাস যেন আটলান্টিকের স্রোত বেয়ে গড়ে উঠেছে। ভূমধ্য সাগর যেখানে আটলান্টিকে মিশেছে সেখানেই মরক্কো। মরক্কো থেকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে নীচে নামলে প্রথমেই পড়বে পশ্চিম সাহারা যা নিয়ে স্পেন-মরক্কোর সঙ্গে মুক্তি সংগ্রামী পোলিসারিওর যুদ্ধ চলছে। তারপরই মৌরিটানিয়া, এবং মৌরিটানিয়া যেখানে শেষ সেখানেই সেনেগাল শুরু। নামটা সেনেগাল নদী থেকে। আফ্রিকার বহু দেশেরই নাম নদীর নাম ধরে, যেমন নিজের, নাইজিরিয়া, কঙ্গো বা জাম্বিয়া।

কিন্তু সেনেগাল মানে নিছক আর একটা দেশ নয়। ইবনবতুতা সাহারা পার হয়ে এই অঞ্চলে ঢুকে প্রথম কালো মানুষ দেখলেন। মৌরিটানিয়া পর্যন্ত আফ্রিকা আরবদের বার্বারদের। সেনেগাল থেকেই বলা চলে কালো আফ্রিকা বা নিগ্রো আফ্রিকার শুরু। 'নিগ্রো' শব্দটা অবশ্য আজকাল কেউ বলে না, যেহেতু বর্ণবিদ্বেষী-মার্কিনিরা বা দক্ষিণ আফ্রিকানরা ঐ শব্দটার জাতিগত অর্থের বদলে হীন কিছু বলে প্রচার করেছে। ওদের 'কালো' কথাটাই তাই চলে। এক কালে ওদেরও বোঝানো হয়েছিল 'কালো' মানেই নীচু, যাদের কোন সভ্যতা নেই, ইতিহাস নেই, ধর্ম নেই। এখন অবশ্য সেই হীনমন্যতাবোধ কমে আসছে। 'ব্লাক ইজ বিউটিফুল', 'কালোই সুন্দর'—একথা বেশ জোরের সঙ্গেই আজকাল ওরা বলে।

আফ্রিকা একটা দেশ নয়—মহাদেশ। ফ্রানসিনের সঙ্গে গাড়ীতে করে ওদের বাড়ী যেতে যেতে বারবার পাপের ওই কথা মনে হচ্ছিল। সত্যি কতো সহজে আমরা সবকিছু জলের মতো তরল করে ফেলি, বুঝে যাই। যেন সমস্ত আফ্রিকাটাই সত্যি সত্যি একটা ছকে তৈরী। অথচ কতো তফাৎ!

তফাৎটা শুধু উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণের মধ্যে নয়। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোও কতো আলাদা। কেউ বিরাট বড়ো, যেমন আটকোটি মানুষের দেশ নাইজিরিয়া। কেউ দারুণ ছোট, যেমন ছাব্বিশ লক্ষ মানুষের দেশ সিয়েরালিওন। কোথাও ঘাসটুকু পর্যন্ত নেই, শুধু বন্ধ্যা মাটি, যেমন মালীর এক বড়ো অংশ। কোথাও জঙ্গল তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে সমস্ত অঞ্চলটা ছেয়ে ফেলেছে, যেমন গালফ অফ গিনির উপকূলের কাছের এক বড়ো অংশ। কোথাও বিরাট বিরাট মহানগরী, যেমন নাইজিরিয়া, কোথাও শহরগুলো বড়ো জনপদ ছাড়া কিছু নয়, যেমন সীমান্তের ওপারের নিজের। কোথাও পাহাড় আছে, কোথাও মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ সমতলভূমি।

তফাৎ শুধু প্রকৃতিতে নয় মানুষেও। ইংরেজদের একটা কথা আছে, যার বাংলা মানে, "চীনেরা সবাই একরকম দেখতে।" সত্যিই কি তাই? আমি যখন প্রথম ইউরোপ গেলাম, আন্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনে চড়লাম, চারপাশে তাকালাম তখন মনে হলো যেন সমস্ত ইউরোপীয়ানই একরকম। সত্যিই কি তাই? ওদের বয়স বুঝতাম না। যাকে দেখে চল্লিশ মনে হতো সে আসলে চব্বিশ, যাকে দেখে পঞ্চাশ মনে হতো সে আসলে পঁয়ষট্টি। ওদের সকলেরই রঙ

একরকমই চোখে লাগতো, তাই চমকে যেতাম যখন ওদেরই একজন আরেকজনকে দেখিয়ে বলতো, 'ডার্ক'। উচ্চারণের পার্থক্য বোঝা দায় ছিল—ককনি, স্কটিশ, আইরিশ, ইটালীয়ান, সব ছিল আমার কাছে সমান। চেহারার তফাৎও বোঝার উপায় ছিলো না। আমার অন্তত এক বছর লেগেছে এই তফাৎগুলোর খানিকটাও বুঝতে।

আফ্রিকান সবাই যে আমার চোখে সমান সেটা আমারই দৈন্য। এখানেও অন্তত বছরখানেক লাগবে তফাৎগুলো ভালো করে বুঝতে। কিন্তু সেই সময় আমার নেই।

তবু চেহারার খানিকটা খানিকটা পার্থক্য আমার অনভিজ্ঞ চোখেও না পড়ে পারে না। বেশী-কম লম্বা সব দেশেই আছে, কিন্তু ঘাসের বনের মানুষগুলো ঢ্যাঙ্গা বেশী। উত্তরের দিকের মানুষগুলোর চেহারায় ককেশীয় আদল কিছুটা রয়েছে, যতো দক্ষিণে যাবে ততো খাঁটি বাণ্টু চেহারা চোখে পড়বে। সাহারার দিকে মুসলমান বেশী, দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে খৃষ্টান বা আদিধর্মের উপাসকরা বেশী। এইরকম মোটমাট কতোগুলো ধারণা খুব চটপট করে ফেলা যায়।

ফ্রানসিন বলে, "এ সমস্তই হচ্ছে বাইরের তফাৎ। এই তফাৎগুলোর গুরুত্ব নেই যে এমন নয়, কিন্তু মানুষেব চিন্তার, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকগুলোও কম না। আচার-ব্যবহাব, সংস্কৃতি,.লেখা, ছবি—এসবেও বলতে পাবো এক এক জায়গায় এক বকমের ঘরানা। এমন নয় যে মোটা ব্রাশ দিয়ে রঙ টেনে দিয়ে বললে, এইটা আফ্রিকা। তুলিগুলো সূক্ষ্ম হতে হবে। রঙেব মিশ্রন, নানারকম শেড বুঝতে হবে।"

ওদের বাড়ী এসে গেল। ছিমছাম ছোট বাড়ী—ঘরগুলো বেশী বড় না। পাপ গাড়ীর শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো৷ করমর্দন হলো। আমাদের বান্নার দায়িত্ব পাপের। কিন্তু আসল রান্নাটা, মাংসের, ফ্রানসিন আগেই করে বেখেছিল।

ওদের লাউঞ্জের দেয়াল, কোন আর কার্পেট ভর্তি নানারকম জিনিস। কতো রকমের মুখোস—কমেডিয়ানের হাসি, কুৎসিৎ হাসি, ভয়ংকর হাসি, ক্রুদ্ধ চাহনি, শয়তানের দৃষ্টি। চামড়ার হরেকরকমের জিনিস—সোফার ওপর, কার্পেটে, ব্যাগে, থলিতে। নানা ধরনের, আকারের ঢাল, বর্শা। একটা বড ড্রাম। বেশ কিছু কাঠের তৈরী মূর্তি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আফ্রিকাতে এসেছি।

লাউঞ্জে কিছুক্ষণ গল্পের পর খাওয়ার টেবিলে। পাপ জিগ্যেস করলো, "আজ কি আলোচনা হলো?"

সংক্ষেপে বললাম, তারপর যোগ করলাম, "একটা জিনিস ভালো লাগছে যে প্রত্যেকের আলোচনার মধ্যেই একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। কেউ বৃটিশ নীতির কথা বলছে, কেউ বা ফরাসী, পর্তুগীজ, ডাচ, জার্মান বা বেলজিয়ান নীতির কথা বলছে। ইতিহাস বাদ দিয়ে কেউ বলছে না। সবকিছুর পিছনেই এক বড় ব্যাখ্যা, ইতিহাস। এই পদ্ধতিটা আমার খুব পছন্দ। সত্যিই তো, কোন কিছুই ইতিহাস ভুলে ব্যাখ্যা করা যায় না।"

পাপ বলে, "ঠিকই বলেছো। তবে অনেক সময়ই ইতিহাসের মাত্রাটা বিদেশী শাসনের সময়টার ওদিকে যায় না। আমি বলবো চিন্তাটা আর একটু পিছন দিকে ছড়িয়ে দিতে। বৃটিশ বা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তাৎপর্য তো বুঝতেই হবে—কিন্তু আরো ভালো করে বুঝবো যদি জানি ওরা আসবার আগে অবস্থা কি ছিলো?"

ডিনারের পর কফিতে চুমুক দিতে দিতে পাপ বললো, "দ্যাখো, ইউরোপীয়ানদের ধারণা ওরা এখানে আসবার আগে আমাদের কোন ইতিহাস ছিল না। এক সময় আমরাও অনেকে সেটা ভাবতাম। একজন নামী অক্সফোর্ডের অধ্যাপক, প্রফেসর এগার্টন বিশের দশকে লেখেন,

ঔপনিবেশিক যুগের আগে আফ্রিকার জীবন ছিল শূন্য, নিরস এবং হিংস্র বর্বরতার ইতিহাস। এইটাই ছিল ধারনা। এখন অবশ্য আমরা জানি সেই কথা ভুল।"

সারা সন্ধ্যাটাই কাটলো আফ্রিকার ইতিহাস নিয়ে আলোচনায়।

সাহারা শেষ হয়ে যেখানে ঘাসের বন সামান্য শুরু সেখানে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরেই বলা চলে এক বিস্তৃত নগর সভ্যতা ছিলো। টিম্বাকুট, গাও, ওয়ালাটা, আদাগোষ্ট, সবই প্রায় মানচিত্রের একটা লাইনের ওপর পরপর সাজানো শহর—১৫ ডিগ্রী অক্ষাংশের ধারে কাছে। শহর মানে তখনকার যুগের হিসেব মতো হাজারে, এখনকার মতো লাখে নয়। পাঁচ হাজার থেকে পনেরো হাজারের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্ত শহরে ছিল। টিম্বাকুট ছিল পশ্চিম আফ্রিকার সংস্কৃতির পীঠস্থান, সেখানে ছিল পণ্ডিতদের ভীড়। নানা বিতর্ক হতো ধর্ম নিয়ে আচার নিয়ে সমাজ নিয়ে। এমনও শোনা যায় যে ওখানকার বাজারে সবচেয়ে বিক্রী বেশী হতো বইয়ের। ইটের বাড়ীর প্রচলন ওই সব শহরে অন্তত আজ থেকে আট নশো বছর আগেও ছিল।

সাহিত্য সংস্কৃতি যাই বলি না কেন, এই নগর সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল বাণিজ্য। অক্ষাংশ ধরে পরপর সাজান এই অবস্থান কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়। সাহারার ওপারের উত্তর আফ্রিকার শহরগুলোর বাণিজ্যের মূল যোগাযোগই ছিল মরুভূমির এপারের, দক্ষিণের ঘাসের বনের মধ্যের এই শহরগুলো। এই শহর থেকে সংগ্রহ হতো আরো দক্ষিণের পশুর চামড়া, হাতির দাঁত, লোহা এবং সোনা। সেই সব, বিশেষ করে সোনা এবং হাতির দাঁত, সাহারা পার হয়ে, বার্বার-আরব-ফিনিশীয়-রোমান-গ্রীক হাত ঘুরে ইউরোপে পৌছতো। ইউরোপীয়রা সাহারার দক্ষিণের দেশগুলোর কথা জানতো না, জানতে চাইতো না, কিন্তু ওদের প্রয়োজনীয় সোনার এক বড় অংশই আসতো পশ্চিম আফ্রিকার ওই শহরগুলো থেকে।

ব্যবসাই যখন শহরের বৃদ্ধি এবং প্রাচুর্যের ভিত্তি তখন এটাই স্বাভাবিক যে বড়ো বড়ো বণিকরাই হবে শহরের মাথা। সাহারা বাণিজ্যের এক বড় অংশ ছিল 'ডিউলা'দের হাতে—যারা ছোট ছোট কোম্পানী তৈরী করে চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই এই বাণিজ্যে নিয়োজিত।

ওরা শুধু সাহারা পার করে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকার যোগাযোগের মাধ্যম ছিল না। দক্ষিণের তৃণভূমি থেকে রেইন ফরেস্ট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাণিজ্যও ছিল ওদের নিয়ন্ত্রণে। ওদের দক্ষিণের দেশগুলোর এক বড়ো প্রয়োজন ছিল লবণের। সেই লবণ আসতো সাহারার টাগহাজা মরুদ্যান থেকে। সেখানকার লবণের পাহাড় ভেঙ্গে চালান দেয়া হতো দক্ষিণে। একদিকে সোনা এবং হাতির দাঁত, অন্যদিকে লবণ আর কাপড—এই ছিল মূল বাণিজ্য। তবে আজকের নাইজিরিয়া এবং ঘানার দক্ষিণভাগের দেশগুলোও তাঁত জানতো এবং ভালো কাপড় তৈরী করতে পারতো। নাইজিরিয়ার লাল চামড়ার কাজ 'মরক্কো লেদার' নামে পৃথিবীতে পরিচিত ছিল।

"ঘানা বলতে আমরা এখন যে অঞ্চলটা বুঝি তার সঙ্গে প্রাচীন ঘানার কোন ভৌগোলিক সম্পর্ক নেই," পাপ বলে, "আসল ঘানা ছিল অনেক উত্তরে—এখনকার সেনেগাল, গাম্বিয়া থেকে পশ্চিমে আজকের মালী, নিজের, আপার ভোল্টা ইত্যাদি ধরে। তবে একটা ঠিক কথা যে, বর্তমান ঘানার লোকদের ধারণা ওরা কয়েকশ বছর আগে উত্তর থকেই নেমে এসেছে। এবং যতোটা জানা যায় সেই ধারণায় ভুল নেই। তবে 'ঘানা' নামকরণের পিছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল। গোল্ড কোষ্ট স্বাধীন হবার পর আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী নেতা কোয়ামি নক্রুমা চাইলেন আফ্রিকার পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে। এই নামকরণ যেন তাই এক নতুন বৃহত্তর আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী দীক্ষা। পুরনো ঘানার ভৌগোলিক অবস্থান যাই হোক, তার স্পিরিট যেন নতুন

ঘানার মধ্যেই নক্রুমা আনতে চেয়েছিলেন।"

আজকের ঘানা গালফ অফ গিনির ওপর, আইভরী কোষ্টের পূর্বদিকে যেখানে আটলাণ্টিক মহাসাগর আফ্রিকা মহাদেশের ভূখণ্ডে অনেকখানি ঢুকে পড়েছে। সেদিনের ঘানা ছিল সেনেগালেরই কাছাকাছি—বেশ কিছুটা উত্তরে।

সেই ঘানা ছিল এক বড়ো সাম্রাজ্য—যেখানকার প্রশাসন ছিল কেন্দ্রীভূত। এর ইতিহাস পঞ্চম বা ষষ্ঠ দশক থেকেই। স্পেনের মুসলমান লেখক আল-বকরির লেখাতেই জানি একাদশ শতাব্দীতে ঘানা কতো শক্তিশালী ছিল বা বড়ো ছিল। সিসিলির রাজার সভাসদ আল-ইদ্রিসির ভাষ্যতেও আমরা জানি কি বিরাট বিরাট ভোজসভার আয়োজন ঘানার সম্রাট করতেন। এতো খাওয়াতে গেলে টাকার দরকার। তাই তৈরী হলো এক বিস্তৃত, নিপুণ কর ব্যবস্থা। কর আমদানী রপ্তানী দুয়ের ক্ষেত্রেই চাপলো, কিন্তু রপ্তানীর ক্ষেত্রে হার ছিলো দুগুণ বেশী। সোনার বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত, শুধু সোনার ধুলোটুকু সাধারণ প্রজারা পেতে পারতো।

'ঘানা' কথার আক্ষরিক মানে—যুদ্ধের সেনাপতি। যে কোন সাম্রাজ্যের মতোই যুদ্ধে জয়লাভ ছিল এক বড়ো প্রয়োজন। কিন্তু রাজা শুধু সেনাপতি ছিলেন না। ধরে নেয়া হতো যে নানা অলৌকিক এবং ঐশ্বরিক শক্তির তিনি অধিকারী। তিনি ছিলেন দেবতার প্রতিনিধি—প্রায় দেবতা।

ঘানা ধ্বংস হলো উত্তর থেকে আক্রমণে। সেই আক্রমণ হলো মৌরিটানিয়া থেকে। বার্বররা ইসলামের পতাকা নিয়ে ঢুকলো ১০৫২ সালে। ১০৭৬ সালে ঘানার রাজধানী কুম্বি ওদের দখলে এলো—যে সময়ে ফ্রান্সের ডিউক অফ নরম্যাণ্ডি ব্যাটল অফ হেস্টিংস জিতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসলেন। ১২৩০ সালে ঘানার সাম্রাজ্যের দখল এলো সেনেগালের রাজা সুমানগুরুর হাতে। কুম্বির ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে।

ঘানা সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠলো মালী সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যের একটা অংশ নিয়ে আজকের মালী। কিন্তু তখনকার মালী সাম্রাজ্যের সীমানা ছিলো আটলাণ্টিক থেকে আজকের নাইজিরিয়া এবং তৃণভূমি থেকে দক্ষিণে গালফ অফ গিনির রেইন ফরেস্ট অবধি।

১৩৭৫ সালে ইউরোপের মাওরকার একজন কার্টোগ্রাফাব আফ্রিকার মানচিত্র তৈরী করলেন। সেই মানচিত্রের ওপরই মালীর সম্রাটের ছবি। সুসজ্জিত, রঙীন পোশাক, মাথায় মুকুট, হাতে দণ্ড, চামড়া-আবৃত সিংহাসনে বসে—যেন সমস্ত আফ্রিকাই তার পায়ের তলায়। ১৩৫৭ সালে ইবন বতুতা মালী পৌঁছে সপ্রশংসভাবে বললেন, এখানের মানুষের নীতিবোধ আছে, বিচার আছে, অন্যায় হয় না, মারামারি চুরিডাকাতি নেই বললেই চলে। এখানকার সম্রাটের শাসন খুব কড়া, তাই সাধারণ মানুষের জীবনে প্রচুর শান্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যেও কোন বাধা নেই।

প্রথম মালী সম্রাট সুনদিয়াটা কেইটা—যিনি পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন। তারপরের প্রত্যেক সম্রাটের নামের আগে উপাধি 'মানসা' যোগ করা হতো। 'মানসা' মানে প্রাক্তন। সবচেয়ে নামকরা মানসা, মানসা মুসাও পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন, ১৩১২ থেকে ১৩৩৭ সাল। মুসার রাজত্বকালেই প্রথম ইটের বাড়ীর প্রচলন হয়, টিম্বাকুট হয়ে ওঠে পশ্চিম আফ্রিকার বিদ্যার্চর্চার প্রাণ কেন্দ্র। সাহারা হয়ে মানসা মুসার মক্কা যাবার কাহিনী শুধু পশ্চিম কেন উত্তর আফ্রিকার লোকগাথার অংশ। অসংখ্য উট, দাস, সৈন্য নিয়ে মুসার অভিযানের মতো বড়ো না হলেও পরবর্তী বেশ কয়েকজন মানসাও মক্কা গিয়েছিলেন।

আফ্রিকার বড়ো সাম্রাজ্য বলতে মালী আর ঘানাই প্রথমে বলবার মতো। কিন্তু অন্তত আরো দুটো বড় সাম্রাজ্যের কথা জানা যায়, যার অবস্থান সাহারার প্রান্তের তৃণভূমি ধরে হলেও যেন খানিকটা পূর্বে। একটা ছিল চাদ হ্রদকে কেন্দ্র করে কানেম-বোরনু সাম্রাজ্য, ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে

১৮৪৬ পর্যন্ত যার কার্যকাল। আরেকটি নাইজার নদী যেখানে দক্ষিণে মোড় ঘুরলো তার কাছের শহর গাওকে কেন্দ্র করে সোংঘে সাম্রাজ্য। এছাড়া রয়েছে বর্তমান নাইজিরিয়ার উত্তরের কানো, কাটসিনা, জারিয়া, সোকোটো ইত্যাদি হাউসা রাজ্য, এবং দক্ষিণে বর্তমান ঘানার এক বড়ো অংশ জুড়ে 'আশান্তি রাজ্য।

আইভরি কোষ্টের রাজধানী আবিজঁর রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে খালিক নাকভির সঙ্গেও একই আলোচনা হচ্ছিল। ঘানা বা মালী সাম্রাজ্য নিয়ে আমার উচ্ছ্বাস খালিকের পছন্দ হলো না। প্রথমে খানিকটা ঠাট্টার বক্র হাসি, তারপর বললো, "আচ্ছা তুমি তো বামপন্থী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তোমার আবার এই সাম্রাজ্য ওই সাম্রাজ্যের ওপর এতো ভালোবাসা কেন?"

সেই নিয়ে পরের দু ঘণ্টা দারুণ তর্ক হলো। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আজকের সাম্রাজ্যবাদ আর তখনকার সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক বিচার একই মাপকাঠিতে হবে না। মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশের গতিপথে সাম্রাজ্যবাদও একটা বড়ো ধাপ। বড়ো রাজ্য বা সাম্রাজ্য মানে মানুষ শুধু তার নিজের গোষ্ঠী, জাতি বা ট্রাইবের ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে না। নানা রকমের, জাতের-ধর্মের-ভাষার মানুষ একই প্রশাসনের ছাতার তলায় সংঘবদ্ধ হচ্ছে। সেটাও এক বড়ো কথা। তারপর এর একটা অর্থনৈতিক দিক আছে। এই যে এতো বিলাস, ভোজসভা, ধূমধাম, সাজসজ্জা, সৈন্যবাহিনী, উটবাহিনী—তার মানে উৎপাদন ব্যবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি। না হলে এদের খাওয়াবে কে? প্রশাসনগতভাবে অনেকখানি দক্ষতা, কর্মবিভাজন এবং শৃঙ্খলা না হলে এই ব্যবস্থা চলবে না। পুরনো গ্রামভিত্তিক, সংকীর্ণ জীবনের তুলনায় এটা অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া।

মোট কথা, এত বড় বড় সাম্রাজ্য যারা তৈরি করে তাদের ইতিহাস, আর যাই হোক, "শূন্য, নিরস, আর হিংস্র বর্বরতার ইতিহাস" নয়। হিংস্রতা বা বর্বরতা থাকলেও বলা যাবে না সেটা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বর্বরতার থেকে বেশী ছিল। এবং শূন্য বা নিরস কোনোভাবেই নয়।

"এই ইতিহাস জানা নেই কেন?" আমি জিগ্যেস করি।

"এখন জানা যাচ্ছে", পাপ বলে, "আগে যে জানতো না তার দুটো বড় কারণ। এক নম্বর, বিদেশী শাসকরা জানতে চাইতো না, বা নিজেরা জানলেও অন্যদের জানাতে চাইতো না। ওরা দেখাতে চাইতো যে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠার মতো যোগ্যতা আমাদের নেই। আমাদের সমাজ গ্রাম বা অঞ্চলভিত্তিক, আমাদের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই—এই সমস্ত প্রচার ওদের দরকার ছিল। দু নম্বর যেটা, সত্যি কারের ভালো ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানীদের আফ্রিকা সম্বন্ধে আগ্রহ খুব সাম্প্রতিক ঘটনা। আফ্রিকানরা নিজেরাও এই নিয়ে আগে ভাবতো না, এখন ভাবে। এখন পুরনো শহরের ভগ্নস্তূপ, ভাস্কর্য, ভূপর্যটকদের লেখা, কথকদের ভাষ্য, এবং আরও দশ রকমের উপাদান জড়ো করে আফ্রিকার প্রামান্য ইতিহাস তৈরী হচ্ছে। আজকে আমরা আফ্রিকা নিয়ে গর্বিত, আমরা নিজেদের ছোট ভাবি না, তাই ইংরেজ বা ফরাসীরা আসবার আগের আফ্রিকাটাও আমরা জানতে চাই।"

ফ্রানসিন বলে, "একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি লক্ষ্য করবে পর্তুগীজ কলোনীগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনে। এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ, সর্বত্রই এটা নজরে পড়বার মতো। সব জায়গাতেই রাজনৈতিক আন্দোলন আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদ যারা করলো তাদের একেবারে সামনের সারিতে ছিলো লেখকরা। প্রতিবাদের ধরনটাও ছিলো প্রথমদিকে পুরোপুরি সাংস্কৃতিক। গান, কবিতা, থিয়েটার—এই ছিল মাধ্যম। এর মধ্য দিয়ে বলা হতো, আফ্রিকা আগে কি ছিলো, পর্তুগীজরা সেই আফ্রিকাকে কোথায় নিয়ে গেল, ভবিষ্যৎ

কি ? এই লেখা আর কাহিনীর মধ্য দিয়ে সমগ্র আফ্রিকার হৃদয়ের জ্বালা ফুটে বেরুতো। যে সব মানুষ এই থিয়েটার বা গানের আসরে আসতো তারা বুকে আগুন চোখে জল নিয়ে ফিরে যেতো। সেইভাবেই শুরু।"

তারপর বললো, "পর্তুগীজরা আগে ওই সব নাটক গান নাচের কোন মূল্য দিতো না। বরং হাসতো, বিদ্রুপ করতো। কিন্তু যখন দেখলো যে এই সব অনুষ্ঠানের পর মানুষগুলো পাল্টে যাচ্ছে, তখন সেন্সর করতে শুরু করলো। সেই নিয়ে সংঘর্ষ, তারপর একটু একটু করে প্রতিবাদ দানা বাঁধলো, সংগঠিত রূপ নিলো। মোজাম্বিকে এডুয়ারডো মণ্ডলেন, গিনি-বিসাউতে আমিলকার কাবরাল, এ্যাঙ্গোলায় অগাস্টিন নোটোর নেতৃত্বে ষাটের দশকের প্রথম থেকে সংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ শুরু হলো, যা এখনও চলছে।"

পাপ বলে, "তুমি দেখবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির বহু নেতাই লেখক, সাহিত্যিক বা কবি। এর আগেও সেটা হয়েছে। কাবরালেব লেখা নিশ্চয়ই পড়েছো। এর আগে প্যাট্রিস লুমুম্বা, জোমো কেনিয়াট্টা এরাও লেখক ছিলেন। ওদের আন্দোলন বা সংগ্রামেব দুটো দিকই আছে।একটা বাস্তব, যেমন বন্দুক, বুলেট, অন্য অস্ত্র যোগাড করো, ট্রেনিং দাও, মুক্তিফৌজের শৃঙ্খলা রাখো, প্রচার চালাও, কৌশল ঠিক কবো, শত্রুকে নাজেহাল করো। আর একটা—স্বপ্নের দিক, ওরা সত্যি সত্যিই স্বপ্ন দেখে। ওদেব স্বপ্ন স্বাধীন মুক্ত আফ্রিকা। স্বপ্ন যদি না দেখতো তাহলে ওদের সংগ্রাম এতো জোরদার হতে পারতো না। সেখানেই সংস্কৃতি ইতিহাস এইসব চলে আসছে।"

পাপেব গলার স্বরে উত্তেজনা—আমার শুনতে খুব ভালো লাগে।

"ট্রাইব জাতি এইসব প্রশ্ন কি উঠছে না ?" জিগ্যেস করি।

উত্তরটা ফ্রানসিন দেয়, "হ্যাঁ, সেই সমস্যা আছেই। ছোট করে দেখা ভুল। কিন্তু ওদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব এই ব্যাপারে পুরো সচেতন। পর্তুগীজদের নীতিই ছিল ট্রাইবের সঙ্গে ট্রাইবকে লড়িয়ে দাও। কঙ্গোতে বেলজিয়ানরা সেটা বেশ ভালোভাবেই করেছে। কিন্তু এ্যাঙ্গোলা-মোজাম্বিক-গিনিবিসাউতে সেই চক্রান্ত কাজ কবেনি, এবং ওখানকার মানুষ ওই ফাঁদে পা দেয়নি। ওরা চেষ্টা করেছে সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরী করতে। কিন্তু সেখানেও ঝামেলা নেই এমন নয়—যেমন এ্যাঙ্গোলার দক্ষিণ দিকের জাতগুলোকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থনে ডঃ সাভিম্বির নেতৃত্বে 'ইউনিটা' নাম দিয়ে পাল্টা সংগঠন তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে ঝোঁকটা হচ্ছে আফ্রিকান চেতনা তৈরীর দিকে।"

পাপ বলে, "আফ্রিকা আফ্রিকা। আমরা এখন অনেকেই ওইভাবে ভাবি। সেনেগাল, গাম্বিয়া, ঘানা ছাড়িয়ে আফ্রিকা। সেই চেতনা থেকেই আমরা এখন পুরানো ইতিহাস ঘাঁটছি।"

আমার মনে পড়ে গেল, এই পাপই ইডেপের পার্টিতে আমাদের বকেছিল, কেন আমরা ভুলে যাই আফ্রিকা একটা দেশ নয়, মহাদেশ। ওকে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না, "তুমিই তো বলেছিলে, আফ্রিকা অনেকগুলো, একটা নয়, এবং সবটাকে নিয়ে একটা গোল্লা পাকিয়ে আফ্রিকা বলা ভুল। এখন যা বলছো তার সঙ্গে কি খানিকটা বিরোধ নেই ওই কথার ?"

পাপ আমার দিকে এক ঝলক তাকায়। তারপর হা হা করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, "আমার দুটো কথা দুটো আলাদা পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি। ওইদিন আমার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল তোমাদের মত বাইরে থেকে আসা মানুষরা যারা অল্প খেটে খুব সহজেই গোল গোল করে আফ্রিকাটা বুঝে যাও। আমি বলতে চেয়েছি আমাদের মহাদেশের বিস্তারের কথা। এখানে সাহারার মতো বিশাল মরুভূমি আছে, কঙ্গো নদীর অববাহিকার বিরাট জঙ্গল আছে, নীল নদীর মতো নদী আছে, হাজার রকমের মানুষ আছে। ওইদিন আমার বক্তব্য ছিল অতি সরলীকরণের

বিরুদ্ধে—আমার মহাদেশের জীবনের বৈচিত্র্য, নানা রকমের রূপরসগন্ধ তোমাদের জানাতে চেয়েছি। কিন্তু আজকের আলোচনা অন্য। আজকের আলোচনা আফ্রিকার আত্মা নিয়ে, সত্তা নিয়ে। আমরা নিগ্রো, আমাদের সকলের ইতিহাসের ওপরই বিদেশী শাসনের কাঁটা পরা বুট জুতোর দাগ। আজকের সমস্যাগুলোও এক—দেশের মধ্যে জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক, অন্যদিকে প্রাক্তন শাসক দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বন্ধন। তাই সমস্ত রকম তফাৎ সত্ত্বেও আমরা ভুলি না আমরা আফ্রিকান।”

সেদিন মনে অনেকখানি পরিতৃপ্তি নিয়ে রাত বারোটায় হোটেলে ফিরলাম।

॥ চার ॥

বীণা অনুযোগ কবে বলে, "এই যে সাবাদিন আমি খেটে খেটে মবলাম, তোমাব বন্ধু কি আমাকে এতটুকু সাহায্য কবে ? বাজাব আমাকেই কবতে হবে, আলু কাটো, পেঁযাজ কাটো, বান্না কবো, এই হলো আমাব কাজ। আব তোমাব বন্ধু অফিসে যাবেন বাডী আসবেন, কুটোটা নাডবেন না। বলো, ওব কি হাত লাগানো উচিৎ না ?"

জগদীশ প্রতিবাদ কবে বলে, "বীণু, তুমি একদম ঠিক বলছো না। তুমি কি আমাকে বাজাব কবতে দাও ? আমি বাজাবে গিযে কিছু কিনলে সেটা কি কখনো তোমাব পছন্দ হয ? তুমি তো তখন আবাব বাজাবে ছুটবে সব কিছু পাল্টাতে। "

বীণা আবো ক্ষেপে ওঠে, "তোমাব চালাকি বুঝি না ? তুমি ইচ্ছে কবে খাবাপ কবে বাজাব কবো, যাতে তোমাকে বাজাব কবতে না বলি। না বলে নিজেব পছন্দসই জিনিষগুলো তো ঠিক ঠিক কেন সেখানে তো ভুল হয না। সমস্ত ভুল আমাব বলা জিনিষ কিনবাব বেলা, সংসাবেব জিনিষ কিনবাব বেলা। তোমাকে নিযে সত্যি পাবি না।'

জগদীশ বলে, "কেন বীণু, সেবাব যে তোমাব জন্য একটা সুন্দব ফ্রেঞ্চ পাবফিউম কিনলাম ?"

এবাব বীণাব মুখে বিদ্রুপেব হাসি, "হ্যাঁ ঠিকই কিনেছিলে, ভালো জিনিষই কিনেছিলে, কিন্তু লেবেলটা পর্য্যন্ত ভালো কবে পডোনি, পডলে দেখতে ওটা ফ্রেঞ্চ নয ইটালীযান। তবে জিনিষটা খাবাপ নয বলে আপত্তি কবিনি। কিন্তু তোমাব কোন ক্রেডিট নেই।"

তাবপব আমাব দিকে তাকিযে বলে, "এই যে দেখ বিপ্লবদা, তুমি আছো। সকাল থেকে সন্ধ্যা ও কতো বকবক কবছে। কথা আব থামে না। আব অন্য সময কি কবে ? হয চুপ কবে কিছু ভাববে নয বই পডবে। আমাব সঙ্গে কি একটা কথা বলে ?"

জগদীশ অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলে, "কেন, তুমি বলো কবে কথা বলতে চেযেছো আমি বলিনি। তোমাব সঙ্গে তো বোজ দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে— কতো কথা বলতো ? যা বলবাব তা বলিও। সেদিন এসে বললাম না, কোফিব ছেলে হযেছে ?"

"হ্যা, ওইটুকু বলে আমায় কৃতার্থ কবলে। কিন্তু আবো কতো জানবাব আছে। ছেলেটাব ওজন ঠিক ছিল কিনা, প্রসবেব সময কোন গণ্ডগোল হলো কি না, দেখতে কেমন, আবো কতো হাজাবো বকমেব ব্যাপাব মানুষ জানতে চায। কিন্তু বিপ্লবদা বুঝলে, তোমাব বন্ধুব এইসব ব্যাপাবে বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ নেই। ওব আমাব সঙ্গে আলোচনাব কিছু নেই। ও শুধু বড বড ব্যাপাব ভাববে—বিশ্বশান্তি, সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক ভাবসাম্য, বাণিজ্যিক বিনিমযেব ঝোঁক। আচ্ছা, সেগুলো নিযেও তো আমাব সঙ্গে কথা বলতে পাবে। আমি কি অশিক্ষিত যে ওসব বুঝবো না? আমাবও তো বিশ্ববিদ্যালযেব সববকম ডিগ্রী আছে। কিন্তু ওব ধাবনা আমি কিছুই বুঝি না, অশিক্ষিত। আমি শুধু সাবাদিন ধবে বান্না কববো।" বীণা গর্জায।

জগদীশ বলে, "কিন্তু বান্নাটা তোমবা অতো জটিল বলে চালাবাব চেষ্টা কবো কেন ? আমার

তো ধারনা রান্নার থেকে সহজ জিনিষ কিছু নেই। রেসিপি বই দেখ, ঠিক মতো সব প্রেসার কুকারে ফেলো, বন্ধ করো, তারপর যখন ফিসসসস করে শব্দ হতে থাকবে, তখন বাষ্পটা সরিয়ে দিয়ে ঢাকনা খুলে দিলে, ব্যস রান্না তৈরী, তখন প্লেট পাতো, ঢালো, খাও—এই নিয়ে এতো কথা বলবার কি আছে ?"

বীণা দারুন ক্ষেপে যায়, "বিপ্লবদা, তুমিই বলো এই সব কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে না। রান্না এতো সহজ, আর তোমরা যা সব করো দারুন কঠিন ! তোমার বন্ধুকে জিগেস করো, ও কি কোনদিন নিজে রেঁধে দেখেছে, ফিসসসস করে শব্দ হবার পর প্রেসার কুকারের লিড খুলে খেয়েছে ? এবং সেটা করলেও কি যে খাবার তৈরী হবে সেটা খাবার মতো হবে ? ঠিক আছে, কাল থেকে তুমিই রান্না করো।"

আমি দু হাত তুলে বললাম, "শান্তি শান্তি। দু পক্ষই চুপ। আমি রেফারী—এখন হুইসেল বাজিয়ে দিয়েছি। বীণা, তোমার চা আর ভাজিব রাউণ্ডটা হোক, তাবপর আবার বিতর্ক চলবে।"

বীণা বললো, "চা-ভাজি করছি, কিন্তু শুধু তোমার জন্য, ও পাবে না।" তারপব জগদীশের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বান্নাঘরে গেল।

আমি ভাজিতে কামড় বসাতে বসাতে বললাম, "বীণা, একটা কথা কিন্তু না বলে পার্বছি না। তুমি প্রায়ই বলো জগদীশের কোন বসকস নেই, মুখে কথা নেই। আমি কিন্তু একটা জিনিষ রোজই লক্ষ্য করি। জগদীশ যেভাবে 'বীণু' বলে তোমাকে ডাকে এমন মিষ্টি করে বৌকে ডাকতে আর কোন স্বামীকে শুনিনি। এই ডাক, যেন 'কানেব ভিতর দিযা মরমে পশিল গো' টাইপের। এই ব্যাপারে তোমাব কোন বক্তব্য আছে ?"

বীণা বললো 'ধ্যাৎ', তারপব মুচকি হেসে আর একটা ভাজির প্লেট জগদীশেব সামনে রেখে আবার রান্নাঘরে চলে গেল। আমি জগদীশকে বললাম, "আমাকে একটা ধন্যবাদ দাও ভাজির জন্য।" জগদীশ ওব গামাল আবদেল নাসেব ধরনেব গোঁফের ফাঁকে ইষৎ হাসলো।

বীণাকে বললাম, "চলো আজকে আউটিং হোক। ডাকার শহরটা ভালো করে দেখে আসি।"

বীণা বললো, 'ডাকারে কিছু দেখবার নেই। না আছে বড়ো বড়ো প্রাসাদ বা মনুমেন্ট, না কোন বড়ো সাজানো মাঠ, না কোন ভালো ধরনের ভাস্কর্য। বরং এসো গল্প করি।"

গল্প আমরা করলাম। ফ্রায়েড চিকেন আর চা সহযোগে গল্প যতক্ষণ চালানো যায়। পরনিন্দা পরচর্চার কোটা পূরণ হলো। তারপরও হাতে সময় থাকলো। অতএব বেরোলাম ডাকারের রাস্তায়।

কলকাতার বা ভারতের মানুষের বিদেশে যাওয়া উচিত নয়। যেখানেই যাই জিগেস করি, "লোকসংখ্যা কতো ?" যে সংখ্যাই বলুক, তুলনা করি ভারতবর্ষ ও কলকাতার লোকসংখ্যার সঙ্গে। সেটা হয়তো ঠিক না।

"সেনেগালের মানুষ কতো ?"

"পঞ্চাশ লক্ষ।"

"মাত্র !" পঞ্চাশ লক্ষ মানে ভারতের একশো ভাগের এক ভাগেরও কম, এমনকি কলকাতার লোকসংখ্যার চেয়েও কম।

আয়তন ! ৭৮৬৮৪ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের আড়াই গুণ। এতো বড় দেশ অথচ এত অল্প মানুষ !

কিন্তু শুধু কি সেনেগাল ! পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশেরই এই অবস্থা, এক নাইজিরিয়া বাদে। নাইজিরিয়া অবশ্য বিশাল, আট কোটি মানুষের দেশ। বাকিরা লক্ষের মাপে গুণবার মতো।

বুঝতে অসুবিধা হয়না যে জনসংখ্যার সমস্যার ধরনটা এখানে অন্যরকম। ক্যামেরুন, আইভরি কোষ্ট, এইরকম অনেক দেশের সরকারই চায় জনসংখ্যা আর একটু দ্রুত বাড়ুক। এখন বছরে প্রতি একশো মানুষে আড়াই জন করে বাড়ে—যা ভারতের তুলনায় আনুপাতিক হারে বেশী। ওরা তাতেও সন্তুষ্ট নয়। দেশটা যা বড়ো তাতে অনায়াসে এককোটি মানুষ থাকতে পারে।

অনেকের ধারণা, মানুষ এখানে আর কিছুটা বাড়লে চাষও আধুনিক হবে, প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নত হবে। এসটার বসরাপ, সমীর আমীন—ওদের সেইরকমই চিন্তা। মানুষ একটা বড় অঞ্চলে অল্প অল্প করে ছড়িয়ে থাকলে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল অফিস করবার অসুবিধে। কিছুটা ঘনত্ব তাই দরকার। আর কিছু মানুষ যোগ হলে তাই ভালোর সম্ভাবনাটাই বেশী।

কিন্তু সমস্যা যেখানে, মানুষের এক বড়ো অংশই থাকে একটা মাত্র বড় শহরে—ডাকারে। ডাকার মহানগরী, সমস্ত সেনেগালের মানুষের ছ ভাগের এক ভাগের অবস্থান সেখানে। লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ। ডাকার ছাড়া শহর তেমন নেই বলা যায়। সেন্ট লুইস বা থিইস ছোট শহর। ডাকারই যেন একমাত্র শহর, বাকিটা গ্রাম। যে গ্রাম ছাড়ে সে ডাকারে আসে—কাজ পাক বা না পাক।

সমুদ্র উপকূলের বন্দব, রাজধানী যে এইভাবে মহানগরী হয়ে উঠবে সেটা আশ্চর্যের নয়। ঔপনিবেশিক যুগে সেইটাই ছিল নিয়ম। ভারতবর্ষের যেমন কলকাতা বা বোম্বে, উত্তর আফ্রিকায় যেমন আলজিয়ার্স, টিউনিস, ত্রিপোলি বা কাসাব্লাঙ্কা। ঔপনিবেশক অর্থনীতি মানেই হলো তৈরী মাল আমদানী, আব কৃষিজাত পণ্য, নানা ধাতু, কাঁচামাল রপ্তানি। আমদানি-রপ্তানিই বড়ো কথা। ফ্রেঞ্চরা থাকতো ডাকারে, এবং সমস্ত সেনেগাল থেকে জিনিসপত্র এসে জমা হতো এই বন্দরে। রাস্তাঘাটের যোগাযোগও তৈরী হলো ডাকারের সঙ্গে। কিন্তু এক গ্রাম থেকে পাশের গ্রামে যাবার রাস্তা হলো না। ডাকার ফুলে ফেঁপে বড়ো হয়ে উঠলো।

১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলনে আফ্রিকার ভাগ বাঁটোযারা হলো। নাইজিরিয়া, গোল্ডকোষ্ট, সিয়েরালিওন, গাম্বিয়া থাকলো বৃটিশদের হাতে। জার্মানী পেলো টোগোল্যাণ্ড। বাদবাকি প্রায় সব অঞ্চল, নাইজিরিয়া বাদে, পেল ফরাসীরা। সেনেগাল, আইভরি কোষ্ট, আপার ভোল্টা, ডাহোমী, এর সঙ্গে ফবাসীরা পেলো 'সাহেল' দেশগুলো—মৌরিটানিয়া, নিজের, মালী, চাদ। উত্তর আফ্রিকায়ও লিবিয়া আর ইজিপ্ট বাদে আর সব ফবাসীদের হাতে এলো।

১৮৫৭ সাল থেকেই সেনেগাল ফরাসীদের হাতে। ডাকার এদেরই তৈরী। ওখানকার রাস্তাঘাট বাড়ী সেকথা বারবার মনে করিয়ে দেয়। ফরাসীরা অন্যান্য জায়গাব মতো এখানেও ফরাসী স্কুল তৈরী করেছে—ওদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিছু মানুষকে ফরাসী নাগরিকত্ব দিতেও ওদের আপত্তি হয়নি।

ডাকারের ইতিহাস খুব সাম্প্রতিক। নাইজিরিয়ার বড়ো বড়ো শহরগুলোর কৌলিণ্য ডাকারের নেই। দুশো বছর আগেও ডাকার বা কেপভার্ট অঞ্চলে কিছু জেলেদের গ্রাম ছাড়া আর কিছু ছিলো না। ডাকারের উন্নতি বড় করে শুরু হলো ১৯০৫ সালের পর, যখন সমস্ত ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী করা হলো। এর আগে ডাকারের কাছের দ্বীপ গোরিই ছিল রাজধানী। সেই অভিশপ্ত দ্বীপের কথায় পরে আসছি।

ডাকার যখন বাড়তে শুরু করলো তখন জনসংখ্যা বাড়লো বড় বড় কদম ফেলে। ১৮৭৮ সালেও ডাকারের মানুষ ১৬০০, কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই হয়ে গেল বিশ হাজার। বিশের দশকে হলো ত্রিশ হাজার, ১৯৩৬ সালে ৯২৬০০। ১৯৫৪ সালে প্রায় আড়াই লাখ, এবং আমি যখন গেলাম, সত্তর দশকের মাঝামাঝি, তখন আট লাখ। এক বিশাল মহানগরী—দেশের মোট

পঞ্চাশ লক্ষ জনসংখ্যার এক বড়ো অংশ থাকে এখানেই। দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ডাকারে। মোট বিদ্যুতের শতকরা ৯৪ ভাগ, টেলিফোন লাইনের শতকরা ৭৪ ভাগ রাজধানীতেই, শিল্পগত চাকরীর শতকরা ৪৫ ভাগও ডাকারে, এবং পুরো কেপভার্ট অঞ্চল ধরলে শতকরা ৭৬ ভাগ। কোলকাতার মতোই ডাকার যাকে বলে 'প্রাইমেট সিটি'। গাছেরই মতো বিশাল আকার নিয়ে ঘাস আর ঝোপের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে। অন্য বড় শহরের মধ্যে থিসের লোকসংখ্যা ১১৭০০০, কুলক-এ একলক্ষ, এবং পর্তুগীজদের তৈরী পুরনো উত্তরের শহর সেইন্ট লুইসে ৮৮০০০।

শহরের মূলকেন্দ্র এভিনিউ জর্জ পঁপিদু, ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নামে, এবং লামিন গুয়ে। সেখানে গেলে দেখা যাবে লেবানন থেকে আসা ব্যবসায়ীদের—যাদের হাতে সেনেগালের অর্থনীতির এক বড় অংশ। সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল ডাকার প্লাটো—যেখানে বড়লোকবা থাকে, স্বাধীনতার আগে শুধু ফবাসীবা থাকতো। সমস্ত বড় শহরের মতো এখানেও বড় মাপেব বস্তী আছে, যেখানে থাকে গ্রাম থেকে আসা বা অন্য দেশ থেকে আসা মানুষেবা।

পাপ বলে, "তুমি শুনলে অবাক হবে, আমাদের রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেংগোর ছিলেন একজন ফরাসী নাগবিক, এবং ফরাসী পার্লামেন্টের সদস্য।আইভরি কোস্টেব রাষ্ট্রপতিও ছিলেন এইরকম একজন।"

নর্মান গির্ভানের ভাষায়, সেংগোর হলেন "আংকল টম।" ছোটবেলায় পড়েছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দয়ালু উদার প্রেম, নিঃস্বার্থ নিগ্রো দাস আংকল টমের কথা। হ্যারিয়েট বিচার স্টোর লেখা কাহিনী। সেই কাহিনী পড়ে চোখের জলে ভেসেছি, আংকল টমকে ভালোবেসেছি। এখন, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ মহলে তেমনি অন্যত্র, "আংকল টম" একটা গালাগালি। আংকল টম পরাধীনতা-আশ্রয়ী মেরুদণ্ডহীন এক কালো। হয়তো ভালো, কিন্তু অপদার্থ এবং সাদা মালিকের চামচে।

রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দেখলাম। পাপ দেখালো, দেখাতে হয় বলে। কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই। ওর চোখে, যেমন নর্মানের চোখে, সেংগোর মানেই ফরাসী শাসনের ধারাবাহিকতা। সেংগোর ওদের লেজুড়। যেমন আইভরি কোস্টের বাষ্ট্রপতি হুফে বয়নিও লেজুড়। এরা যতদিন রয়েছে, যেভাবেই হোক, ফরাসী শাসনও রয়েছে।

সেংগোর কবি, সাহিত্যিক।সেংগোবের লেখায় আফ্রিকাব সনাতনী আত্মার সনাতনী চেতনার আত্মপ্রকাশ। সেংগোরের দর্শন 'নেগ্রিচিউড' বা 'নিগ্রোত্ব', যা পশ্চিম আফ্রিকাব নিজস্ব কিন্তু আধুনিকতাকে বর্জন করবে না। ১৯৬৬ সালে বিশ্ব নিগ্রো আর্টের উৎসব হলো ডাকারে—সেংগোরের ব্যবস্থাপনায়। সেংগোর বলেন, তার উদ্দেশ্য 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্র', 'মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র' নয়। এটা হলো প্রচার। পাপ বাঁকা হাসে, বলে, "কবি বলে কিন্তু ভেবোনা মনটা কোমল। সেংগোর আসলে ডিরেক্টর। ও কোন বিরোধিতা সহ্য করে না। কয়েক মাস অন্তরই আমার কলেজে সেংগোরের পুলিশের হানা। আমার প্রায় ভাত মাছ খাওয়ার মতোই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ওরা সবকিছু তছনছ করবে, ছাত্রদের পেটাবে। ওদের ধারণা আমরা শত্রু পক্ষ।"

সেনেগালে নির্বাচন হয়, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরোপুরি সেংগোরের হাতে। পার্টি একটাই। এবং এই 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্রে' বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে কোন বাধা নেই। কেউ কেউ বলেন 'বাদাম সমাজতন্ত্র'। বাদাম ওখানকার মূল পণ্য, বিদেশী মালিকানায় চলে।

সেংগোরের দেশে কোন বিরোধী শক্তি নেই। সেংগোরই সব। কিন্তু যেমন হয় এই ধরনের

দেশে—বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়ে ওঠে মূল বিরোধী শক্তি। ছাত্ররা অধ্যাপকরাও এলিটেরই অংশ—সামন্ততান্ত্রিক পরিচিতি, উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনী সমাজের স্বাচ্ছল্য, কিন্তু ছাত্রদের বয়স কম, খানিকটা আদর্শবোধ আছে, সাংসারিক দায়িত্ব ঘাড়ে চাপেনি, ঝুঁকি নিতে পারে। তাই এক-পার্টির শাসন বসিয়েও সেংগোরের চিন্তার শেষ নেই। বারবার বিশ্ববিদ্যালয় দখল হয়েছে—বিশেষ করে ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে—যখন প্রতিরোধ শুধু সৈন্য বসিয়ে দমন করা যায় নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা লাগাতে হয়েছে। ১৯৬২ সালে প্রধানমন্ত্রী ডায়াসের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ছাত্ররাই সেংগোরের আসল মাথাব্যথা।

সমীর আমিনকে জিগ্যেস করলাম সেংগোরের কথা। সমীরের ইডেপের ডিরেক্টর হিসাবে মাঝেমধ্যে সেংগোরের সঙ্গে দেখা হয়। এবং যতদিন ইডেপের ডাকারে অবস্থান ততদিন ওর ডিরেক্টরকে সেংগোরের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক রাখতেই হবে। সমীর বললো, ইডেপের কাজে কোন অসুবিধা হয় না। সেংগোর বরং চায় ইডেপ আরো বড় হোক, আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলের মানুষরা এখানে ভীড় করুক। ইডেপ যেন সেংগোরের প্লাটফর্ম—আফ্রিকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যার মূল্য অনেক। কিন্তু ইডেপের সঙ্গে ব্যবহার থেকে সেংগোরের মূল্যায়ন করা যায় না। আসল পরিচয় দেশের মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে। পাপ-কণদের বক্তব্যের মূল্য তাই অনেক বেশী।

নর্মান গির্ভান বলে, "এই নিগ্রোত্বের কথাটা একটা বড় ধাপ্পা। কবিতায় পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। দেখছো না নিগ্রোত্বের কবি সেংগোরের জমানায় ফরাসী আচার, সংস্কৃতি, জীবনপদ্ধতি কিভাবে ঢুকেছে! সেংগোর আফ্রিকার কথা বলে এখানে হাততালি পাবার জন্য, কিন্তু ফ্রান্সের নাগরিক হতে তো ওর আপত্তি হয়নি! সেংগোরের পোষাক দেখেছো—যা প্যারিস থেকে হপ্তায় হপ্তায় কেচে আসে! ওর কাছে গিয়ে পাবে ফরাসী পারফিউমের গন্ধ। কই, আফ্রিকার ঢোলা পোষাক তো পরে ঘোরে না! আসলে এই সব কথা সাধারণ পশ্চাদপদ মানুষগুলোকে আফিং দিয়ে বুঁদ করিয়ে রাখার জন্য। সেনেগালের মালিক ফ্রান্স। সেংগোব ওদের পুতুল।"

এবার গেলাম মূল বাজারে।

সবচেয়ে ভালো লাগলো ওদের উডওয়ার্ক। কাঠের কাজটা ওরা জানে। বহু বছরের ঘরানা। এক প্রিয় বিষয় মানুষ, কিন্তু সেই মানুষ যেন অনেকটা অতিরঞ্জিত। মায়ের কোলে শিশু, কিন্তু যামিনী রায়ের কোমলতার স্পর্শ নেই, বরং রয়েছে বেশ খানিকটা রুক্ষতা—বিরাট থলথলে স্তন যেন ঠেসে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে শিশুর মুখে। কোথাও মাথা ছোট, কিন্তু বিরাট লম্বা গলা, কোথাও ক্লাউনের কুৎসিৎ এক চোখ বোজা হাসি। আরও চোখে পড়ে উগ্র যৌনতা—যেমন স্তনেব বা পুরুষাঙ্গের অতিরঞ্জনে। অনেক মূর্তিই বীভৎস আদিম ভয়ংকর। তবু যেন মনে হয় এই শিল্প দৃঢ় ঋজু, বলিষ্ঠ। এ এক অন্য ধারা—হয়তো সকলের রুচিতে মিলবে না। কিন্তু এই কাঠের কাজের পিছনে যে যথেষ্ট কল্পনা বা প্রচেষ্টা রয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমি আর্টের সমঝদার নই। কিন্তু ভালো লাগে ওই মূর্তিগুলো। ইউরোপের আর্টেও এর প্রভাব না পড়ে পারেনি।

আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প, ভাস্কর্য এবং সংগীতে পশ্চিম আফ্রিকার প্রভাব সত্যিই লক্ষ্য করবার মতো।

বাজারে আরও চোখে পড়লো পশ্চিম আফ্রিকার মেয়েদের। ওদের পোষাকের তিনটে বড় ভাগ। নিচের ভাগটা যেন লুঙ্গীর মতো। ওপরটা ব্লাউজের মতো। তার ওপরে জড়ানো চাদরের মতো। মাথায় টুপির মতো করে স্কার্ফ বাঁধা। রঙচঙে ডিজাইন। বাজারের আলুয়ালীর

কাপড়ও বেশ ঝকঝকে।

আর পিঠে এই চাদরের গিঁট দিয়ে বাঁধা ছোট্ট শিশু। ওখানকার বাচ্চাদের কান্না বিশেষ কানে আসে না। গিঁটের দুপাশ দিয়ে দুটো ছোট্ট পা বের হয়ে থাকে। মায়ের গলার পাশ দিয়ে টুলটুল করে তাকায়, সবকিছু দেখে। মায়েরা স্বচ্ছন্দে ওদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছোটাছুটি করে, কাজ করে—পরম নিশ্চিন্তে বাচ্চাও মাকে জড়িয়ে বসে থাকে।

সেনেগালে জন্মহার বড্ড বেশী—তাই বাচ্চার সংখ্যা প্রচুর। যেখানে যাবেন সেখানেই কিলবিল করছে শত শত শিশু। দু বছর পর্যন্ত সেই বাচ্চা মায়ের কোলেই বাঁধা থাকে।

পশ্চিম আফ্রিকার মেয়েরা একদম পর্দানশীন নয়। মুসলিম মেয়েরাও না। এখানেই উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে এক বড় পার্থক্য। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ছুটছে, হাসছে, চিৎকার করছে, গান গাইছে। গ্রামে চাষের কাজে মেয়েদের অংশ খুব বড়। ওরাই খাবারের একটা বড়ো অংশ তৈরী করে।

বাজারের বিক্রেতাদের বড় অংশটাই মেয়ে। খানিকটা দরদাম করে কিছু জিনিসপত্র কিনলাম। মহিলা কোঁচড় থেকে পয়সা বের করে ভাঙ্গানি দিলেন। ওর মাথার পাশে টুলটুল ছোট্ট দুটো চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

সারা দুপুর আর বিকেল ঘুরেই ডাকার দেখা শেষ হলো। সত্যিই বিশেষ কিছু দেখবার নেই। বীণাই ঠিক। বীণার আপত্তিটা বুঝতে কষ্ট হয় না। ওর নিশ্চয়ই এসব দেখে দেখে চোখ পচে গিয়েছে। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন গ্রীষ্মকালে এক বড়ো অত্যাচার ছিলো ভারত থেকে আসা বন্ধু ট্যুরিষ্টরা। যেই আসুক তাকে নিয়ে চলো হাইড পার্ক কর্ণার, ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবি, ডাউনিং ষ্ট্রিট, ট্রাফালগার স্কোয়ার, ম্যাডাম টুসা, টাওয়ার অফ লণ্ডন, এই সব। ওদের সকলের কাছেই এইসব নতুন, কিন্তু আমি কতোবার দেখবো ?

তবু সব দেখা সমান নয়। রাজপ্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয়, বাজার, চার্চ, সমুদ্র সৈকত—এইসব দেখা একরকম। মানুষ দেখা আর এক রকম। সেই দেখার কোন শেষ নেই। লণ্ডনেও ম্যাডাম টুসার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসতো, কিন্তু অক্সফোর্ড ষ্ট্রিটে শনিবাব হাঁটবার সময় থাকলে সুযোগ নিতাম। সেখানকার রাজপথে কতো রকমের মানুষ! কতো রঙ, পোষাক, চেহারা, কতো ভাষা, কতো ভঙ্গী। ডাকারের রাস্তাতে তাই মানুষ দেখতে ভালো লাগলো।

এখনকার মানুষের কালো রঙে সূর্যের দ্যুতি। ওদের লম্বা, সুঠাম চেহারা দেখবাব মতো। ওদের হাঁটা চলায় এক সহজ স্বচ্ছন্দভাব। এমনকি গরীব হীনতম মানুষও আমাদের দেশের অনেক গরীবদের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে থাকে না।

"এটাই এক বড় সমস্যা।" পাপ বলে, "ওদের প্রয়োজন কম বাসনা কম। যা পেলো তাতেই খুশী। সঞ্চয় করো, টাকা করো, এই চিন্তা ওদের মধ্যে নেই। আজকের যুগের শিল্পচেতনার যুগের ব্যক্তিবাদী ভবিষ্যৎমুখী ধ্যানধারণা এখনও গড়ে ওঠে নি। শিল্প এখানে বিশেষ নেই, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দুর্বল। যা পেলো খেয়ে খরচ করে উড়িয়ে দিলো। কিছু থাকলো না তাতেও পরোয়া নেই। কোনরকমে দিন গেলেই হলো।"

তবে এটাই পুরো সত্য নয়। ফরাসী আশ্রয়ে এক শহরভিত্তিক 'এলিট' গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর ওরাই সেনেগালের কর্ণধার। তবে যা সামান্য শিল্প বা পুঁজিবাদী কৃষি এখানে রয়েছে তার মালিকানা বিদেশীদের হাতে। সেনেগালের নতুন মধ্যবিত্ত ফরাসী সাজতে পারলেই খুশী। তবু সেই ফরাসীয়ানাটা আলজিরিয়া বা টিউনিসিয়ার মতো নয়।

"বলতে পারো তিন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রভাব এখানে রয়েছে। একটা হলো পুরোপুরি পশ্চিম আফ্রিকার—নাম দিতে পারো নিগ্রো সংস্কৃতি। আর একটা হলো উত্তরের থেকে আসা,

মরক্কো বা মৌরিটানিয়া হয়ে ইসলাম। তৃতীয়টা হলো খৃষ্টান, ক্যাথলিক, ফরাসী প্রভাবিত। এই তিনটে ধারাই সেনেগালে চোখে পড়বে।" পাপ বলে।

ডাকারের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ে বারান্দায় ফুটপাথে বা বাজারে চাদর পেতে প্রার্থনারত মুসলিমদের। এখানকার সংখ্যাধিক্য মানুষ মুসলমান—এবং এরা দাবী কববে যে অন্য যেকোন দেশের মুসলমানের থেকে এরা কম ধার্মিক নয়। তবু আচারে বিচারে ব্যবহারে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে পার্থক্য চোখে না পড়ে উপায় নেই।

এখানকার মেয়েরা যতোটা স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে বেড়ায় তা সাহারার উত্তরে সাধারণভাবে ভাবা যাবে না। তবে এটাও ঠিক যে পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে ঘানা, দক্ষিণ নাইজিরিয়া ইত্যাদি অমুসলমান দেশের তুলনায় মেয়েরা এখানে একটু পিছিয়ে।

উত্তর আফ্রিকার মতো এখানে ইসলাম পুরোপুরি তরবারির ডগার ওপব নির্ভর করে আসেনি। মরক্কো এবং মৌরিটানিয়া থেকে দুবার বড়ো আক্রমণের কথা বলেছি—যাব চোট পড়েছে ঘানা এবং মালি সাম্রাজ্যেব ওপর। প্রশাসনেব পবিবর্তনের সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে—যেমন সর্বত্রই ওই যুগে হতো।

কিন্তু আর একটা বড়ো কারণ ছিলো, বাণিজ্য। পশ্চিম আফ্রিকাব বড়ো বড়ো শহরগুলোর অর্থনীতির ভিত্তিই ছিল সাহারা-পাবেব বাণিজ্য। ধর্ম এক হলে বাণিজ্যেব সুবিধা হতো। তাই ইসলাম প্রথমে ভালো কবে ছড়ায় শহরে, এবং বণিকদেব মধ্যে—পরে এসেছে গ্রামে এবং অন্য ধরনের মানুষের মধ্যে। অবশ্য সাহেল অঞ্চলেব ফুলানিরা এক বড়ো ব্যতিক্রম—ওরা অনেক আগেই মুসলিম হযেছে।

"এখনও বহু মানুষ নতুন করে মুসলমান হচ্ছে।" পাপ বলে, "কিন্তু কারণটা জবরদস্তি বা বাণিজ্য নয়—ভাবগত বা দর্শনগত। যতো দিন যাচ্ছে আদিম ধর্মের প্রভাব কমছে। কিন্তু খৃষ্টান এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে ইসলামই ওদের কাছে অনেক আপন মনে হচ্ছে। একটা জাতীয়তাবাদী দিকও আছে। ফবাসী বা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মের যে যোগাযোগ সেটাও বেশ খানিকটা বিরুদ্ধমত তৈরী করেছে।"

"কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবও বযেছে", জগদীশ বলে, "প্রভাবটা যতোটা না ধর্মগত তাব থেকে বেশী আচারগত। যতো বাণিজ্য বাডছে, ছোট ছোট শিল্প হচ্ছে, ততোই পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ছে। আধুনিক হওয়া মানেই ইউরোপীয় জীবনযাত্রা, এমন একটা ধারণা এখন সর্বজনীন।"

"তার মানে তোমরা ভেবো না যে আদি ধর্মের কোন প্রভাব নেই", ফ্রানসিন বলে, "এখানকার খৃষ্টানরা এবং মুসলমানরা এখনও বেশ বড়ো মাত্রায় সনাতনী আফ্রিকান লোকাচার মানে। সেটা তুমি দেখবে ওদের বয়ঃসন্ধির উৎসবে, মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে, জমি হস্তান্তরের প্রথায়, সংগীতে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়।"

"হাই।"

রাস্তার ওপার থেকে কার গলা। একটু পরেই ওপাশ থেকে গাড়ীর স্রোতকে এড়িয়ে ছুটে এলো ব্রেণ্ডা।

"ব্রেণ্ডা, তুমি এখানে কি করছো?" জিগেস করি।

ব্রেণ্ডা চোখের চশমাটা ঠিক করতে করতে বলে, "এটা আমার হোম-কামিং।"

"হোম কামিং! তুমি তো বারবেডোজের মেয়ে। সেনেগালের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? বলো বেড়াতে এসেছো। কদিনের জন্য?"

ব্রেণ্ডা কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেও

ছটফট করছে, স্টিলোটা হিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচছে। মুখ খুশিতে ঝলমল।

ব্রেণ্ডা মুলাতো, মানে মিশ্র জাতি। গায়ের রং কফির মতো। ইউরোপ আর আফ্রিকার নানা মানুষের নানা উপাদান ওর চুলে, মুখে, রঙে, নাকে, এবং সব মিলিয়ে চেহারায়।

আমার প্রাক্তন ছাত্রী কিন্তু অর্থনীতির নয়। আমার দু বছর পি-এইচ-ডি ছাত্রত্বের পর লণ্ডনের গোর্ল্ডস্মিথ কলেজে কিছুদিন পড়াই—কিন্তু সমাজতত্ত্ববিভাগে পরিসংখ্যানের অধ্যাপক হিসাবে। ব্রেণ্ডাই ছিল একমাত্র কালো ছাত্রী, তবে রঙটা, যা আগেই লিখেছি, সেই অর্থে কালো নয়। আপাততঃ বারবেডোজে স্কুল শিক্ষিকা।

ব্রেণ্ডা বলে, "না, সত্যি সত্যি হোম-কামিং। বারবেডোজের মেয়ে আমি ঠিকই, কিন্তু তার আগেও আমি আফ্রিকার মেয়ে, পশ্চিম আফ্রিকার মেয়ে। আমার মূল এখানে, গাঁটছড়া পুরোপুরি বাঁধা। এখানে এসেছি রুটসের সন্ধানে—দিন দশেক থাকবো।"

এই ব্রেণ্ডা আমার লণ্ডনের জানা ব্রেণ্ডা নয়। লণ্ডনের ব্রেণ্ডা অন্য ভাষায় কথা বলতো। আমি ওকে জিগেস করেছিলাম আফ্রিকার কথা। ও বলেছিল, "আমরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান, আফ্রিকান নই। আমরা অনেক বেশী এগিয়ে। বলতে পারো মার্কিন মহাদেশেরই অংশ। আমাদের জীবনপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী কিছুই আফ্রিকার সঙ্গে মিলবে না।"

"কিন্তু তোমাদের ইতিহাস?"

ব্রেণ্ডা তখন মুখটা একটু কুঁচকে বলেছিল, "ইতিহাস তো অনেকখানি টানা যায়। একসময় আমরা সবাই বাঁদর ছিলাম—সেটা জেনে আমাদেব এখন কি লাভ! এখন চেষ্টা করতে হবে বাঁদর থেকে যতোটা দূরে সম্ভব সরে থাকার।"

আমি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান, প্রায় বৃটিশ, মার্কিন মহাদেশের অংশ। এই ছিল তখন ব্রেণ্ডার বক্তব্য। আফ্রিকা ওর কাছে অস্পষ্ট ছিল—অপ্রাসঙ্গিক ছিল। আফ্রিকা নিয়ে মাথা ব্যথার কোন কারণ ওর ছিল না।

ডাকারের রাজপথের ব্রেণ্ডা অন্য মানুষ। ও এসেছে কয়েক শো বছর আগের রুটসের সন্ধানে। মাঝের নটা বছর পৃথিবীর সমাজ আর রাজনীতি অনেক ওলোটপালোট খেয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক থাকেনি, আফ্রিকাও আলাদা।

ভ্যাপসা গরমে ব্রেণ্ডার মুখ ভিজে গিয়েছে। কিন্তু মুখেচোখে উৎসাহ উপচে পড়ছে। ঘামে ভেজা নাকের ডগা দিয়ে চশমা নেমে যাচ্ছে, ও সেটা ঠিক করতে করতে বললো, "এটাই আমার মাতৃভূমি। আগে সেটা ওইভাবে ভাবিনি। এখন বড় হয়েছি, চিন্তা করতে শিখেছি। এখন বুঝি বারবেডোজে তো নিজেদের ইচ্ছেয় যাইনি, ওরা জোর করে দাস হিসেবে নিয়ে গিয়েছে। ওখানে গেলেও, বহু পুরুষ ধরে থাকলেও, আফ্রিকার সঙ্গে নাড়িব যোগাযোগটা অস্বীকার করবো কি করে?"

তারপর ছেলেমানুষের মতো পায়ের হিলে ভর দিয়ে নেচে উঠে বললো, "আমার দারুন ভালো লাগছে এখানে। এই তিনদিনে অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। দক্ষিণ দিকের কাসমেন্স নদী অবধি গিয়েছি। এরপর উত্তর দিকটায় সেনেগাল নদী পার হয়ে মৌরিটানিয়ার সীমান্ত অবধি যাবো। এখানে সব কিছুই খুব ন্যাচারাল—নদী, সমুদ্র, জঙ্গল, সমস্তই যেন হাজার হাজার বছর ধরে যেমন ছিল তেমন আছে। সবকিছু ছবির মতো—ট্যুরিষ্টদের জন্য সাজানো গোছানো নয়। ভারী চমৎকার। আমার কি ভালো লাগছে!"

তারপর, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন মানুষকে দেখিয়ে বললো, "ওর জামাটা দেখেছেন। কেমন পাৎলা ঢোলা! হাতগুলো আদ্ধেক কিন্তু বড় বড়। ওই জামার নাম আমি জানি—'বোউ বোউ'। নীচের ওই পাজামাটা দেখছেন। ওর নাম 'পাগি'। আমার উচ্চারণটা

হয়তো ঠিক হলো না, কিন্তু ওইরকম। তারপর ওই যে লোকগুলো কি সব বাজাচ্ছে, ওরা আসলে ভিখিরি। পাঁচতারের যন্ত্রটার নাম 'খালোম'।ওই যে ড্রামের মতো দেখছেন ওর নাম 'তামাল'। ঘণ্টার মতো ওইটা যে কি বাজাচ্ছে, ওর যেন নাম কি, দূর ভুলে গেলাম। কিন্তু দেখছেন বাজনাটা কি সহজ—কেমন মনের মধ্যে ঢুকে যায় ?"

"সেনেগালের কোথায় তোমার 'রুট' ? সেটা কি জানো ?" জিগেস করি।

"না। এমনকি সেনেগাল না-ও হতে পারে। গাম্বিয়া, সিয়েরালিওন, ঘানা—জানি না কোনটা। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকা নিশ্চয়ই। আমার বাবা-মা ভালোভাবে বলতে পারলো না, বেশ কয়েক পুরুষ আগের ঘটনাতো ! তবে আমার কিছু এসে যায় না। কোন গ্রাম কোন ট্রাইব, তার থেকে বড় কথা পশ্চিম আফ্রিকা। আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা গ্রামই আমার।" ব্রেণ্ডা বলে।

"এরপর কোথায় যাবে ?"

"ইথিওপিয়া।"

"পশ্চিম থেকে পূর্বে ! কেন—রুটস তো তোমার এখানে ! যতদূর জানি পূর্ব আফ্রিকা থেকে খুব সামান্য মানুষই মার্কিনী মহাদেশে গিয়েছে। ভালো করে দেখতে হলে একটা অঞ্চলই দেখো—উড়ে উড়ে বেড়িও না।" তারপব পাপেব মতো করেই বললাম, "ভুলে যেও না আফ্রিকা একটা মহাদেশ। দুটো শহর চারটে গ্রাম দেখেই ভেবোনা আফ্রিকা দেখে ফেলেছো। দেশে ফিরে বলো না আই হ্যাভ ডান আফ্রিকা।"

ব্রেণ্ডা বলে, " না না, আমি ভাবিই না সব আফ্রিকাটা বুঝে যাবো। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেরা বহু মানুষের কাছে ইথিওপিয়া একটা বড় জিনিষ। আপনি 'রাস্তাফারি'দের কথা শুনেছেন ?"

শুনে মনে পড়ে গেল লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস-এর ছাত্র পরে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, জামাইকার অরল্যাণ্ডো প্যাটারসনের কথা। চোখে চশমা, রোগা, লাজুক অরল্যাণ্ডোকে দেখতে অনেকটা প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন, কালো আমেরিকান আর্থার এ্যাশের মতো। আমরা কিছুদিন এক বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন আমার লেগেছে জানতে যে অরল্যাণ্ডো একজন লেখক—জামাইকার বহু মানুষ ওকে চেনে। একদিন ওর কাছ থেকে উপহার পেলাম ওর লেখা এক উপন্যাস। দি চিলড্রেন অব সিসিফাস। সেই উপন্যাস পড়ে জামাইকার মানুষ, ওদের আশা-নিরাশা, সমস্যা-সম্ভাবনা, সুখ-দুঃখ যতোটা বুঝলাম, সেটা অন্য কোনভাবে হাজাব গবেষণার বই পড়েও বোঝা যেতো না। অরল্যাণ্ডোর বই আমার চোখের সামনে এক নতুন জগত খুলে দিল।

ওই উপন্যাসেই প্রথম জানলাম 'রাস্তাফারি'দের কথা। ওরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান, কালো। কিন্তু ওদের এক বিশেষ ধর্ম আছে। সেই ধর্মের দেবতাবিশেষ, বিশ্বাস করুন না করুন, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি, যার আসল নাম রাস্তাফারি। প্রচার ছিল রাজা সলোমন এবং রানী শিবার বংশধর, যদিও সেটা ঠিক নয়। বহু রাস্তাফারি ওই সময় ইথিওপিয়ায় আসতো—দেবদর্শনের সুযোগ নিতে।

কেন ইথিওপিয়া ? কেন হাইলে সেলাসি ? কারণটা বোঝা শক্ত না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মানুষগুলোর কৃষ্ণচেতনা তখন বাড়ছে, আফ্রিকা ওদের মনের দিগন্তে চারপাশ আলো করে উদ্ভাসিত হচ্ছে। আফ্রিকা যেন মহাদেশ নয় একটা 'সিম্বল'—ওদের স্বাধীনতার, মুক্তির। সেই আফ্রিকার একমাত্র স্বাধীন দেশ ইথিওপিয়া, যাদের কোন ইউরোপীয় শক্তি দখল নেয়নি, যারা ইটালীয়ান সৈন্যদের যুদ্ধে পুরোপুরি হারিয়ে দিয়েছিল ১৮৯৬ সালে। ১৯৩৫ থেকে-১৯৪১ ইটালী ইথিওপিয়া দখল করলেও ছয় বছর পর সম্রাট আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ১৯১৭ থেকে ১৯৭৪ হাইলে সেলাসী ছিলেন ইথিওপিয়ার সবকিছু। আফ্রিকার মধ্যে ইথিওপিয়াই

তাই ওদের অনুপ্রেরণার উৎস, যদিও ওদের রুটস খুঁজতে হলে সত্যি সত্যিই পশ্চিম আফ্রিকাতে আসতে হবে।

"রাস্তাফারিদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছি। কিন্তু তুমি যে রাস্তাফারি সেটা ভাবিনি"। আমি বলি।

"কে বললো আমি রাস্তাফারি ?" ব্রেণ্ডার প্রতিবাদ, "আমার জানার ইচ্ছে, এই যা।"

"সম্রাটের সঙ্গে কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছো !"

ব্রেণ্ডা আমার ঠাট্টা গায়ে না মেখে বলে, "মন্দ হবে না যদি দেখা পাই। আজকালকার যুগে তো সম্রাট টম্রাট বেশী নেই। দেখতে ইচ্ছে করে ওদের পোষাক, মাথার মুকুট, সিংহাসন, কিভাবে মিছিল নিয়ে সভায় ঢোকে, গর্দান নেয়, উপহার দেয়। আপনি ভালো আইডিয়া দিয়েছেন—আমি গিয়েই চেষ্টা করবো। কিন্তু দেখা করতে কি দেবে ?"

আমাদের এই কথাবার্তার কয়েক মাস পরেই হাইলে সেলাসির সম্রাটত্ব ঘুচে গেল, গর্দান গেল। নতুন বিপ্লবী সরকার হাইলে সেলাসির ব্যক্তিগত বিপুল জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করলো। সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র ভেঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পথে ইথিওপিয়া চললো। আমি জানিনা আজকাল রাস্তাফারিরা কি বলে ? ওদের চোখে হয়তো ওই স্বৈরতান্ত্রিক ষোড়শ শতাব্দীর মানুষটা শহীদ—ওরা হয়তো আজও ভাবে হাইলে সেলাসি ফিরে আসবে।

এ পর্য্যন্ত শহর দেখলাম।

পাপ বললো, "তুমি গ্রামে চলো। সেখানেই তুমি আসল সেনেগাল দেখবে। ডাকারের পশ্চিম আফ্রিকা ফরাসী বা দো-আঁশলা। এখানে বছরের পর বছর কাটালেও তুমি আমাদের দেশ বুঝবে না।"

অতএব গ্রামের দিকে রওনা হলাম।

॥ পাঁচ ॥

মরিনের কাছে আমার সেনেগালের ব্যাপারে হাতেখড়ি। মরিন আমার পি-এইচ-ডি ছাত্রী, বর্তমানে লণ্ডনের এক কলেজের অধ্যাপিকা এবং বৃটেনের ফেমিনিষ্ট আন্দোলনের এক পরিচিত নেত্রী। আমি ওর মাষ্টারমশাই। সনাতীন অর্থে ছাত্ররাই মাষ্টারমশাইয়ের কাছে হাতেখড়ি নেয়। কিন্তু পি-এই-ডি ছাত্রদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। গবেষণা মানেই হলো জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়া—এবং সেটা ছাত্র বা ছাত্রীই করবে। মাষ্টারমশাই গবেষণাব পদ্ধতি বাৎলাবেন, লেখায় যুক্তির ফাঁক বা অসঙ্গতি থাকলে, তথ্য অসম্পূর্ণ হলে দেখিয়ে দেবেন। ঠিক মত মনে হচ্ছে কিনা বলবেন, তুলনীয় লেখার খোঁজ দেবেন। কিন্তু কাজটা আসলে ছাত্রের—মাষ্টারমশাই-এর ভূমিকা খবরদারীর। এবং সেই খবরদাবীর মতো আনন্দদায়ক কাজ খুব কমই আছে। ছাত্রদের লেখা পড়ে পৃথিবীর বহু দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি, যা অন্যথায় জানতাম না।

মরিনের বিষয় 'বুড সেনেগাল'। গবেষণার প্রয়োজনে সেনেগালের তিনটি গ্রামে দু বছর কাটিয়েছে, ওখানকার ভাষা শিখেছে। সার্ভে করেছে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে গল্প করে অনেক তথ্য যোগাড় করেছে। 'বুড সেনেগাল' এক বিদেশী কৃষিপণ্যের প্রতিষ্ঠান—সেনেগালের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মরিনের গবেষণার উদ্দেশ্য এই বহুজাতিক সংস্থার কাজ কিভাবে গ্রামের কৃষি সমাজজীবন ও কর্ম ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে সেটা দেখা।

আমি মরিনেরই এক গ্রামে গেলাম। সঙ্গে পাপ। ওদের ভাষা জানিনা, ফ্রেঞ্চ জানিনা। পাপ না থাকলে খুবই অসুবিধা হতো।

গ্রামের নাম কিরেনে। ডাকার থেকে খুব বেশী দূরে নয়। লোকেরা সিরিয়ার জাতির। অনেকেই মুসলমান।

সেনেগালের এই অঞ্চলটাই বলা যায় সবচেয়ে ধনী। কেপ-ভার্ট অঞ্চলের এক গ্রাম। সব অঞ্চল এক রকম নয় উত্তরে মৌরিটানিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে খরার অবস্থা—'সাহেলে'র অংশ। সেখানে অবশ্য এখনও প্রচুর জন্তু জানোয়ার রয়েছে। হাতী, হিপো, হরিণ তো বটেই। এখানকার সিংহের নাকি কেশর নেই। দেখতে পেলাম না, নিকোলো কোবো গেম পার্কে যাবার সময় ছিল না। দক্ষিণের গাম্বিয়া সীমান্তের কাছাকাছি ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ সাপ কোবরা, অজগর এসব তো আছেই। আর আছে সবুজ মাম্বা সাপ,। যা দারুন বিষাক্ত, এবং যেমন বিষ তেমনি দেখতে ভয়ংকর। দক্ষিণ-পূর্বে মালী সীমান্তে ফুটা-জালান মালভূমির দিকে বেশ খানিকটা পাহাড়। ফুটা-জালান মালভূমি থেকেই নাইজার নদীর উৎপত্তি। কিন্তু বাকি অঞ্চলটায় শুধু তৃণভূমি আর ঝোপ। গাড়ীতে যেতে যেতে দু পাশের সমভূমি পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকার মতোই বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। পাহাড়, টিলা, ঢিপি, জঙ্গল, জানোয়ার—কিছুই চোখে পড়ে না। মাইলের পর মাইল ক্ষেত, ঘাস ঝোপের সমতল ভূমি। মাঝে মধ্যে বাওবাব গাছ। চারপাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো এই গাছ বলা চলে আমাদের দেশের

বটগাছের মতো। সেনেগালের সব জায়গাতেই বাওবাব গাছ চোখে পড়বে। অন্য বড় গাছ যেহেতু বিশেষ নেই—বিস্তীর্ণ সমভূমিতে বাওবাব তাই দেখার মতো।

মাটি আফ্রিকার অনেক অঞ্চলের থেকে ভালো হলেও, বেশী উর্বর নয়। বহু জায়গাতেই লালচে—ল্যাটেরাইট। সারের অংশ বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছে।

"এক সময় নিয়ম ছিল একটা জমি চাষ করে পনেরো ষোল বছর, এমনকি পঁচিশ বছর অবধি ফেলে রাখবার। তারপর আবার চাষ করবার। এর ফলে মাটি তার উর্বরতা ফিরে পাবার সুযোগ পেতো। এখন যতো দিন যাচ্ছে মাটির ওপর মানুষের চাপ বাড়ছে—অতদিন জমি ফেলে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে জমির উর্বরতা কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।" পাপ বলে।

তারও আগে একটা সময় ছিল যখন ওখানকার মানুষ ছিল ভ্রাম্যমান। ঘুরতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। একসঙ্গে সাত আটটা পরিবার। পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ। পরে, জমি যতো কমলো, প্রবণতা হলো গ্রাম ধরে বসে যাবার। একটা গোষ্ঠী নিয়ে একটা পরিবার। এবং অনেকখানি জায়গা নিয়ে যাতে কোন জমি পনেরো কুড়ি বছরে একবারের বেশী চাষ না করলেও চলে। জনসংখ্যা বাড়লে সেই গ্রামের কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও ঝোপ কেটে নতুন গ্রাম পত্তন করলো। ঝোপ কাটো, গ্রাম বানাও—এই ছিলো প্রথা।

এখন অবশ্য সেই সুযোগ বিশেষ নেই। সমস্ত কিরেনে গ্রামে মোট একত্রিশটা 'কমপাউণ্ড'। 'কমপাউণ্ড' মানে মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অঞ্চল। কোন কোন গ্রামে, বিশেষ করে উত্তরে, ওরা পাঁচ ছফিট উঁচু ঘাস, কাঁটাগাছ বা বাজরার খড় দিয়ে কম্পাউণ্ড ঘিরে রাখে। এক একটা কম্পাউণ্ড মানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় গোষ্ঠী। প্রতিটি কম্পাউণ্ডে পাঁচ থেকে পঁচিশটা ছোটবড়ো পারিবারিক গোষ্ঠী। সকলেরই পূর্বপুরুষ এক। পাঁচ ছয়টা কম্পাউণ্ড নিয়ে একটা উপ-গ্রাম—যার মানুষরাও একই পূর্বপুরুষের মাধ্যমে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা। কিরেনে গ্রামে এইরকম ছটা উপগ্রাম রয়েছে—প্রতিটি উপগ্রামের মানুষ একটু আলাদা। পরিবার, কম্পাউণ্ড, উপগ্রাম, গ্রাম—যেন চারটি ধাপ।

উপগ্রাম মানেই হলো একটা আলাদা মসজিদ থাকতে হবে। আলাদা মসজিদ যেন স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। কলকাতাতেও হিন্দুদের মধ্যে যেমন দুর্গাপুজো বা সরস্বতী পুজো ধরে পাড়া ভাগ হয়। কিন্তু গোটা গ্রামটা নিয়ে একজন 'চীফ' বা 'প্রধান'। গ্রামে প্রধানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র মারাবু। মারাবু হলো মোল্লার মতো, ধর্মীয় নেতা। এক সময় মরক্কো থেকে মৌরিটানিয়া হয়ে ওরা আসে—আরবি ভাষা শেখাতে কোরাণ পড়াতে। কোন সমস্যা হলে, ইসলামের আইনসম্মত ব্যাখ্যা এক ওরাই দিতে পারে।

প্রধানের কাজ খুব বড়ো। এক বড়ো কাজই হলো জমির বণ্টন। পশ্চিম আফ্রিকার এক বড়ো অংশে এখনও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, জমি সমাজের—কোন ব্যক্তির নয়। সেনেগালে অবশ্য জমির একটা অংশ কিছু বিদেশী কোম্পানী বা মালিককে দেয়া হয়েছে—কিন্তু বড় অংশটাই হলো, যাকে ওরা বলে 'ডোমেইন ন্যাশনেল', সামাজিক মালিকানাভুক্ত।

এই সামাজিক জমি ভাগ বাঁটোয়ারা করে চীফ। এক সময় প্রতি বছর নতুন করে জমি ভাগ হতো। যে এবছর ভালো, নীচু জমি পেলো, পরের বছর তাকে খারাপ জমি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখন অবশ্য, জমিতে চাষের অধিকার বছর বছর পাল্টায়না। তবে যারা বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায় তাদের চীফের কাছে জমি চেয়ে আবেদন করতে হয়। সংসার বাড়লে অতিরিক্ত জমির জন্য আবেদন করতে পারে। এমনকি অন্য গ্রামের লোকও কিছুদিন এখানে কাজ করবার পর, জমি চাইতে পারে।

"আগে জমির কোন দাম ছিলনা"। পাপ বলে, "শুধু দরকার ছিল সামান্য কিছু মদ ও ভেট

প্রধানকে দেয়া। আজকালও আনুষ্ঠানিকভাবে দাম নেই, কিন্তু চীফদের খাঁই বেড়েছে। যা নজরানা দিতে হয় সেটাই প্রায় দামের মতো। শুধু মদ আর ডাব দিয়ে হবে না। নয় হলে নতুন পরিবারকে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে জমি পেতে।"

পাপ বলে চলে, "এখন কেউ মারা গেলে অবশ্য তার উত্তরাধিকারী ঠিক ঠিকই জমিটা পেয়ে যায়। তবে চীফের সঙ্গে ঝগড়া বা মন কষাকষি থাকলে তার অধিকার আছে ওই জমি কেড়ে নেবার। সেটা অবশ্য খুবই খারাপ জিনিষ, তবে সাধারণত হয়না।"

"তার মানে এখন সামাজিক মালিকানাটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র—অধিকারটা ব্যক্তিগত এবং বংশপরম্পরা হয়ে দাঁড়িয়েছে," আমি বলি।

"সে কথা তুমি বলতে পারো।" পাপ বলে।

"জমি-বিক্রী করা যায় ?" জিগেস করি।

"না।" পাপ বলে, "আনুষ্ঠানিক বিচাবে তা সম্ভব নয়। কিন্তু বাজারের হাওয়া গ্রামেব ব্যবস্থাকে নাড়া দিচ্ছে। পরোক্ষে প্রজাস্বত্ব দেয়ার চলন আছে—চীফকে নজ্‌রানা দিলে দেখেও দেখবে না। এটা হয় তাদের ক্ষেত্রে যারা শহরে বা বাইরে কাজ করে—তাই জমিটা অন্য কারোকে চাষ করতে দিয়ে গেল। তবে আনুষ্ঠানিক সনাতনী নিয়ম অনুযায়ী এটা হবাব কথা নয়।"

গ্রামের একজন চাষীর বাড়ী গেলাম। যত্ন করে বসালো, জমি দেখালো।

"এই জমি তুমি কিভাবে পেলে ?" ওকে জিগেস করি।

"মামার কাছ থেকে। এটা ছিল মামার অধিকারের জমি। মামা মারা গেলে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার কাছে এসেছে।" ও বলে।

"মামার ছেলে নেই ?"

"আছে দুজন।"

"ওদের জমি কোথায় ?" আমার অবাক প্রশ্ন।

"কেন ?" ও আরও অবাক, "ওরা ওদের মামার জমি পেয়েছে !"

মামা থেকে ভাগ্নে। শিববাম চক্রবর্তীর ভাষ্য অনুযাযী ভাগ্নে মানে 'ভাগ নে', যাবা ভাগ নেবার জন্য মুখিয়ে বয়েছে।শিবরাম চক্রবর্তী কখনও পশ্চিম আফ্রিকায় এসেছেন বলে মনে হয না। কিন্তু এখানকার ভাগ্নেরা সত্যি সত্যিই মামার ভাগ নেয়।

এই হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার এক বড়ো অংশের নিয়ম। ভারতের কেরালার নাযারদের মধ্যে এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের খাসীদের মধ্যে এই ব্যবস্থা রয়েছে। এটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেব নিয়ম। অতীতে পুরুষদের বহুবিবাহের মতো মেয়েদের সুযোগ ছিল বহু পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার। সেক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্নের সমাধান মায়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই সামাজিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকারের ভিত্তি ছিল মা এবং মামা। পরবর্তীকালে এই প্রথা না চললেও বহুবিবাহ থেকেছে। তখন প্রতি বৌ নিজের জন্য আলাদা জমি দাবী করেছে। সেই জমিতে চাষ করেছে বৌ নিজে এবং তার উত্তরাধিকার বৌয়ের সূত্রে তার নিজের ছেলে পেয়েছে।

এখানকার পারিবারিক জীবন ঠিক আমাদের মত না। আমরা ধরে নিই, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকবে। বাবার সঙ্গে দাদার পরিবারের সঙ্গেও থাকতে পারে। কিন্তু সবাই মিলেই একটা সংসার। জমি-জমা পুরো সংসারের। কিন্তু এখানে ঠিক সেইরকম নয়।

স্বামীর জমি ছাড়াও স্ত্রীর আলাদা জমির প্রয়োজন হয়তো স্ত্রীদের স্বার্থে। চাষও হয় আলাদা আলাদা। স্ত্রী তৈরী করে খাবার, স্বামী তৈরী করে পণ্য। অবশ্য অনেক সময় স্বামীরা স্ত্রীদের

সাহায্য করে, বিশেষ করে জমি চাষের জন্য তৈরী করার সময়। কিন্তু মূলতঃ স্ত্রীরা স্বাবলম্বী। একইভাবে ছেলেরও আলাদা জমি নির্দিষ্ট থাকে। তার জমির উৎপাদন তার।

সেরারদের মধ্যে অবশ্য আত্মীয়তার দুটো সূত্রই ধরা হয়—বাপের দিক যেমন তেমনি মায়ের দিক, যদিও সম্পত্তি চলে যায় মায়ের দিকটা ধরে। বাপের দিকটাকে বলে 'কুর পিয়ালা', আর মায়ের দিকটাকে বলে 'ডেন'। অনেকটা আমাদের দেশের মতোই—আমরা যেমন মামাতো এবং খুড়তুতো সম্পর্কটা আলাদা করে ধরি।

আরেকটা জিনিষ পশ্চিম আফ্রিকায় খুব চোখে পড়ে। খাদ্যশস্য চাষের দায়িত্ব বৌদের। সে মাঠে 'হো' দিয়ে মাটি খানিকটা ঘাঁটাঘাঁটি করে ভুট্টা বা অন্য কিছুর বীজ ছড়িয়ে দেয়, আগাছা তোলে, ফসল হলে কাটে। গরু বা হালের ব্যবহার নেই। আজকাল অবশ্য কোথাও কোথাও ঘোড়া দিয়ে সীড-ড্রিল বা লাঙ্গল টানা হয়। ভূমিহীন মজুর বলে এখানে কিছু নেই—চাষীদেরই করতে হয় সব কিছু।

"তারপর ছেলেরা অনেকেই এখন অন্যত্র বছরের এক বড়ো সময় কাজ করে। কেউ খনিতে কাজ করতে যায়, কেউ গ্রামেই 'বুড সেনেগালের' বা অন্য কোন কোম্পানীর হয়ে কাজ করে। তাই খাবার তৈরীর কাজটা মেয়েদেব না করে উপায় থাকে না।"

পণ্য মানেই প্রায় বলা চলে বাদাম। ল্যাটিন আমেরিকাব কলা-উৎপাদনকারী ছোট দেশগুলোকে লোকে যেমন ঠাট্টা করে বলে 'বেনানা রিপাবলিক', সেনেগালে তেমনিই 'বাদাম সমাজতন্ত্র'। মাটি বাদামের পক্ষে মানানসই। বিশেষ করে ডাকারের কাছে কেপভার্ট অঞ্চল জুড়ে বাদামই হচ্ছে মূল পণ্য। সেই বাদাম ছোট চাষীরা তৈরী করে—কিন্তু কেনে বড় বিদেশী কোম্পানীরা, এবং বিক্রী করে ইউরোপে। ডাকারের বন্দরেব কাছেই বাদাম তেলের এক শোধনাগার—কিন্তু বড়ো অংশটাই বাইরে যায় কাঁচা অবস্থায়।

'বুড সেনেগাল' অবশ্য তৈরী করে সব্জী। ১৯৭১ সালে প্রথম গিরেনে অঞ্চলে সরকার থেকে জায়গা জমি নিয়ে উৎপাদনে নামে। এখন সেনেগালের সবচেয়ে বড়ো কৃষি সংস্থা, বিদেশী মালিকানা। ওরা তৈরি করে শসা, টম্যাটো, বীন, পেপার ইত্যাদি, বিক্রী করে ইউরোপে।

ওদের প্রায় এক হাজার একরের বড়ো ফার্ম। কিন্তু ছোট চাষীকে দিয়েও বেশ খানিকটা উৎপাদন করাচ্ছে। এতে ওদর লাভ কতোটা?

"বলা শক্ত", পাপ বলে, "লাভ যদি হয় কোম্পানীই নিয়ে বিদেশে পাঠাবে। ওদের কাঁচা টাকার লোভে অনেক চাষীই ওদের হয়ে মজুর খাটে বা চুক্তিতে ওদের মতো করে শস্য বানায়। তার ফলে সাধারণ গ্রামীন চাষে লোক পাওয়া যায় না। এবং যতো দিন যাচ্ছে, এখানকার অর্থনীতি ওদের ওপর দারুণ নির্ভরশীল হয়ে থাকছে।"

জগদীশ বলে, "এই যে একটা দুটো জিনিষের ওপর বৈদেশিক বাণিজ্যের আয় নির্ভরশীল সেটা খুব খারাপ। বিদেশে বাদাম বা সব্জীর দাম কমলেই বিরাট সংকট আসছে। তার ফলে বৈদেশিক সাহায্য নিতে হচ্ছে, নির্ভরতা আরও বাড়ছে। অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য না থাকলেই সমস্যা।"

ফ্রানসিন বলে, 'বুড সেনেগাল' আর জমির সামাজিক মালিকানা এক সঙ্গে চলতে পারে না। যতো টাকা বাড়ছে, বাজার বাড়ছে, ওদের ব্যক্তিবাদী ঝোঁক বাড়ছে।"

ওখানকার গ্রামের নানাধরনের মানুষের মধ্যে চোখে পড়ে 'গ্রিয়ট'দের। ওরা খানিকটা আমাদের দেশের কথকদের মতো। একটা অঞ্চলের নানা কাহিনী আর ইতিহাস ওদের কণ্ঠস্থ। ওরা মারা গেলে ওদের ছেলেরা ওদের জায়গা নেয়—মুখে মুখে এইভাবে দীর্ঘদিনের ইতিহাস

ওরা বলতে পারে। ওরা শিক্ষিত নয়, লেখাপড়ার চর্চা নেই, কিন্তু ঘরানাটা শ্রুতির। আমাদের দেশেও যেমন লিখিত ইতিহাসের বদলে মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ইতিহাসের কাহিনী অতীতে ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের মানুষের মতো সবকিছু লিপিবদ্ধ নেই। ওদের কাছে জানা যায় নানা রাজার নাম, তাদের বংশ ঠিকুজি, তাদেব সাফল্য ও ব্যর্থতা, মহামাবী আর মন্বন্তরের কথা, বিদেশী আক্রমনেব আলেখ্য, যুদ্ধজয়ের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। পশ্চিম আফ্রিকার পুরনো দিনের ইতিহাসেব এক বড সূত্র ওবাই।

মালী বা ঘানা সাম্রাজ্যের পশ্চিমেব আফ্রিকা আব নেই। আটলাণ্টিকেব বাধা গত সাড়ে পাঁচশো বছর হলো ভেঙ্গেছে। সাম্রাজ্যবাদ নেই, কিন্তু নতুন অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে সেনেগালকে আজ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হচ্ছে। ওদেব সনাতনী সমাজ ভাঙ্গছে। সেটা হয়তো অনিবার্য। কিন্তু যে নতুন সমাজ তৈরী হচ্ছে তার মূল্যায়ন কে করবে?

॥ ছয় ॥

ডাকারের সমুদ্র খানিকটা শান্ত বলে মনে হলো, যখন জাহাজ ঘাটায় গিয়ে দেখলাম।

সমুদ্রতট কতোরকমের হতে পারে? বন্দরে সাধারণতঃ জাহাজের ভীড়, ডকের ওপর লোহার শক্ত শক্ত পিলার, রাশি রাশি ভারী মোটা দড়ি বা তার জড়ানো। বন্দরের আকাশ ভরে রাখে নানা ভঙ্গীতে একে ওকে কাটাকাটি করে দাঁড়ানো ক্রেন। ওপরে ঘুরে বেড়ায় সী গাল। সেই কর্মব্যস্ত সমুদ্রতটের হয়তো অন্য এক ধরনের সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু প্রকৃতি সেখানে অনুপস্থিত। সমুদ্র সেখানে জাহাজের পায়ের তলায় চাপা। বন্দরের তৈলাক্ত, মলিন সমুদ্রে নাবিকরা ছাড়া কেউ স্নান করবে না। নাবিকরাও উপায় থাকলে করবে না।

'সী-বীচ', যেখানে মানুষ স্নান করে, সাধারণতঃ বন্দর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। এখানে সমুদ্র হঠাৎ গভীর হয়ে যায়নি। পাড়ে পাথর নেই, যে সমুদ্রের ধাক্কায় সেখানে হোঁচট খেয়ে দুর্ঘটনা হবে। রাশি রাশি বালি থাকবে, সেই বালিতে গোড়ালি ডুবিয়ে সমুদ্রের জলে ঢুকতে হবে। বালি কোথাও সোনালী, কোথাও হলুদ, বা কখনো কালচে, যেমন রোমের সমুদ্রে। ভালো বীচে বালি জমাট-বাঁধা কঠিন, সেখান দিয়ে গাড়ী পর্য্যন্ত জল ছুঁয়ে জোরে ছুটে যাবে। যেমন দীঘার সমুদ্র সৈকত, যদিও সেখানে সূর্য্যোদয়ের ভোরে প্রচুর শিশু-বৃদ্ধ-মহিলার ভীড়ে ওইভাবে গাড়ী চালানোটা আমার কখনই ভালো মনে হয়নি। সী-বীচ মানেই সমুদ্র আর সৈকত, জল আর বালি, বালি আর জল। নীল, সবুজ-নীল, হলুদ, সোনালী-হলুদ, কালচে-হলুদ।

'সী-বীচ' মানে মানুষ। কখনো কখনো মনে হয় বড্ড বেশী মানুষ। বিশেষ করে গ্রীষ্মের দুপুরে, ইউরোপে, ফ্রেঞ্চ বা ইটালীয়ান রিভিয়েরায়। চারপাশে যেখানে তাকাও সেখানেই মানুষ। মানুষের থলথলে মাংসপিণ্ডে বালি ঢেকে রয়েছে। হয়তো মোটা মানুষরাই বেশী যায় ওখানে—বা তা না হলেও ওদেরই চোখে পড়ে বেশী। বিবস্ত্র গোলাপী, লালচে সাদা মানুষগুলো, সোনা-হলুদ বালির ওপর নীল সমুদ্রের পাশে কাতারে কাতারে শুয়ে। কেউবা চেয়ারে বসে বা ফোল্ডিং খাটে শুয়ে—হয় চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে রয়েছে, নয় কিছু পড়ছে, বা খাচ্ছে। ওখান দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মনে হতে পারে যেন মর্গের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, দু পাশে সারিসারি সাজানো মৃতদেহ। বা কসাইয়ের দোকান, বড় বড় গরুর মাংসখণ্ডগুলোকে হুকে না ঝুলিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখেছে। এত মানুষ, কিন্তু সেই তুলনায় চিৎকার, কথাবার্ত্তা কম—যত কথাবার্ত্তা তার চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে কানে আসে সমুদ্রের গর্জ্জন।

সমুদ্রের ঠিক ধারটায় ঢেউয়ের মধ্যে অবশ্য ইউরোপীয় রিভিয়েরাতেও অন্য ছবি। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড়। ওরা ছুটছে, চিৎকার করছে, জল ভাঙছে, প্ল্যাষ্টিকের হালকা বোটের ওপর দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কেটে ভেসে যাচ্ছে। স্পীড বোট আছে, ওয়াটার-স্কিইং আছে। দেখতে ভালো লাগে, যখন স্পীড বোটের পিছনে যোগ করা দড়ি হাতে, পায়ে স্কি, মানুষগুলো ঢেউয়ের ওপর পুরোটা ভেসে দ্রুত ছুটে যায়।

ইউরোপীয়রা সমুদ্রের জন্য যেভাবে আকুলি-বিকুলি করে, সেভাবে যেন এশিয়ার বা

আফ্রিকার মানুষ করে না। কারণটা হয়তো প্রাকৃতিক। ওরা রোদ্দুর কম পায়, যেটুকু পায় তার সবটুকু যেন দেহের প্রতিটি বিন্দুতে ছড়িয়ে দিতে চায়। ওভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে রৌদ্রসেবন আমাদের ধাতস্ত হয় না—মাথা ধরে যায়। তবু বলবো, স্নান করে ভিজে গায়ে সমুদ্রের বালিতে বড় তোয়ালে ভিজিয়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে মন্দ লাগে না। যাদের চেহারা সুসমঞ্জস, মেদহীন, তারা যখন সারা গায়ে তেল মেখে শুয়ে থাকে, এবং সূর্য্যের আলোয় ওদের সমস্ত দেহ ঝিকমিক করে, তখন ওরাও যেন সমুদ্রতটের শোভা হয়ে দাঁড়ায়।

তবু ইউরোপীয় রিভিয়েরায় যেন কিসের অভাব। অভাবটা স্বাচ্ছন্দ্যের নয়। বহু সমুদ্রতটেই এখন 'পিয়ার' আছে—সমুদ্রের মধ্যে কয়েক শো গজ ঢুকে যাওয়া কাঠের তৈরী বড় একটা কাঠামো। সেখানে রেষ্টুরেন্ট, থিয়েটার, যান্ত্রিক খেলা, এবং নানা রকমের মজার ব্যবস্থা। মাছ ধরতে চাও তো একেবারে ধারে চলে যাও, মনে হবে যেন জাহাজ থেকে মাছ ধরছো। বঁড়শী রাখার ভালো ব্যবস্থা। এর মধ্যেই হয়তো একটা ছোট অংশ, সেখানে রিমোটকন্ট্রোলে ছোট ছোট বোট নিয়ে খেলতে পারবে। সমস্ত রকম ব্যবস্থাই আছে।

কিন্তু তবু মনে হয় যেন কিসের অভাব। সমুদ্র যেন থেকেও নেই। সমুদ্রতট প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরী। সমস্ত বীচ ভাগ ভাগ করে কোম্পানীগুলো ইজারা নিয়েছে। দুপাশে শক্ত কাঠের এনক্লোজার, একটাই গেট। পয়সা দিয়ে ঢুকতে হবে। শুধু ঢোকার জন্য একটা পয়সা, চেঞ্জিং রুম ব্যবহার করবার জন্য আর একটা পয়সা, কেবিন নিলে, চেয়ার নিলে, বড়ো ছাতা নিলে আরো বেশী লাগবে। সমুদ্রের জল-হাওয়া ফ্রি নয়—কিনতে হবে নগদ পয়সা দিয়ে। সমুদ্র একটা ইনভেষ্টমেন্ট—বড়ো ব্যবসা। টাকা ফেল, সমুদ্র দেখো। তুমি কি ভেবেছো সমুদ্রটা ফাও—পেলেই হলো ?

তবে ব্যবসারও সীমাবদ্ধতা আছে। সমুদ্র বড্ড বড়, কতোটা ঘিরবে, কতোখানি আটকাবে ? ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতেও নীস, কান বা মনাকোর বাইরে অনেক সমুদ্র আছে, যেখানে টাকার বাধা নেই। শহরের বাইরের সমুদ্র মুক্ত। কিন্তু যেটা আমার অবাক লাগে, মানুষগুলো মুক্ত নির্জন সমুদ্র ছেড়ে বেড়া-দেয়া সমুদ্রের ভীড়ে কেন আসে—বিশেষ করে যাদের গাড়ী রয়েছে তারা কেন অন্য কোথাও যায়না ? বৃটেনে অবশ্য কোথাও ইজারা দেয়া হয় না।

পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র মুক্ত, সমুদ্রতটে ভীড় থাকে না। এখানে মাইলের পর মাইল জল, বালি আর সামান্য গাছপালা ছাড়া কিছু চোখে পড়বে না। এখানে তুমি আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি ঢেউয়ের পাশে ছোট, কোন গেট নেই, কাঠের দেয়াল নেই। কোকাকোলা বা স্নাকস হয়তো পাবে না, কিন্তু সমুদ্র পাবে, পাবে শাশ্বত সমুদ্র, যা কখনও পাল্টায় নি। সাম্রাজ্য ভেঙ্গেছে গড়েছে, জাহাজের গড়ন মানুষের পোষাকের ধরন পাল্টেছে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস একই রয়েছে।

ডাকারের সমুদ্র দূরের সেই বীচের সমুদ্র নয়। এখানে ঢেউ কম, সেইজন্যই বন্দর আর শহর গড়ে উঠেছে।

পশ্চিম আফ্রিকা প্রায় একটা দ্বীপ। উত্তরে সাহারা। পূর্বে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়। পশ্চিমে আর দক্ষিণে আটলাণ্টিক। সমুদ্র, মরুভূমি আর অরণ্যের পাহারায় থেকে এখানকার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সমুদ্র তাই এখানকার জীবনের অনেকখানি।

আফ্রিকার তিন পাশে তিন সমুদ্র—ভূমধ্য সাগর, ভারত মহাসাগর আর আটলাণ্টিক মহাসাগর। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে পর্য্যন্ত রাজনীতির বিচারে আটলাণ্টিকই ছিল সবচেয়ে শান্ত। উত্তর উপকূলে ভূমধ্য সাগর পার হয়ে অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে একটার পর একটা আক্রমণ হয়েছে। গ্রীক, ফিনিশীয়, রোমান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ,

ইটালীয়ান—এদের রণতরী ভিড়েছে, একটার পর একটা ওদের তৈরী শহরে উপকূল ছেয়ে গিয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলও দীর্ঘদিন ধরে, প্রায় হাজার বছরের মতো, আরবদের নিয়ন্ত্রণে। মোম্বাসা, কিলওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত বড় শহর ওদের হাতে। আফ্রিকানরা পূর্ব উপকূলের সমুদ্র ছুঁয়েছে মাত্র কয়েক শো বছর হলো।

কিন্তু আটলান্টিক ছিল আফ্রিকার নিজস্ব। কোন বাইরের মানুষ আসেনি, আক্রমণ হয়নি। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। আটলান্টিক ভূমধ্য সাগর নয়। আফ্রিকার ওপারে দু হাজার মাইল দূরে এবং দক্ষিণ চেপে দক্ষিণ আমেরিকা—এতো দূর যে ওখান থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা কখনো ছিল না। আটলান্টিক ভারত মহাসাগর নয়, যেখানে দীর্ঘদিন ধরেই আরব এবং ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যতরীর আনাগোনা। অন্য দেশগুলো পশ্চিম উপকূলের আফ্রিকাকে তাই ঘাঁটায়নি। ভালো হোক খারাপ হোক, যতোটাই উন্নত হোক বা পিছিয়ে থাকুক—ওরা নিজেদের মতো করে নিজেরা থেকেছে।

কিন্তু ইউরোপ ওদের নিজেদের মতো থাকতে দিলো না। আটলান্টিকের বিশাল ঢেউ ভেঙ্গে ইউরোপীয়, বিশেষ করে পর্তুগীজ জাহাজ "অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের" দিকে ছুটলো। যে মহাকাশে সূর্যের আলো অফুরন্ত, সেখানে সত্যিই অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এলো।

পর্তুগীজরা বাণিজ্য অবশ্য খানিকটা করেনি এমন নয়। অন্যদের মতো হাতির দাঁত আর সোনা ওরা কিনলো, এবং সাহারা দিয়ে না গিয়ে সমুদ্রপথে ইউরোপে পাঠালো। উটের ক্যারাভানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজ ছুটলো—এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে ওই পথ ছিল অনেক সহজ এবং দ্রুত। ততোদিনে বড বড় এবং ভারী জাহাজ তৈরীর কায়দা ইউরোপ শিখেছে। মাসের পর মাস জাহাজ নিয়ে যাওয়া আর শক্ত নয়।

হাতির দাঁত আর সোনা দিয়ে শুরু হলেও, শেষ পর্যন্ত ওই বাণিজ্য অন্যদিকে মোড় নিলো। পর্তুগীজরা দেখলো এর থেকে ঢের বেশী লাভজনক হলো মানুষ ধরার এবং বেচার ব্যবসা।

১৪৪১ সালে আন্তন গনজালভেস দুজন মানুষকে ধরলো সেনেগালের উত্তরে। সেই শুরু। তারপর থেকে পর্তুগীজ জাহাজ সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে চলে। মাঝেমধ্যে তীরে নেমে শিশু, মহিলা, যুবক যে কজনকে পায় ধরে এনে জাহাজের খোলে ঢোকায়। লিসবনের বাজারে তারপর ভালো দামে ওদের বিক্রী করে।

ব্যবসা খুবই লাভজনক—কিন্তু পর্তুগীজরা দেখলো যে এই কায়দায় বেশী মানুষ ধরা যাবে না। তখনকার আফ্রিকার ভূখণ্ডের রাজ্যগুলোও বেশ বড়ো মাপের এবং শক্তিশালী। ওদের সঙ্গে সামনা সামনি যুদ্ধে যাবার মতো অবস্থা তখনও পর্তুগীজদের হয়নি।

কিন্তু ব্যবসাটা পর্তুগীজরা বুঝতো। তাই যা পুরোপুরি জোর করে হতো না সেটা করা গেল বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে। আফ্রিকানদের মধ্যেই পাওয়া গেল কোন কোন রাজাকে যারা টাকা বা নানারকম জিনিষের বিনিময়ে কিছু মানুষ ধরে দেবে।

গাল্ফ অফ গিনির উত্তরে ট্রপিকাল রেইন ফরেষ্ট। তার উত্তরে সাভানা। সেখানে প্রচুর নদী আর জল। ওই নদী দিয়ে ক্যানোতে চড়ে দাস ব্যবসায়ীরা আসতো। ওদের দলে থাকতো ত্রিশ চল্লিশজন দাঁড়ি। হাতে থাকত বর্শা, ছুরি এবং ইউরোপীয়দের থেকে পাওয়া বন্দুক। ওরা এক একটা গ্রামে নামতো, গভীর রাতে চুপিচুপি হানা দিতো। আগুন দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে মানুষগুলোকে ধরতো, তারপর শেকলে বেঁধে ক্যানোতে তুলত। লম্বা ছিপছিপে ক্যানো মুহূর্তের মধ্যে জল কেটে দূরে চলে যেতো। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বছরে অন্তত এক হাজার করে দাস লিসবনের বাজারে বিক্রী হতো। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সেই সংখ্যা বেড়ে হলো সাড়ে তিন হাজার।

এরপর পর্তুগীজরা দুর্গ তৈরীতে মন দিলো। বর্তমান ঘানার এলমিনাতে তৈরী হলো এক বড়ো কেন্দ্র এবং দুর্গ। সেখান থেকে পরিচালিত হলো দাস কেনাবেচার ব্যবসা। সেনেগাল থেকে বেনিন পর্য্যন্ত এমন কোন জায়গা থাকলো না যেখান থেকে পর্তুগীজরা দাস, সোনা বা হাতির দাঁত নিলো না। পরে বৃটিশ ফ্রেঞ্চ বা ডাচেরাও পিছিয়ে থাকলো না—ওরাও যোগ দিলো। ওদের মধ্যে ঝগড়া বা যুদ্ধ কম হলো না। পর্তুগীজরা দাবী করলো যে ওদের দাসব্যবসা পোপের আশীর্বাদপুত, আর কারো এই ব্যবসায় ঢুকবার কোন ধর্মীয় অধিকার নেই।

এই পর্যন্ত দাসব্যবসা বিরাটভাবে ফুলে ফেঁপে উঠবার মতো অবস্থায় যায় নি। কিন্তু আটলান্টিকের ওপাশের এক বিরাট পরিবর্তন সমস্ত হিসাব পাল্টে দিলো।

পশ্চিম আফ্রিকার মানুষ চিরকাল আটলান্টিককে বন্ধু হিসাবেই ভেবেছে। দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে বিরাট ব্যবধান। তখনকার জাহাজের যে ক্ষমতা তাতে পৌছবার মতো নয়। শোনা যায় লক্ষ লক্ষ বছর আগে পশ্চিম আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা একসঙ্গে জোড়া ছিল। ভূতত্ত্ববিদরা এখন সেই কথা বলছেন—এবং দুটো মহাদেশ সত্যি সত্যিই খাপে খাপে মিলে যায়। প্রাণীতত্ত্ববিদরা গাছপালা মিলিয়ে যথেষ্ট সামঞ্জস্য পেয়েছেন। কিন্তু সেতো বহু আগের কথা—ততদিনে দুধের সরের মতো ভাসতে ভাসতে দুটো মহাদেশ অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন এক মালী-সম্রাট একবাব ঠিক করেছিলেন ওই সমুদ্রের ওপাবে কি আছে জানবেন। একবার চারশো জাহাজ পাঠালেন। আর একবার দু হাজার। মাত্র একটি জাহাজ ভাঙ্গা অবস্থায় ফিরে এলো। বাকিরা পৌছতে পারলো কিনা কেউ জানে না। না পৌছনোই স্বাভাবিক। পশ্চিম আফ্রিকার জাহাজ তখনও মজবুত ছিল না। সমুদ্র সৈকত চষা আর সমুদ্র পাড়ি দেয়া এক কথা নয়।

কিন্তু আবার যোগাযোগ হলো। কয়েক লক্ষ্য বছর পরে। তবে লিসবন হয়ে। ততোদিনে কলম্বাস দক্ষিণ আমেরিকা পৌছেছেন। কলম্বাসের পিছনে স্প্যানিশ সৈন্য মেক্সিকো থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেবিকার এক বড় অংশের দখল নিয়েছে। শুধু দখল নেয়া নয়—ওখানকার 'ইণ্ডিয়ানদে'র নির্মূল করবার এক ব্রত নিয়ে, মাত্র আঠারো বছরের মধ্যে এগারো লক্ষের জনসংখ্যাকে এগারো হাজাব এনে নামিয়েছে। বাকিরা স্প্যানিশদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে জঙ্গলে পাহাড়ে পালিয়েছে। প্রচুর জমি, উর্বর জমি, নানারকম ধাতু আর প্রাকৃতিক সম্পদ সবকিছুর মালিক স্প্যানিশরা—কিন্তু লোক কোথায়, শ্রমিক কোথায়!

শ্রমিক সমস্যার সমাধান হলো ১৫০৫ সালে। সতেরোজন আফ্রিকান দাস পাঠানো হলো। যতো দিন গেল দাসের সংখ্যা বাড়লো। এবারে আর শতে নয় হাজারে। ব্রাজিলের বিরাট ভূখণ্ড যখন পর্তুগীজ দখলে এলো তখনও শ্রমিকদের দরকার মিটলো ওই দাসবাহিনী থেকে। আজকের দশ কোটি ব্রাজিলিয়ানের অর্দ্ধেকের বেশীর কোন না কোন পূর্বপুরুষ পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আনানো।

ইংরেজরাও পর্তুগীজদের পিছনে পড়ে রইল না। উত্তর আমেরিকার বিরাট ভূখণ্ড এলো ওদের হাতে। সেখানে বিশেষ করে বর্তমান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে, তুলোর চাষে দরকার হলো দাসশ্রমিক। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি দশজন মানুষের একজনের পূর্বপুরুষ এইভাবে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এসেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একটার পর একটা দ্বীপের আখের চাষে ওদের লাগানো হলো। পশ্চিম আফ্রিকার সাধারণ চাষী কখনো লিসবন হয়ে, কখনো লিভারপুল হয়ে নতুন মহাদেশে পৌছালো।

এই দাসব্যবসার এক বড়ো প্রয়োজন ছিল নানারকম ছোট বড় ঘাটির, যেখানে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা দাসদের জড়ো করা হবে, এবং তারপর জাহাজে চড়ানো হবে।

ডাকার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে ওপর সেই ছোট্ট দ্বীপ ছিল এইরকমই এক ঘাঁটি। জগদীশ—বীণা পাপ-ফ্রানসিনের সঙ্গে বোটে করে ওই দ্বীপে গিয়ে উঠলাম।

দ্বীপটা খুবই ছোট। নাম গোরি। বলা চলে এই দ্বীপের ইতিহাস ডাকারের থেকে পুরনো। ১৬১৭ সালে ডাচদের দখলে, ১৬৭৭ থেকে ফরাসী দখলে। এখন বেশ কিছু টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষ এখানে থাকে। আমার মতো প্রচুর ট্যুরিস্টও আসে। দেখার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু যা দেখলাম তা দেখে গা শিউরে উঠলো।

চিড়িয়াখানার পশুর খাঁচার মতোই সারি সারি লোহার খাঁচা। সেখানেই দাসদের রাখা হতো। বিছানা নেই বালিশ নেই। কখনো হয়তো খানিকটা খড় দিতো যদি ভালো মালিক হতো। প্রাকৃতিক সব রকম কাজ ওই খাঁচার মধ্যেই। খাওয়া দাওয়া যেটুকু না দিলে ওরা বাঁচবে না তার বেশী নয়। ওদের হাতে এবং পায়ে লোহার বেড়ি থাকতো, এবং শেকল লাগানো থাকতো, সমস্ত রকম ব্যবস্থাই ছিলো প্রহরার, যাতে ওরা না পালাতে পারে। যারা পালাবার চেষ্টা করতো, এই অবস্থার মধ্যেই, তাদের জন্য ছিল নানা শাস্তির ব্যবস্থা.। বিরাট সাঁড়াশীর মতো যন্ত্র বা ইঁদুর কলের মতোই শাস্তিকল। দাসের মালিকদের কাছে ওরা মানুষ ছিলো না।

পাপের কাছেই শুনলাম কিভাবে সমস্ত ব্যবস্থাটা চলতো। পাপ বললো, "তোমাকে বুঝতে হবে, এটা একটা ব্যবসা। ব্যবসা মানেই সব কিছুর বিচার টাকার মানদণ্ডে। মনুষ্যত্ব, বিবেক, এসব ভাবনার সময় বা সুযোগ ওদের ছিলো না। যেমন লোকে গরু কেনে বা মুরগী কেনে, সেইভাবেই ওরা দাসদের কিনতো।"

জাহাজে তুলবার আগে ভালো করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হতো। দাসেরা উলঙ্গ হয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতো—পুরুষ মহিলা বাদবিচার হতো না। গরু বা ছাগলের মতোই ডাক্তার সর্বাঙ্গ টিপে টিপে দেখতো। কোন খারাপ অসুখ থাকলে সরিয়ে দিতো, যদি মনে করতো সমুদ্রযাত্রার ধকল সহ্য করতে পারবে না তাহলেও সরিয়ে দিতো। খুঁতওলা দাসের দাম ভালো উঠবে না— সেটাও ছিল আর একটা দিক।

তারপর মালিকরা যেমন গরু বা ভেড়ার চিহ্ন দেয় মালিকানা ঠিক কববার জন্য—একই কায়দায় গনগনে আগুনে পোড়ানো লাল লোহা দিয়ে বুকে বা পিছনে মার্ক দেয়া হতো, সেই ঘা-টা যতক্ষণ না শুকোতো ততদিন কষ্টের শেষ ছিলো না—কিন্তু কে ভাববে সেই কথা।

এত সাবধানতার পরেও দাসেরা মরতো, কখনো কখনো ডজনে ডজনে মরতো। জাহাজ যখন ওপারে ভিড়তো তখন হয়তো দেখা যেতো অর্দ্ধেক দাসই মৃত বা দুই তৃতীয়াংশ মৃত বা পঙ্গু। কারণটা ছিল জাহাজে ওদের রাখবার ব্যবস্থা। খোলের মধ্যে না আলো না হাওয়া অবস্থায় শেকল দিয়ে আটকে রাখা হতো। প্রাকৃতিক কাজও ওইখানেই। মাছি মশা ভনভন করতো—দুর্গন্ধ ছড়াতো। মহামারী হওয়াটা আশ্চর্য ছিল না।

পরের দিকে মালিকরা বুঝলো যে এই পদ্ধতি ভুল। মানবতার বিচারে নয়, কেননা দাসদের এরা কখনো মানুষ বলে ভাবেনি। ব্যবসার বিচারেও এই পদ্ধতি ভুল। পয়সা দিয়ে কেনা দাস যদি শেষ পর্যন্ত না বাঁচে সেটা এক বড় লোকসান। তারপর মহামারী একবার শুরু হলে সেটা শুধু দাসেদের মধ্যে কী সীমাবদ্ধ থাকবে? ইউরোপীয়রাও অনেকে মরলো সেই মহামারীতে। কাজেই ব্যবস্থা খানিকটা ভালো হলো। জাহাজের মধ্যেই ডাক্তার থাকলো, এবং ব্যবস্থা হলো দিনে অন্তত একবার জাহাজের ডেকে এনে ব্যায়াম করাবার, যাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

লিসবন হোক, লিভারপুর হোক বা মার্কিনী দুই মহাদেশের কোন বন্দরে হোক—সেখানে ছিল বড় বড় দাসের বাজার। বিজ্ঞাপন দেয়া হতো কাগজে। বলা হতো অমুক দাসের দৈর্ঘ্য কি, স্বাস্থ্য কেমন, দেখতে কেমন। বলা হতো ওরা কি ধরনের কাজ জানে—চাষ খনির কাজ,

ছুতোরের কাজ । বলা হতো ওদের স্বভাব কিরকম—বন্য কিনা, না মালিকের কথা শুনবে । কোন খুঁত থাকলে সেটাও জানবার ছিল । কখনো নীলাম হতো, কখনো বিস্তারিত দর দাম হাঁকাহাঁকির পর বিক্রী হতো । ছেলেদের দিয়ে নানা কিছু করানো হতো, মেয়েরাও কাজ করতো ।

তবে মেয়েদের আর একটা বড় কাজ ছিল বাচ্চা তৈরী করা । যতো বাচ্চা হবে ততো দাস । তাই মেয়েদের কদর ছিল খুব—বিশেষ করে যে মেয়েরা প্রতি বছর গর্ভবতী হবে । ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপের চিনির উৎপাদনে যাদেব লাগানো হলো, তাদের মধ্যে বিবাহ বলে কিছু থাকলো না । পরিবার বলে কিছু থাকল না । দাসের আবার বিয়ে কি, সংসার কি ?

ব্রেণ্ডা বলে, "ইংরেজরা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে,কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষত তৈরি হলো আমাদের মনে । আমাদের স্কুলের ইতিহাসে শেখানো হলো আফ্রিকার মানুষ গাছে থাকে, ওরা কাঁচা মাংস খায়, জামাকাপড় পরে না । বলা হলো, ইংরেজরা বা অন্য ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় যায় শুধু ওখানকার মানুষেব কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেবার জন্য । ওরা যে দাস করে আমাদেব পূর্বপুরুষদেব ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে আনলো তার কাবণটাও টাকা কামাবার উদ্দেশ্য নয়, আমাদের মঙ্গল । কিন্তু মজা কি জানেন, এই সব মিথ্যাই আমরা গিলতাম । পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম ।"

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, "এই দাসত্বের ভার এখনও আমাদের কাঁধে । এই যে দাসদের সংসার হলো না, বিয়ে হলো না, দাসত্ব চলে যাবার পবও সেই অবস্থা পাল্টালো না । ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে তাই এশিয়া বা আফ্রিকার মতো বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যে যে সহজ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈবী হওয়া উচিত ছিল সেটা হলো না । এখনও আমাদের মধ্যে বিয়েটা ঠিক সেইভাবে হয় না । পুরুষ বা নারী একসঙ্গে থাকলেই স্বামী-স্ত্রী—এবং ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে— আর স্বামী-স্ত্রী নয় । এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় ছেলেমেয়েদের ।"

আজকালকার বৃটেনে এশিয়ান আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দুইই অভিবাসীদের মধ্যে দলে ভারী, কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে ।

ব্রেণ্ডাই বলে, "এশিয়ান বাবা-মা-রা ছেলেমেয়েদের কতো যত্ন নেয় । বসিয়ে পড়ায়, শাসন করে । ছেলেমেয়েরাও বাবা-মাকে মানে । তাই পড়াশুনা ভালো করে, পরে ভালো কাজ পায় । কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান বাবা-মারা ভালো করে ছেলেমেয়েদের দেখেই না ।শাসন থাকে না, ওরা বখে যায় । পড়াশুনো ভালো করে না—পরে চাকরী পায় না । ওদের মধ্যে বেকার তাই সবচেয়ে বেশী, এবং সমাজবিরোধী কাজকর্মই বেশী । ড্রাগ, ছিনতাই, ডাকাতির জালে জড়িয়ে পড়ে—পুলিশের সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষ । যারা এইসব করে না তাদেরও পুলিশ সন্দেহের চোখে দেখে, যখন তখন সার্চ করে হয়রানি করে । পুলিশের বর্ণবিদ্বেষ আর হামলাবাজি আর অন্যদিকে শেকড়-ছেঁড়া অস্তিত্ব, দুয়ে মিলে এক অদ্ভুত অবস্থা । এ থেকে বেরিয়ে যাবার কি উপায় জানি না ।"

শেকড়-ছেঁড়া জীবন দাসেদের । দাসত্বের পরেও সেই ধারা অব্যাহত । ব্রেণ্ডা বলে ; "অনেক সময় ভাবি আমি কে ? আমি কোথাকার ? আমার ইতিহাস কি ? এই চিন্তা শুধু আমার—নয় । ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের যে কোন চিন্তাশীল মানুষ আজ এই কথা ভাবছে । আমি বারবেডোজের মেয়ে ঠিকই—কিন্তু ওখানে তো আমরা নিজের ইচ্ছায় যাই নি । পশ্চিম আফ্রিকাকে বাদ দিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থাকতে পারে না । কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত আফ্রিকাকে আমরা অস্বীকার করেছি । যেন জন্মজন্মান্তর ধরে বারবেডোজেই আমাদের বাস ।আফ্রিকার মানুষজন ছোট ভেবেছি । ভেবেছি আমরা খৃষ্টান, ইংল্যাণ্ডের রানীর প্রজা, রঙ কালো হতে পারে—কিন্তু আমরাও

ইংরেজ। শুধু ধর্ম নয়, ওদের ভাষাও নিয়েছি। আমাদের নিজেদের কোন ভাষা নেই—আমাদের ভাবনা চিন্তার মাধ্যম মালিকদের ভাষা। আমাদের হীরো এব্রাহাম লিঙ্কন, আমাদের সাহিত্যিক শেক্সপীয়ার মিল্টন। এই হলো আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের নিজেদের কোন হীরো নেই।

ব্রেণ্ডার কণ্ঠস্বরে তিক্ততা। কথাগুলো সত্যি, কিন্তু পুরোটা নয়। ওদের মধ্যে সবাই ড্রাগ খায়নি বা সমাজবিরোধী হয়নি। আফ্রিকার সংস্কৃতি হারালেও এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি ওদের মধ্যেই গড়ে উঠেছে। ওদের 'সোউল সং' আত্মা-সংগীতে বেদনার যে মূর্চ্ছনা সেটা হয়তো ওদেরই বৃন্তচ্যুত ইতিহাসের প্রতিফলন। 'জ্যাজ' বলা চলে কালো আমেরিকানদেরই ঘরানা। সংগীতের আসরে, কি মার্কিনী দুই মহাদেশে কি ইংল্যাণ্ডে, ওদের যথেষ্ট কদর। ওদের দরাজ, বলিষ্ঠকণ্ঠে নানা কাজ, নানা সুরের খেলা। ওদের সুনিপুণ আঙুলের বিন্যাসে পিয়ানো, ফ্লুট, এমন কিছু যন্ত্র নেই যার হৃদয়ের গভীরে ওরা ঢুকতে পারবে না। ওদের দু পায়ে, দেহে ছন্দ। নাচের আসর তাই সহজেই ওরা মাতিয়ে রাখে। ওরা জন্মশিল্পী। খেলার মাঠেও ওরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সংগীত এবং খেলা—এই দুটোই ওদের মধ্যে যাদের একটু প্রতিভা আছে তারা বেছে নেয়। বাণিজ্য, ব্যবসা, সাধারণ চাকরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওদের জায়গা নেই—কিন্তু এই দুটো পথ অপেক্ষাকৃত খোলা।

গত দেড় দশকের কিছু বেশী 'ব্ল্যাক পাওয়ারের' ঢেউ এসেছে। এর একটা খারাপ দিক আছে—এ যেন উল্টোদিকের বর্ণবিদ্বেষী তত্ত্ব। ভালোর দিক যেটা, কালোদের হীনমন্যতা অনেকখানি কেটেছে। কালো মানে অন্ধকার, খারাপ, কুৎসিৎ—এ কথা ওরা আর মানে না। ওরা বরং জোর দিয়ে বলে কালোই সুন্দর। ওদের নতুন হীরো মার্টিন লুথার কিং, ম্যালকম এক্স—যাঁদের রঙ কালো।

কৃষ্ণচেতনার সঙ্গে এসেছে আফ্রিকা চেতনা। এখন আর আফ্রিকার জন্মসূত্র লজ্জার ব্যাপার নয়। সদ্য আমেরিকান যেমন ইংল্যাণ্ড, ইটালি বা পোল্যাণ্ড যায় 'রুটস' বা 'জন্মসূত্র' খুঁজতে, ওরাও এখন প্লেনভর্তি হয়ে আসে সেনেগাল, গাম্বিয়ার, গিনিতে। ওরা জানতে চায় পশ্চিম আফ্রিকার কোন অঞ্চল থেকে ওরা এসেছিল। লোকগাথার মুখে মুখে কিছু ঘটনা বংশপরম্পরা জানা রয়েছে—সেইটুকু অবলম্বন করে ওরা আসে। ওরা জানতে চায় সোলিংকে, মানডিংকে বা ওলফরা কেমন, তখন কিভাবে থাকতো, এখন কিভাবে থাকে।

নর্মান দাসব্যবসা নিয়ে গবেষণা করেছে—বেশ কিছু পেপার লিখেছে। ওকে জিগ্যেস করলাম, "মোট কতো মানুষ এইভাবে দাস হলো তার কি কোন হিসেব আছে?"

নর্মান বললো, "নিক্তি মেপে বলা শক্ত। তবে নিঃসন্দেহে সংখ্যাটা খুব বড়ো। কঙ্গোর রাজা পর্তুগীজদের লিখেছিল 'তোমরা আর দাস নিও না, আমাদের দেশে যে মানুষজন নিঃশেষ হয়ে গেল।' সব মিলিয়ে কয়েক কোটি তো বটেই। তাছাড়া যাদের ধরলো তাদের এক বড় অংশ শেষ অবধি পৌঁছলো না। যারা পৌঁছলো তাদের সংখ্যাটার প্রমাণ আছে ব্রাজিলের বিরাট লোক সংখ্যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষের হিসেবে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সংখ্যাধিক্য মানুষে এবং অন্যত্র। সব মিলিয়ে বিরাট বড়ো। শোনা যায় বেশ কিছু অঞ্চল আর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—ঝোপে জঙ্গলে ওদের ছেড়ে যাওয়া বাড়ীঘর ঢেকে গেল।"

"দাসব্যবসা ইউরোপীয়রা বন্ধ করলো কেন? যদি ব্যবসাটা এতোই লাভজনক ওদের চালালে ক্ষতি কি হতো?" প্রশ্ন করি।

নর্মান হাসে, "ইংরেজদের জিগ্যেস করো। ওরা বলবে এ্যাণ্টি-স্লেভারী লীগের কথা, অন্যদের কথা, যারা দীর্ঘদিন ধরে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে।" তারপর বলে, "ওদের প্রচেষ্টাকে

আমি ছোট করে দেখছি না। ওই মানুষগুলো নিশ্চয়ই সৎ এবং আন্তরিক ছিলেন—কিন্তু ওদের কথায় দাসব্যবসা বন্ধ হবার মতো নয়।"

"তারপর ধরো দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার কথা। অনেক সময়ই দেখবে বুদ্ধিবৃত্তির থেকেও বড় হয়ে দাঁড়ায় সরকারকে তোষামোদ বা বর্তমান ব্যবস্থাকে সমর্থন। এ্যারিষ্টটলের শাণিত যুক্তির কাছে কিছু দাঁড়ায় না—কিন্তু তিনিও ছিলেনদাসব্যবসারপক্ষে। টমাস জেফারসন ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া করলেন, সেখানে বলা হলো সমস্ত মানুষ সমান এবং তাদের নাগরিক অধিকারের কথা—কিন্তু দাসেরা বাদ পড়লো। ১৭৭৫ সালে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব পার্লামেণ্টে বললেন, 'দাসব্যবসা চলবে,—এতো ভালো লাভজনক ব্যবসা আমরা বন্ধ করে দিতে পারি না।' এই ছিল সাধারণ মতামত।"

কিন্তু দাসব্যবসা শেষপর্যন্ত বন্ধ হলো। আইন করে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। কেন?

"এখানেও মূল কারণ অর্থনৈতিক," নর্মান বলে, "দাসব্যবসা আব লাভজনক থাকলো না। যতক্ষণ দাসেরা ওদের অবস্থা মেনে নিযেছিল ততক্ষণ ঠিক ছিলো। যেই ওরা আর মানতে চাইলো না, পালাবার চেষ্টা কবলো, কাজে ফাঁকি দিলো, তখন পাহারা এবং খবরদারির জন্য লোক বাড়াতে হলো। ফলে খরচ বাডলো। দাসেবা মবতও পটাপট—সামান্য অসুখেই। বেঁচে থাকার মানসিকতাও ওদের ছিল না। ফলে ওরা দেখলো, দাসেব দাম এবং তাকে বাঁচিযে রাখাব খরচ, পাহারার খরচ বড্ড বেশী। অন্যদিকে ততদিনে কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়েছে, শিল্পবিপ্লব চলছে। ওরা বুঝলো, দাস শ্রমিক দিয়ে কারখানা চলবে না। তার জন্য দরকার মুক্ত শ্রমিক।"

দাসব্যবসা বন্ধ হবার পরই দাসেরা মুক্তি পায়নি। আরো কয়েক দশক লেগেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দাসেরা মুক্ত হয়ে আর আখ-তৈরীব কাজে লাগলো না, গেল শহরে—তখন আনা হলো ভারতীয় শ্রমিকদের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসেরা মুক্তি পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো। ওরা কি করবে? স্বাধীন মুক্ত জীবন, নিজের পাযে দাঁড়িয়ে বাঁচবার মানসিকতা তখনো তৈবী হযনি।

নর্মান গির্ভানের দাবী—বুড সেনেগালের মতো সংস্থা সরকার নিয়ে নিক, নিজেরা চালাক, এবং কোন ক্ষতিপূরণ ওদের না দিয়ে। নর্মান বরং বলছে ওরা ক্ষতিপূরণ দেবে—দাসব্যবসার ক্ষতি শোষণ থেকে ক্ষতি ধরে। একটা হিসাবও নর্মানের তৈরী আছে।

লাইবেরিয়া সেনেগাল থেকে বেশী দূরে নয়—আটলাণ্টিকের উপকূলে ছোট্ট দেশ। রাজধানী মনরোভিয়া। লাইবেরিয়া এক অর্থে অনন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্যমুক্ত দাসেদের এক অংশ জাহাজে করে ফিরে এলো পশ্চিম আফ্রিকায়। ওরা তৈরী করলো এই দেশ। 'লাইবেরিয়া' কথাটা 'লিবারেশন' থেকে এসেছে। ওখানে তখন মানুষ বেশী ছিলো না। জমি মোটামুটি চাষের উপযোগী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু ভালো মানুষ টাকা দিলো, অন্যান্য সাহায্য দিলো। পশ্চিম আফ্রিকার মানুষ, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানের পর আবার পশ্চিম আফ্রিকায় ফিরে এসে এক নতুন জীবন শুরু করলো।

"তবে সমস্যা হলো দুটো, টিপোটে বললো, "এক, যতদিন গেল পশ্চিম আফ্রিকার অন্য অংশ থেকে লোক আসতে লাগলো—শেষ পর্যন্ত তারাই হয়ে গেল সংখ্যাধিক্য। কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলো মার্কিন প্রত্যাগতদের হাতে। ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্য থাকলো। এক নতুন জাতিপ্রথা জন্ম নিলো। মার্কিন কালোরা থাকলো সবার ওপরে, পশ্চিম আফ্রিকার মানুষ নীচে। দু নম্বর সমস্যা হলো বৈদেশিক নীতি নিয়ে। মার্কিনী সম্পর্ক গভীরই

থাকলো—মনরোভিয়া হয়ে দাঁড়ালো আফ্রিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেজুড়।" লাইবেরিয়ার পনেরো লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার আমেরিকা ফেরৎ প্রাক্তন দাসদের বংশধর, ওদের হাতেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা। পরে অবশ্য এই অবস্থা পাল্টেছে।সার্জেন্ট ডোর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। একসময় মনে হয়েছিল, এর ফলে হয়তো মার্কিনী যোগসূত্র ছিন্ন হবে, লাইবেরিয়া সত্যি সত্যি স্বাধীন হবে। টিপেটো এবং অন্যান্য বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি এই কথা ভেবে ডোর মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। কিন্তু শেষ অবধি ডো মার্কিনীদের কাছে বিক্রী হয়ে গিয়েছে, যদিও মার্কিন ফেরৎরা এখন আর লাইবেরিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতায় নেই।

লাইবেরিয়ার প্রতিবেশী দেশ এবং দোসর সিয়েরালিওন। পশ্চিমবঙ্গের থেকে আয়তনে কিছুটা ছোট, যেখানে লাইবেরিয়া প্রায় দেড়গুন বড়—কিন্তু মাত্র সাতাশ লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে বিয়াল্লিশ হাজার 'ক্রিয়ল', যারা এককালে বৃটেনে দাস ছিল—তারপর লাইবেরিয়ার কায়দাতেই উনবিংশ শতাব্দীতে কিছু সৎ বৃটিশের সহায়তায় ফিরে আসে। এখানেও ঝোঁকটা আছে ক্রিয়লের হাতে বড় বড় পদ চলে যাবার—এবং সেই ব্যাপারে সংখ্যাধিক্য মাণ্ডেদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ।

লাইবেরিযা সিয়েবালিওন দুটোই সেনেগালের কাছে, আটলান্টিকের উপকূলে। ওদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি, রঙের মিল হলেও আর ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকলেই সব সমস্যা মিটে যায় না। আলাদা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিদেশ-ফেরৎ দাসেদের সংস্কৃতির ধরনটা পাল্টেছে, যা অন্যরা মেনে নিতে চাইছে না।

ডাকার ছাড়বার মুখে আবার ব্রেণ্ডার সঙ্গে দেখা। এবারও দূর থেকে 'হাই' বলে চিৎকার করে ছুটে এলো। ঘামে ভেজা নাক দিয়ে এখনও চশমা নেমে আসে, হিলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে কথা বলে, ছটফট করে। কিন্তু উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়েছে।

"আমি বারবেডোজ যাচ্ছি। কাল।"

"কেন? ইথিওপিয়া কি হলো! সম্রাট কি দেখা করবেন না বলে জানিয়েছেন?"

"নাঃ। ঠিক করলাম এখন দেশেই ফিরি। ইথিওপিয়া পরের বার যাব। দেশের জন্য মন কেমন করছে। আমার বাচ্চাটাকে মায়ের কাছে রেখে এসেছি। ওর জন্য মন বড্ড খারাপ।"

কথা বলতে গিয়ে ওর বিষণ্ণতার কারণ বুঝলাম। এতো দারিদ্র্য! এতো অপুষ্টি! এতো পশ্চাদপদতা!' আর যতোই ও চেষ্টা করুক পশ্চিম আফ্রিকাকে আপন করতে, বুকে ধরতে, এখানকার মানুষের চোখে ও বিদেশী। ওর ভাষা ভাব পোষাক চলন বলন সব আলাদা। পশ্চিম আফ্রিকা ওকে ঠিক সেইভাবে কোলে তুলে নিলো না।

"না এলেই বোধহয় ভালো হতো।" ব্রেণ্ডার কণ্ঠে আক্ষেপের সুর, "আমার কল্পনার পশ্চিম আফ্রিকা ছিল অনেক বেশী সুন্দর।"

পরে নর্মানকে জিগেস করেছি। নর্মান জামাইকার, ব্রেণ্ডা বারবেডোজের। কিন্তু দুজনেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মুলাতো। কিন্তু ব্রেণ্ডার মতো নর্মান ছেলেমানুষ নয়।

নর্মান বললো, "এইটাই স্বাভাবিক। কয়েক শো বছরের ব্যবধান কম কথা নয়। কয়েক লক্ষ দাস দেশত্যাগী হবার পরও পশ্চিম আফ্রিকার সমাজ আর অর্থনীতি থেমে থাকেনি। ওদিকে আমাদের এই দাসজীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ তো আছেই, তারপর মার্কিন মুলুকের কাছে বলে অনুন্নত হলেও অর্থনীতির বিচারে পশ্চিম আফ্রিকার থেকে আমরা এখন এগিয়ে। পশ্চিম আফ্রিকার এক বড় অংশের মানুষ জানেও না ওদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক। যখন ব্রেণ্ডা বা আমার মতো কেউ উদয় হয়, ওরা ঘাবড়ে যায়, বুঝতে পারে না আমরা কি বলছি, কি চাইছি? তারপর বৃটিশ বা মার্কিনী সংস্কৃতি আমাদের একেবারে নতুন করে গড়ে তুলেছে। ওদের মধ্যে

আমাদের তাই একদম মানাচ্ছে না। ব্যাপারটা দুঃখের, কিন্তু বাস্তব।"

আমার ফেরার দিন বীনা খুব খাওয়ালো। জগদীশ বললো, "আমরা শিগগিরই জেনিভা যাচ্ছি—ওখানে আংকতাদে কাজ পেয়েছি। তখন আরো বেশী দেখা হবে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্লেনে ঢোকার মুখে পিছনে তাকালাম। অনেক দূরে জগদীশের বিরাট ডান হাতটা ছোট্ট বীনাকে পুরো ঘিবে রেখেছে। দুজনেই হাত নাড়ছে।

প্লেন আকাশে উঠতেই চোখে পড়লো আটলান্টিক। যে আটলান্টিক সেনেগালের মানুষেব বন্ধু। যে মহাসাগরের সফেন ঢেউয়ের চূড়ায় স্বচ্ছন্দে খেলা কবে ওখানকার নগ্ন কালো ছেলেরা। যে সমুদ্রতট এখনও অঙ্কের হিসাবে কলুষিত হয়নি। কিন্তু ভুলতে পারি না, ওই আটলান্টিকেরই ঢেউ ভেঙ্গে একদিন এসেছিল সেই বিরাট অভিশাপ—যার ক্ষতচিহ্ন এখনও পশ্চিম আফ্রিকা আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সর্বাঙ্গে। আটলান্টিকের জলে ভেসে থাকা সেনেগালের ওই অভিশপ্ত দ্বীপ. খাঁচা, শৃঙ্খল, যন্ত্রনাযন্ত্র, অতীতের এক বড় সাক্ষী। এই অতীত ভয়ংকর, বেদনাময়। তবু এই অতীত না জানলে আজকেব পশ্চিম আফ্রিকা আমবা বুঝবো না।।

নাইজার পেরিয়ে

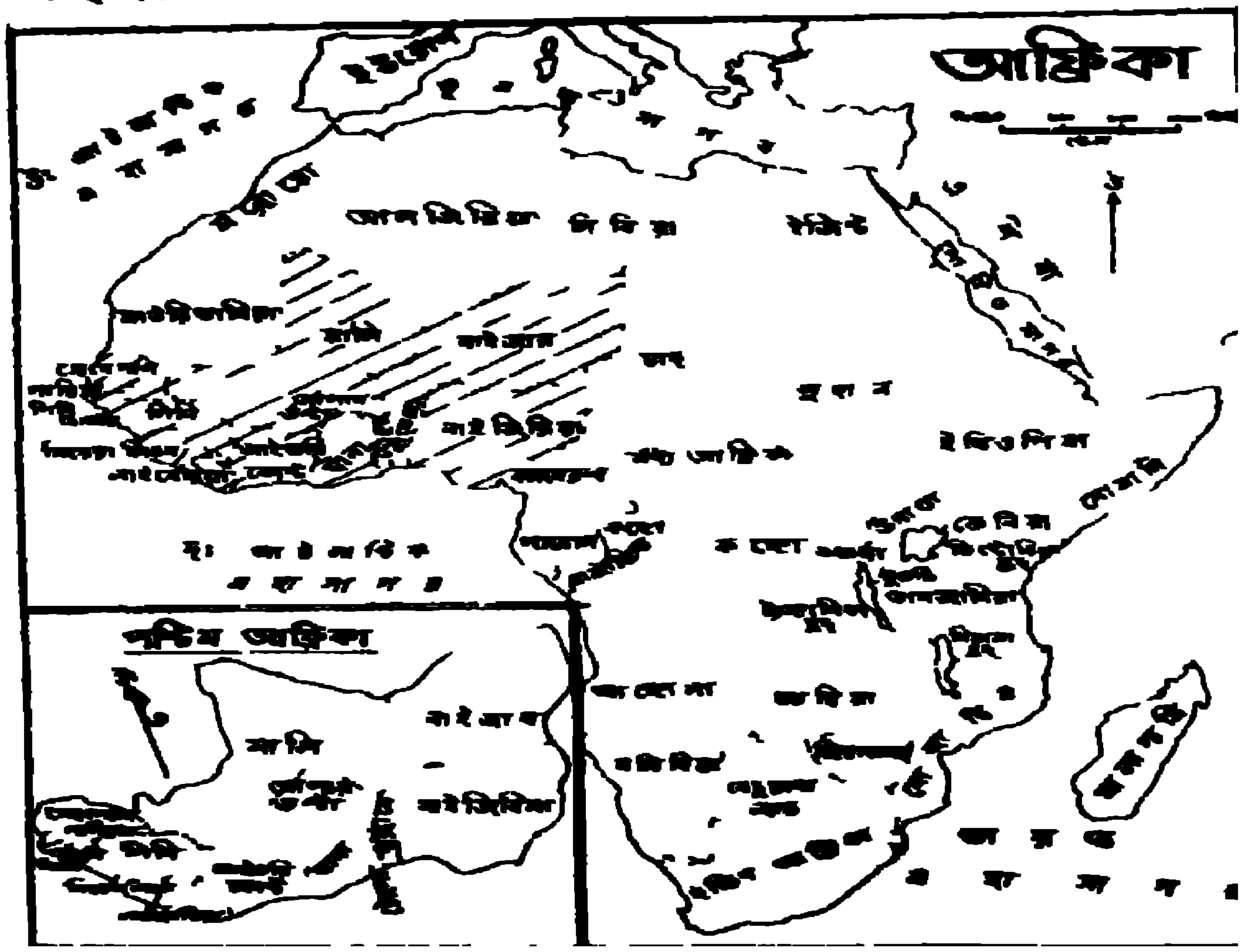

॥ এক ॥

ছিনতাই করবার লোক নেই এমন শহর পৃথিবীতে খুব অল্প দেশেই আছে। লণ্ডন ব্যতিক্রম নয়।

সেদিন বৃদ্ধা মেমসাহেব বাস থেকে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। দুটো স্টপ বাকি। তাই যেটা অভ্যাস, সযত্নে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়না বের করে সামনে ধরেছেন, এবং লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে লাগাচ্ছেন। হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি যাবেন। বয়স হলে কি সুন্দর থাকায় কোনো দোষ আছে?

ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। বড় ব্যাগের মধ্যে ছোট ব্যাগ—তার মধ্যে টাকা। ওর শাণিত চোখ এড়াল না। ক্ষিপ্র আঙুলে খপ করে ছোট্ট ব্যাগ তুলে নিয়ে বাস থেকে নেমে দৌড়ল কেউ বুঝবার আগেই। হকচকিয়ে যাওয়া মহিলা চিৎকার করবার আগেই লোকটা প্রায় একশো গজ এগিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একটু ভুল হল চোরের। ওর জানবার কথা নয় যে এনো ওই বাসে থাকবে। এনো দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কাছে এই একশো গজ হ্যাণ্ডিক্যাপ কিছুই না।

এনো পলক না পড়তেই যেন বাতাসে ভর করে ছুটল। পায়ের পর পা, যেন পিস্টনের মতো ছন্দে এবং গতিতে উঠছে আর নামছে। দুপাশে ওঠানো নামানো হাতও সেই ছন্দে তাল মিলিয়ে গতিশীল। চোরটা মোড় ঘুরেও জনারণ্যে হারিয়ে যাবার সুযোগ পেল না। শেষের তিন গজ এক বড়ো লাফ দিয়ে পার হয়ে এনো লোকটাকে চেপে ধরে পেভমেণ্টের সিমেণ্টের ওপর শুইয়ে দিল।

বৃদ্ধা মহিলা অনেকবার 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললেন। ওঁর ঠিকানা ফোনের নম্বরসহ কার্ড দিলেন। ভাগ্যিস এনো ছিল।

এনো নাইজিরিয়ার মানুষ।' পশ্চিম নাইজিরিয়ার। জাতে ইয়ুরুবা। ধর্মে খ্রীস্টান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ছাত্র। গবেষণার বিষয় পাম তেল নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা। এনো যৌথভাবে আমার আর বিল ওয়ারেনের ছাত্র। এনো দৌড়বীর।

এনো কিন্তু জানত না সে কথা। নাইজিরিয়ার যে গ্রামে জন্মেছে সেখানে সেই অর্থে ঠিক স্পোর্টস বা অন্য কিছু হয় না। স্কুলের স্পোর্টসে অবশ্য দৌড়ত। শেখাটেখার কোনো ব্যাপার নেই। 'গো' বললেই দৌড়নো আর কি। গায়ের জোর দিয়ে দৌড়নো। বন্ধুরা ওর নাম দিয়েছিল 'চিতা'—কেন না ওরা কেউ এনোকে ধরতে পারত না।

নাইজিরিয়ানদের তুলনায় এনো বরং একটু খাটো—যদিও ভারতীয়দের চেয়ে লম্বা। চেহারায় খানিকটা ব্রাজিলের বিশ্বখ্যাত ফুটবলার পেলের আদল। গাঁট্টাগোট্টা পুতোর মতো চেহারা। দেখতে মোটেই ভালো না। কিন্তু ওর সৌন্দর্য মনে, গতির ছন্দে।

স্কুলের ভালো ছাত্র। স্কুল শেষ করে এলো বৃটেনের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে স্পোর্টস হচ্ছে। এনো দৌড়ল—৪৪০ গজে। ওর সৌভাগ্য, 'ওয়েল্স' জাতীয় দলের কোচ ওদিন সেখানে ছিলেন। কমনওয়েলথ গেমস-এর জন্য খেলোয়াড নির্বাচনে তিনি ব্যস্ত। এনোর

দৌড় ওর পছন্দ হল। ওকে ডাকলেন। বললেন, "তুমি দৌড় জানো না। যদি শিখতে চাও, আমার কাছে এসো।"

এনো একটু অবাকই হল। ওইদিন তো ও পরের জনকে প্রায় পাঁচ গজ পেছনে ফেলে প্রথম হল, তবু দৌড় জানে না!

"না। সত্যিই তুমি জানো না," কোচ বললেন, "তোমার স্পীড আছে। সহজাত ক্ষমতা আছে। কিন্তু দৌড়বার নিয়ম একদম জানোনা। তর্ক করো না। শনিবার বিকেল তিনটেয় তুমি আমার বাড়ি আসছো।"

এনোর কাছে দৌড় মানে ছিল শুধু খালি পায়ে দৌড়নো। কোচ বোঝালেন যে জুতো পবতে হবে—দৌড়ের জুতো। তারপব দৌড়ের একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। মূল কথা হল, সবচেয়ে কম শক্তি খরচ করে সবচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করা। প্রয়োজনেব থেকে যেন একবারও বেশি না পা ফেলতে হয। একটা পায়ের ঠিক সামনে এক লাইনে আর একটা পা ফেলো। হাতটা অনাবশ্যক নয়। পায়ের সঙ্গে গতিব ছন্দ মেলাও। বাঁক এলে ঠিক মতো ঘোরো।

এনো দৌড় শিখল, এবং কমনওয়েলথ গেমসে ওয়েল্‌স-এর হয়ে দৌড়ল। কোচ দৌড়ের আগে বললেন, "তোমার স্ট্র্যাটেজি কী হবে ভেবে বেখেছো?" দৌড়ের আবার স্ট্র্যাটেজি কী? কোচ বোঝালেন—প্রতিদ্বন্দ্বীদেব জানতে হবে। বুঝতে হবে ওদের কি শক্তি। ঠিক করতে হবে ৪৪০ গজের পুরোটা কি এক ভাবে দৌড়বে, না আগে জোরে ছুটে সামনে চলে যাবে, না একটু দম বেখে দেবে পরের দিকে জোরে ছুটে সামনে যাবার প্রয়োজনে। কেউ প্রথম থেকে সামনে থাকতে চায, কেউ স্প্রিণ্ট করে শেষের দিকে টেপ স্পর্শ করতে চায়। কৌশল নির্ভর করবে অনেকগুলো জিনিশের ওপর, বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর।

কমনওয়েলথ গেমসে মেডেল না পেলেও এনো ভালো দৌড়ল। সেখানে নাইজিরিয়ার কোচ ওকে দেখল। দৌড়ের শেষে ওব সঙ্গে দেখা কবে বলল, "তুমি তো নাইজিরিয়ান, তুমি ওয়েল্‌স-এব হয়ে দৌড়বে কেন?" ওয়েল্‌স-এর কোচ বলল, "বাস্টার্ডদের বলো ওদের তোমার ওপর কোনো দাবি নেই। তুমি ওয়েল্‌সেরই—আমরাই তোমাকে তৈরি করেছি।" এনো দোটানায় পড়ল। কিন্তু শেষ অব্দি ভেবে দেখল, অলিম্পিকস-এ বৃটেনের হয়ে স্থান পাওযা শক্ত। কমনওয়েলথ গেমস-এর মতো ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড আলাদা নয় সেখানে। নাইজিরিয়া থেকে স্থান পাবার সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়া ও যে নাইজিরিয়ারই মানুষ সেটা ও ভুলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত নাইজিরিয়ার দলেই ঢুকল। ওর ওয়েলসের কোচ চিঠি পাঠালেন, "তোমার নারকেলের ঝোপে ফিরে যাও, গাছের ডালে ঝোলো। আমার বোঝা উচিত ছিল তোমরা ওই রকমেরই।"

অলিম্পিকসে সেবারের ৪৪০ গজের দৌড়ের তুলনা হয় না। ও দুটো হিট পার হয়ে সেমিফাইনালে গিয়ে আটকে গেল। ফাইনালে সে কি দৌড়? জিতল ওটিস ডেভিস, তারপব কৌফম্যান, তারপর স্পেনস। তিনজনই বিশ্ব রেকর্ড ভাঙল। চতুর্থজনও বিশ্ব রেকর্ড ভাঙল, কিন্তু মেডেল অল্পের জন্য পেল না। নাম মিলখা সিং

"তুমি মিলখা সিং-এর সঙ্গে দৌড়েছিলে?" আমার সপ্রশংস সবিস্ময় প্রশ্ন। আমাদের কাছে যেন মিলখা সিং-ই প্রথম।

এনো বলল, সবাই ভেবেছিল মিলখা দ্বিতীয় বা তৃতীয় হবে। তবে ওই দৌড়ে চার নম্বরও কম কথা নয়।

যাই হোক, দৌড় এবং ডিগ্রি শেষ করে এনো যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলো তখন ওর বয়স অন্য ছাত্রদের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি। ওর দুজন মাস্টার আমার আর বিলের

থেকেও বয়স বেশি। তবু দারুণ সংযত, বিনীত, ভদ্র। বয়স্ক পি-এইচ-ডি ছাত্রদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, ও আমাদের বন্ধুই হয়ে দাঁড়াল।

এনো নানা কাজ জানে। একদিন ও বলল, "তোমার গাড়ি খারাপ হয়েছে? তা গ্যারেজে দেবে কেন। আমাকে দশ পার্সেন্ট কম দাও, আমি করে দেব।" আমি ওকে গাড়ির চাবি দিয়ে বললাম, "আমার বাড়ির সামনের রাস্তাতেই গাড়িটা রয়েছে, তুমি নিয়ে যেয়ো।"

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরতেই হুলুস্থুল কাণ্ড। পাশের বাড়ির মহিলা ছুটে এলেন, "তোমার গাড়িটা একজন 'ব্ল্যাক' লোক এসে এক্ষুনি নিয়ে গেল। তুমি পুলিশে খবর দাও।"

আমি যখন ওকে আশ্বস্ত করে বললাম যে এনো আমার ছাত্র, আমার সঙ্গে কথা অনুযায়ী গাড়িটা নিয়েছে, তখন উনি শান্ত হলেন। বৃটিশদের অনেকের ধারণা কালো মাত্রই চোর ইত্যাদি, যদিও পরিসংখ্যান সেকথা বলবে না।

এনো এরপর অনেকবার আমার গাড়ি সারিয়েছে। এবং ও হাতে নেবার পর গাড়ি সারাবার প্রয়োজনটাও যেন বেড়ে গিয়েছে। যে সমস্যাটা থাকে সেটা হয়তো ভালোভাবেই মিটিয়ে দেয়—কিন্তু আর একটা নতুন সমস্যা তৈরি হয়। কারণটা—এনোর অনুসন্ধিৎসা। ও যা করবার তার থেকে বেশি করবে। এটা টানবে, ওটা খুলবে, সেটা মুচকে দেবে। আরতি বলল, "তোমার ছাত্রকে ভাগাও। এ যে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হবার অবস্থা।" কিন্তু 'ভাগাও' বললেই কি ভাগানো যায়! এনো বলল, "তোমার কাছ থেকে একটা পয়সা নেব না—কিন্তু ওই গাড়ি আমিই সারাব।" যেন ওই গাড়ি সারানোর অধিকারের সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত মর্যাদা পুরোপুরি জড়িয়ে। একদিন বাড়ি এসে আরতির মুখে শুনলাম, এনো এসেছে। কিন্তু এনো কোথায়! অনেক পরে ওকে পাওয়া গেল আমার গাড়ির তলায়—যন্ত্রপাতি নিয়ে ও যে কি ঠুকঠুক করছে ও-ই জানে।

আর একদিন এক বিরাট রোল্‌স রয়েস চড়ে এসে হাজির। আমি বললাম "কি ব্যাপার এনো! তুমি কি লটারি জিতেছো? না ডাকাতের দলে নাম লিখিয়েছো!" এনো বলল, একটা পরিত্যক্ত গাড়ি জলের দামে কিনেছে। তারপর নিজেই সারিয়ে নিয়ে চালাচ্ছে। এর পর থেকে বৃটেনের কোটিপতিদের মতো এনোও রোল্‌স চালায়। আমরা অবাক হয়ে দেখি। সকলের তাক লেগে যায়।

এর ফলটা টের পেলাম এনোর গবেষণার কাজে।

"এনো, তুমি প্রায় তিন মাস হল কোনো লেখা আমায় দাও নি।"

"সরি। সামনের সপ্তাহে দেব।"

সামনের সপ্তাহেও লেখা এল না।

"সরি, রোল্‌সটা বড় গণ্ডগোল করছে। পুরো তিন দিন লাগল ওটা সারাতে।"

পরের সপ্তাহে, "সরি। দুটো পুরনো পার্টস পাচ্ছিলাম না। কোথাও পাওয়া গেল না। অন্য গাড়ির পার্টস মেরামত করে লাগাতেই পুরো হপ্তা চলে গেল।"

এইরকমই চলল। আমি বিল ওয়ারেনকে বললাম, "এনোর আর পি-এইচ-ডি হবে না। ওর এখন গরিবের ঘোড়া রোগ হয়েছে। রোল্‌সই ওকে খাবে।"

শেষ অব্দি অবশ্য রোল্‌সের পেট থেকে ও বেরিয়ে এল। একদিন ছোট্ট দেশলাইয়ের বাক্সের মতো অস্টিন মিনিতে করে হাজির।

"তোমার রোল্‌স-এর কী হল?"

এনো হাসছে। লজ্জার হাসি, "আর পারলাম না, এতো পুরনো গাড়ি। বারবার খারাপ হচ্ছে, তারপর পার্টস কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ওটা আমার এক বন্ধুকে দান করে দিলাম।"

মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ করলে সেই বন্ধুর। যাই হোক, তারপর থেকে এনোর লেখার কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগলো।

কিন্তু সেখানেও সমস্যা। আমি আর বিল ওকে নিয়ে বসি। আলোচনা করি, ওর যুক্তির অসঙ্গতি, তথ্যের অসম্পূর্ণতা দেখাই। লাইন ধরে ধবে আলোচনা হয়। তারপর বলি, "এই পরিচ্ছেদটা তুমি নতুন করে লেখো।" এনো মুখ নিচু করে গম্ভীর হয়ে থাকে।

এক মাস পরে 'নতুন' খশড়া হয়। হয়তো টি-এর মাথা কেটেছে, আই-এর ডটটা দিয়েছে—কিন্তু সবটা মিলিয়ে খুব বেশি পাল্টায় নি। আমবা বলি, "হবে না। আবার লেখো।" ও মাথা নিচু করে চলে যায়। কিন্তু একটা অদ্ভুত জেদ ওর মধ্যে দেখলাম। ও মচকাবে তবু ভাঙবে না।

যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, তখন দেখলাম ওর মনোভাব খানিকটা পাল্টাল। যা শেষ পর্যন্ত তৈরি করল সেটা বলা যায় 'মার্জিনাল থিসিস'। পাশ করা না কবার সম্ভাবনা সমান-সমান। ওর পরীক্ষার দিন আমি আর বিল চিন্তায় উত্তেজনায় আঙুলেব নখ কামড়াচ্ছি। কিন্তু এনো নির্লিপ্ত। এনো পি-এইচ-ডি পেল।

দেশে যাবার আগে বলল, "নাইজিরিয়ায় এসো। এলে দেখবে আমরা সত্যি সত্যি গাছেব ডালে ঝুলি না।" আমি বললাম, "আমার গাড়ি খারাপ হলে তোমাকে 'কেবল' পাঠাব। তুমি এসে আমাদের সঙ্গে থেকে গাড়ি সারিয়ে দিয়ে যেয়ো।"

॥ দুই ॥

প্রায় সাত-আট বছর পরে আবার দেখা। ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ এনো উসুরু আমাকে আর আরতিকে ওর স্টাডিতে এনে বসালেন। ১৯৭৪ সাল।

আমি ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বললাম, "এনো, এ যে বিশাল ব্যাপার। তোমার ঘর তো আমা'র ঘরের তিনগুণ। তারপর যে পুরু নরম চামড়ার সোফা দেখছি সে তো আমাদের ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরেও নেই।"

এনো হাসে। সেই পুরনো সলজ্জ এবং খানিকটা সগর্ব হাসি। এনো পাল্টায় নি।

"তোমার গাড়ি-রোগ সেরেছে?" আরতি প্রশ্ন করে।

এনো বলে, "একটা পুরনো ক্যাডিলাক কিনেছি। মার্কিন এম্বাসির একজন দেশে ফেরার আগে বিক্রি করে গিয়েছে। সেটাই চালাই।" রোল্‌স থেকে ক্যাডিলাক—এনো পাল্টাবে না। জিগ্যেস করতে ভরসা পেলাম না ওর মাইনেব টাকার কতটা যায় ওই গাড়ির তেলে আর সারানোর তাগিদে। যাই হোক, সেটা ওর ব্যাপার। ও যদি খুশি থাকে ওর মতো থেকে আমাদের আপত্তি কববাব কী আছে?

ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় এক বিরাট জায়গা জুড়ে। একটার পর একটা ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং। শিক্ষকদের বড় বড় ফার্নিচারে ঠাসা ঘর। এনো বলল, "এইরকম সব সময় ছিল না। তেলের টাকা যত বাড়ছে তত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচুর্যও বাড়ছে।"

ওখানে অভ্যর্থনার ত্রুটি নেই। এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্ট যাবার জন্যও গাড়ি। এনো জানাল প্রায় সব বিভাগেরই আলাদা গাড়ি আছে। ওকে বললাম, "তোমরা তো সব না হেঁটে বেলুনের মতো হয়ে দাঁড়াবে এর পর।"

ফ্যাকাল্টি ক্লাবে থাকবাব ব্যবস্থা। ব্যবস্থাপত্র ভালো হোটেলেরই মতো। পাশেই সুইমিং পুল। এবং সঙ্গে 'বার'। উন্মুক্ত জায়গায় পুলের পাশে অনেকখানি বসবার জায়গা। সেখানে সন্ধেবেলা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির অধ্যাপকদের ভিড়।

এনো একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, "কমরেড আলাকিজা।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "এনো, তুমি যে কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ সেটা তো জানতাম না। কনগ্রাচুলেসন্‌স। তুমি যে কাউকে কমরেড বলে আলাপ করিয়ে দেবে ভাবিই নি। বরং উল্টোটাই ভেবেছি।"

এনো আপত্তি করে বলল, "না না, ওর নামই কমরেড।"

কমরেড বলল, ঠিক তা নয়। ওর একটা অন্য পৈতৃক সূত্রে পাওয়া নাম ছিল। সেই নামটা ওর পছন্দ নয়। কমরেড কথাটা শুনতে ওর ভালো লেগেছিল, এখানে ব্যবহার হয় না। তাই এফিডেফিট করে নাম পাল্টে নিয়েছে। কম্যুনিস্ট? না, তা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, বামপন্থী নিশ্চয়ই।

সন্ধে যত হল, গ্লাসের পর গ্লাস বিয়ার আর হুইস্কি যত ঢুকল, ওদের আলোচনাও তত জমল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক, নাম ধরুন রবার্টস, তিনি একটার পর একটা গ্লাস যেমন মুখে ঢালছেন তেমনি গল্পের পর গল্প বলছেন। সবাই ওর গল্প শুনে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ওদের গলা দরাজ, হাসি প্রাণখোলা। ওরা আনন্দ করতে জানে, ইংরেজদের মতো মুখ গোমড়া নয়।

আমি ইংলণ্ডে থাকি জেনে রবার্টস দেখাল কীভাবে ইংরেজরা ট্রেনে বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে মুখ নিচু করে শুধু কাগজ পড়ে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, এবং প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়ে কীভাবে মুখ না তুলে বলে, "বেগ ইয়োর পার্ডন।" সেই মুখভঙ্গি দেখেও সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

তারপর বলল সেই পুরনো গল্প। দুই ইংরেজের গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে। একজন গাড়ি থেকে নেমে দ্বিতীয় জনের গাড়িতে খুব জোরে লাথি মারল। দ্বিতীয় জন তখন রেগে প্রথম জনের গাড়ির ওয়াইপার খুলে ভেঙে দিল। প্রথম জন তখন দ্বিতীয় জনের গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিন ছাতা দিয়ে ভাঙল। দ্বিতীয় জন তার পাল্টা ওর টায়ার ফাটিয়ে দিল। এইভাবে দুজন দুজনের গাড়ি পুরোপুরি ভেঙে তারপর নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু করল।

"কিন্তু এত যে মারামারি, ভাঙাভাঙি—এরা কিন্তু একজনও একটা কথা বলল না।" রবার্টস বলল।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে। সে কি সম্ভব?

"হ্যাঁ সম্ভব। কেন জানো?" রবার্টস সকলের দিকে একবার করে তাকাল। আমার দিকেও। আমি অবশ্য পাঞ্চ লাইনটা জানতাম, কিন্তু রসভঙ্গ হবে ভেবে বললাম না।

"কারণ," রবার্টস ইংরেজদের মতোই মুখ গম্ভীর করে বলল, "ওদের যে কেউ আলাপ করিয়ে দেয় নি। আলাপ না করালে ইংরেজরা কথা বলবে কীভাবে?"

সবাই হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ল। আরো মদ এল।

রবার্টস তারপর বলল, "ইংরেজরা আমাদের দেখতে পারে না কেন জানো?"

সবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

উত্তরে রবার্টস এক প্রচণ্ড অশ্লীল গল্প ফাঁদল, যার মূল কথা আফ্রিকানরা অনেক বেশি খাঁটি পুরুষ। ইউরোপীয় মেয়েরা তাই আফ্রিকান দেখলে ওদের কাছে যায় না। ইউরোপীয় পুরুষদের ঈর্ষার সেটাই বড়ো কারণ। এবং সেই ঈর্ষা থেকে ঘৃণা ও আক্রমণ।

আলাপ হল অনেকের সঙ্গে। সবাই রবার্টস নয়। যেমন অধ্যাপক মারোগুঞ্জে—যিনি অভিবাসন নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। পণ্ডিত মানুষ। উনি এক কোণে বসে চুপটি করে গল্প শুনছিলেন, মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু আলোচনায় যোগ দেন নি।

আরো আলাপ হল অধ্যাপক ওলাটুবোসমের সঙ্গে। বেঁটেখাটো একেবারে গোল চেহারা। গায়ে বাটিকের রঙচঙে পোশাক। এই পোশাক বহু নাইজিরিয়ানই পরে। কথায় বার্তায় বিনয়ের অবতার। ওর একগাদা লেখার কপি দিলেন—উদ্দেশ্য, যে সম্মেলন সংগঠিত করবার জন্য আমার সেবার আফ্রিকা যাওয়া সেখানে আমন্ত্রিত হওয়া। ওলাটুবোসমও রবার্টসের সভাসদদের একজন—মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ।

এনোকে বললাম, "বহুদিন সুইমিং পুলে সাঁতার কাটি নি। এসো কাল সকালে স্নান করি।"

সকালে বার-এ কোনো ভিড় নেই। রোদ্দুর তখনো চড়া হয় নি। একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ। আমি আর এনো জলে নামলাম।

স্নান ভালো লাগল। কিন্তু মাঝে মধ্যে গুলিয়ে গেল কোথায় রয়েছি। কোথাকার সুইমিং পুল! কেননা, আমি আর এনো বাদে বাকি সবাই ইউরোপীয় এবং মহিলা বা শিশু। এই সুইমিং

পুল লণ্ডনে বা প্যারিসেও হতে পারত। ফুটফুটে শাদা বাচ্চাগুলো ভীষণ চিৎকার করে জল ভাঙছে, আর মায়েরা স্নানের সঙ্গে ঘরকন্নার গল্প করছেন।

"এরা কারা ?" এনোকে জিগ্যেস করি।

এনো বোঝে কেন আমি অবাক হয়েছি। বলল, "এরা ফ্যাকাল্টি-ওয়াইভস।" মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের স্ত্রী। এক সময় অবশ্য ইবাদান লেগোস ইফে ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন ইউরোপীয়। এখন তো সে অবস্থা নয় ! অন্তত গত রাত্রের বার-এ তো কোনো ইউরোপীয়কে দেখি নি ! বরং ঠাট্টা গল্পের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের মানুষ। তাহলে ?

"কালকে রাত্রে যাদের বারে গল্প করতে দেখেছো, এরা তাদেরই বউ।" এনো খোলসা করে বলে। তারপর একজন শ্বেতাঙ্গিনী সুদর্শিনীকে দেখিয়ে বলে, "ওই হচ্ছে রবার্টসের বৌ।" তারপর এক একজন অধ্যাপকের নাম করে তাদের বৌদের দেখিয়ে দেয়।

এদের কোথায় পেল ? জানলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বলা যায় এমন একজন নাইজিরিয়ান অধ্যাপকও নেই যিনি কখনো না কখনো বৃটেনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্য কোথাও পড়তে যান নি। এবং পড়ার শেষে অনেকেই পি-এইচ-ডির সঙ্গে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে দেশে ফিরেছেন।

৷৷ তিন ৷৷

ইবাদান এক বড় শহর। ১৯৭৪ সালেই পনেরো লক্ষ মানুষ। কিন্তু এর পথে-ঘাটে হাঁটলে ঠিক ওই মাপের বড় শহরের মেজাজ পাওয়া যায় না। এত বড় হয়েও ইবাদান যেন এক বিশাল গ্রাম। বড়ো রাস্তা আছে বাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু বড় শহরেব হুল্লোড় নেই, চোখ-ধাঁধানো পরিবেশ নেই।

কারণটা হয়তো এই যে শিল্প নেই বললেই চলে, এবং গাড়ি-ঘোড়াও তুলনায় কম। ইবাদানের বাস্তায় স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়, যা লেগোস-এ ভাবা যায় না। পশ্চিম আফ্রিকাব এক পুরনো শহর, কিন্তু বড় হয়েছে সম্প্রতি। কাছের ইফে শহব থেকে এই অঞ্চলে আক্রমণ হয় ১৮২৯ সালে এবং এক নতুন প্রশাসন চালু হয়। যেটা দেখবার মতো, কোনো রাজা বসানো হয় না—বরং দুই সৈনিক যৌথভাবে রাজ্য চালাতো—একজন 'বালোগুন', সেনাপতিদেব নেতা, আরেকজন 'সেরিকি', সাধারণ সৈনিকদের নেতা।

ইবাদান পশ্চিম নাইজিরিয়ার রাজধানী। ইয়ুরুবাদের রাজধানী। এখানকার মানুষের পাঁচজনের তিনজন মুসলমান এবং দুজন খ্রীস্টান বা অন্য কিছু। কিন্তু মুসলমান বা খ্রীস্টান যাই হোক, পুরনো আফ্রিকান সংস্কৃতি এখানে এখনও বেঁচে আছে। ইবাদানের উত্তরে ঘাসের বন, দক্ষিণে গভীর জঙ্গল। এই শহর যেন ঘাস আব জঙ্গলের সন্ধিস্থল। শহব বাডবার সেটাই হয়তো এক বড কারণ। প্রবণতা হচ্ছে ঘাসের বন বা সাভানা ছেড়ে দক্ষিণের জঙ্গল বা উপকূলের দিকে যাওয়া। ইবাদানে সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধবে নতুন নতুন মানুষের ভিড়।

'ইউরুবা' শুনলেই রোজ অনোউজু নাক কুঁচকোয়। বোজ ইবো, পূর্ব অঞ্চলেব মেয়ে। ও বলে, "ইউরুবাদের কখনো বিশ্বাস করবেন না। ওরা পারলে নিজেব মাকে বিক্রি কবে টাকা করবে। ওরা টাকা আর স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না।"

কিন্তু সেটা রাগের কথা। মন্তব্যটা ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে যখন নাইজিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। এখন হয়তো রোজ একথা বলবে না। কিন্তু এটা ঠিক যে ইউরুবারা ব্যবসা জানে।

ইবাদানের রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেশ বড় মাপের বাজার। দক্ষিণে নাইজিরিয়ার রাজধানী লেগোস, একশো মাইল দূরে। রাস্তা ভালো, ট্রেণপথও আছে। উপকূল থেকে উত্তরের শহরগুলোতে যা জিনিস যায় তার এক বড় অংশ যায় ইবাদান হয়ে। উত্তর থেকেও একইভাবে দক্ষিণে মাল যাবার পথ ইবাদান হয়ে। শহরের পশ্চিমের রেলের স্টেশন থেকে লেবানন স্ট্রিট হয়ে টাউন হল পর্যন্ত একটানা বাজার। বিরাট মসজিদ আর ইবা মার্কেট পাশাপাশি।

কিন্তু শিল্প সামান্যই। বরং বেশ কয়েকটা বড় বাগিচা রয়েছে কাছাকাছি। শহর ভরে নানা নদী। জঙ্গল দূরে নয়। এনো জানাল, শহরের কর্মজীবী মানুষের তিনভাগের একভাগ চাষের

কাজে নিয়োজিত—যা এত বড় শহরের ক্ষেত্রে ভাবাই যায় না।

ইবাদান ব্যবসা বাণিজ্যের শহর—বলাটা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এখানে কোনো সংস্কৃতি নেই।

"আমাদের সংস্কৃতি অন্তত এক হাজার বছরের পুরনো।" এনো বলে।

আজকাল অবশ্য এই কথাগুলো আর শুধু আন্দাজের ব্যাপার নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রায় বাইশশো বছর আগেও এই অঞ্চলে কৃষি ছিল এবং ধাতুর ব্যবহার এরা জানত।

ইবাদানের কিছু দূরেই প্রাচীন শহর ইফে। সেখানেও এক বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ধরে নেয়া হয় এক সময় ইফে ছিল তখনকাব তুলনায় বেশ বড় শহর—এবং 'নোক' সংস্কৃতির পীঠস্থান।

নোক সংস্কৃতির নাম 'নোক' গ্রাম থেকে যেখানে ত্রিশের দশকে টিনের খনির কাজ করতে গিয়ে মাটির গভীরে এক প্রাচীন সভ্যতাব খোঁজ পাওয়া যায়। ওখানকার টেরাকোটা বা ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে যে নমনীয়তা বা পবিপক্ক কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সেটা অতো পুরনো সময়ের আফ্রিকাতে পাওয়া যাবে বলে কেউ ভাবেনি। কিন্তু কার্বন-ডেটিং করে জানা গেছে, খৃষ্ট জন্মাবার নশো বছর আগে থেকে দুশো বছর আগে পর্য্যন্ত এই সভ্যতা ছিলো। এই সভ্যতা ছিল যাযাবর পশুশিকারী জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক জীবনের সন্ধিক্ষণে, এবং লোহা গলিয়ে অস্ত্র তৈরী করবার শুরুতে।

ইফের নগরায়ণ হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। ইফের রাজার নাম ছিল 'ওনি'। ওখানকার সনাতনী ধর্মের সবচেয়ে বড় দেবতা 'ওলোরুন'। তারপর এক বড় দেবতা 'ওডুডুওয়া', পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হিন্দুদের ব্রহ্মার মতো। লোকগাথায় বলে তিনিই নাকি ইফে তৈরী করে তার রাজা হন, এবং তার ছেলেদের পাঠান অন্যান্য রাজ্যে রাজত্ব করতে। এইটুকু বলতে গিয়েই বুঝে গিয়েছি, ওদের ভাষায় 'ও' এবং 'ই' শব্দের ছড়াছড়ি। এবং এটাও বোঝা গেল যে ভগবান ইউরুবা ছিলেন। যাই হোক, পরবর্তী কালে 'ওনি' নির্বাচিত হতো পালা করে বিভিন্ন রাজবংশ থেকে। এবং সত্যি সত্যি নির্বাচন হতো, যদিও ভোটার ছিল শুধু রাজবংশের সদস্যরা।

আর একটা বিরাট বড় শহর ছিল বেনিন—পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে যা ইফেকেও ছাড়িয়ে যায় প্রভাবে এবং প্রাচুর্যে। এবং সাংস্কৃতিক বিচারে—যার প্রকাশ বেনিনের শিল্পে এবং ভাস্কর্যে। বেনিনের রাজাকে বলা হতো 'ওবা'—যার নগর-রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষ, এবং আয়তন ছিল মাত্র ২৫ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ বেশ ঘন জনবসতি, যা ওই সময়ের বিচারে ভাবাও যায় না। বেনিন ইবাদানের পূর্বদিকে—কিন্তু সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

ইফে আর বেনিনের পরই, ঐতিহাসিক ভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর ওইও—ইবাদানের উত্তরে। ওখানকার রাজাকে বলা হতো 'আলাফিন' প্রধান মন্ত্রীকে 'বোসুরাম' বা ওকেনু। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত ইউরুবা অঞ্চলই ছিল আলাফিনের নিয়ন্ত্রণে। পূর্বে বেনিন এবং পশ্চিমে ডাহোমির রাজা আলাফিনকে নিয়মমত কর দিতো যারা কর দিতো না তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো ওইওর সৈন্যরা। ওরা ছিল খুব ভালো যোদ্ধা, সৈন্যবাহিনী ছিলো বিশাল, কোন কোন হিসাবে, প্রায় এক লক্ষ—হয়তো সেটা অতিরঞ্জন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে আতংকের ছিল অশ্বারোহীরা।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ওইও দাবী করলো, ডাহোমির রাজস্ব বাড়াতে হবে। এবং রাজস্বের অংশ হিসাবে দিতে হবে ওখানকার সদ্যমৃত এক রাজার একশো বউকে। ডাহোমি থেকে কিছু বউ পাঠানো হলো, কিন্তু ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট আলাফিন দূত মারফৎ জানালেন, "একশো জনই চাই, এক্ষুনি, না হলে..."। ডাহোমি অগত্যা পাশের ছোট্ট নগর রাজ্য আগুনা দখল করে সেখানকার

একশো মেয়েকে ধরে ওদেরই পুরনো রাজার বিধবা বলে জানিয়ে আলাফিনের হারেমে পাঠালো।

যুদ্ধ যাওয়াটা ছিলো যেন এক বড় উৎসব। নানা নিয়মপত্র মানা হতো। মানুষ আসতো, পোষাক আসতো, মাল আসতো, অস্ত্র আসতো, যুদ্ধের নিয়মসম্মত নাচ হতো। ঠিক যুদ্ধে যাবার আগে সেনাপতি তাঁবু থেকে বেরিয়েই এক বড় মোষের চামড়া মাটিতে পেতে দিতেন। দু পাশে বসিয়ে দেয়া হতো বর্শা—এবং প্রতিটি সৈন্যকে ওই দুই বর্শার মধ্য দিয়ে, মোষের চামড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হতো। যখন পায়ের আঘাতে ওই চামড়া ফুটো হয়ে যেতো তখন সেনাপতি বুঝতেন দরকারমত সৈন্য পাওয়া গিয়েছে। হাঁটা বন্ধ হতো, এবং চামড়া গুটিয়ে বর্শা তুলে অভিযান শুরু হতো।

আলাফিন ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। সমস্ত ইউরুবা অঞ্চলই ছিল তাঁর পায়ের তলায়।তবুও এই অধিকার পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক ছিল না। অভিজাত গোষ্ঠীর পরামর্শ তাকে শুনতে হতো, এবং রাজার কাজে সন্তুষ্ট না হলে ওরা বাধ্য করতো রাজাকে পদত্যাগ করতে। সেই পদত্যাগের সঙ্গে ছিল দেহত্যাগ, কিন্তু এক অভিনব পন্থায়। প্রধানমন্ত্রী অভিজাতদের পক্ষ থেকে আলাফিনকে বলতো, "মহারাজ, রাজ্য প্রশাসনের কাজ করে করে নিশ্চয়ই আপনি খুব ক্লান্ত। আপনি দয়া করে ঘুমুতে যান।" এবং হাত বাড়িয়ে দিতেন একঝুড়ি টিয়াপাখীর ডিম। রাজা সংকেত পেয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতেন, এবং নিজের রাজশয্যায় শুয়ে চোখ বুজতেন। রানীরা তখন গলাটিপে আলাফিনকে মেরে ফেলতো। আলাফিনের ছেলেই হয়তো তখন এসে সিংহাসনে বসতো—রাজ্য যেমন চলছিল তেমন চলতো।

অবশ্য সব সময় যে এতোটা ভদ্রভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হতো তেমন নয়। ১৭৭৪ সালের এক আলাফিন টিয়াপাখীর ডিম উপহার পেলেন, ঘুমুতে যাবার আবেদন পেলেন, কিন্তু উল্টে প্রধানমন্ত্রীরই মাথা কেটে ফেললেন এবং বিদ্রোহ দমন করলেন।

ওইওরও পতন হলো ১৭৯০ সালে।পূর্বদিকের নগর-রাজ্য নুপে ওদের পরাজিত করলো। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরাজয় হলো ১৮৩৭ সালে, যখন উত্তর থেকে আসা ফুলানিরা ওদের প্রাচীর-ঘেরা নগর রাজ্য ভেঙে চুরমার করে দিলো।

এত বড় বড় শহর। এত পুরনো শহর। প্রতিটি শহর নিয়ে একটি রাজ্য। ছোট, মাঝারি, বড়—কে কার আগে বা পরে সাজানো—তার বিচারে স্থির হতো কে রাজস্ব পাবে কে দেবে। এ যেন মোগল আমলের ভারতবর্ষ। এবং মোগল আমলের মতোই শহরগুলো ছিল প্রতিরক্ষার ঘাঁটি, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র খুব ছোট জনপদ থেকে ওইওর মতো সাম্রাজ্যের রাজধানীতে কর রাজস্ব পাঠানোর পথে ছিল এই রকম অসংখ্য ছোট বড় শহর বা জনপদ, যেমন ছিল মোগল আমলের উত্তর প্রদেশ। শহরের চারপাশে ছিল দুই বা তিন স্তর প্রাচীর, তার ওপাশে পরিখা। কোথাও দেয়াল ছিল মাটির, দু এক জায়গায় কাঠের।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্তুগীজরা এলো পশ্চিম আফ্রিকায়। ১৫০৮ সাল থেকে দাসব্যবসা ভালো করে শুরু। সেই সময় থেকে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এতো যুদ্ধ হবার সেটাও ছিল এক বড় কারণ। যুদ্ধে জেতা মানে দাস পাওয়া, বা দাসব্যবসার ওপর কর এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ চাপানো। সেই দাস উপকূলে পর্তুগীজ বা ডাচদের দিলে বিনিময়ে পাওয়া যেতো আগ্নেয়াস্ত্র এবং নানা ইউরোপীয় সম্ভার, কখনো সোনা। আগ্নেয়াস্ত্রের লোভ ছিল খুব বড়। এবং যতো দাসব্যবসা বেড়েছে ততো দরকার হয়েছে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে শহরে আশ্রয় নেবার। সেটাও শহর বাড়বার এক বড়ো কারণ।

১৮৩৭ সালে ফুলানিরা ওইও ধ্বংস করবার পর থেকে ইবাদান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ইফে, বেনিন বা ওইওর মতো ঐতিহ্য ইবাদানের নেই—কিন্তু দেড়শো বছর ধরে দারুণ বেড়েছে, হয়ে উঠেছে শুধু পশ্চিম নয়, সমগ্র নাইজিরিয়ার সবচেয়ে বড় শহর। ১৯৭৪ সালে যখন ওখানে গেলাম তখন অবশ্য লেগোসের লোকসংখ্যা বেড়ে প্রায় ইবাদানের মতোই হয়েছে—এখন নিশ্চয়ই আরো বেশী।

"তুমি ইবাদানে কেন এলে বলতো ?" বলে রবার্টস, "যাবে লেগোসে, শহরের মত শহর, চোখ ঝলসে দেবে। পুরনো শহর চাও-যাও ইফে বা ওইও বা বেনিন, যার ঐতিহ্য আছে। এখানে কি আছে বলো ? দেখবার মধ্যে তো এক বিশ্ববিদ্যালয়, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রবার্টস। দুটোই তো দেখে ফেলেছো। আর কেন ?"

রবার্টস এইভাবেই কথা বলে। বিশেষ করে সুরাসিক্ত সন্ধ্যায়। কিন্তু মানুষটাকে বেশ ভালো লাগে আমার। হয়তো কথাবার্তা খানিকটা অশালীন, মাঝে মধ্যে কান গরম হয়ে যায় ওর কথা শুনে। হয়তো বৃটিশ বিদ্বেষটা অনেক সময় অন্ধ বর্ণ বা জাতিবিদ্বেষের পর্যায়ে চলে যায়। এসবের পরও শ্বেতাঙ্গিনী সহধর্মিণী হয়তো আরও অসহনীয়। কিন্তু তবু দেখেছি মানুষটা চিন্তাশীল এবং অনেক কিছু জানে। দিনের বেলা কাজের সময় অন্য মানুষ—চেনা যায় না। তখন সুযোগ নিয়ে ভালো করে ওর মগজে ঢুকি, কথা আদায় করি।

রবার্টস ঠিকই বলেছে—ইবাদানে দেখবার মতো জিনিস শুধু বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৮ সালে শুরু—নাইজিরিয়ায় প্রথম। পরে অবশ্য জারিয়া, ইফে, লেগোস, নোসুকাতেও বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে—কিন্তু আভিজাত্যের বিচারে ইবাদান এখনও এগিয়ে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখার জিনিস আব কি থাকতে পারে ? শোনবার অবশ্য অনেক কিছু রয়েছে।

নাইজিরিয়ায় আসবার আমার তিনটি উদ্দেশ্য। এক, ওই বছরই সাসেক্স-এ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর পবিসংখ্যান ব্যবস্থা ও নীতি নিয়ে ডাডলী সিয়ার্স আর আমি একটা সম্মেলন পরিচালনা করি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, দেখা নাইজিরিয়া ও ঘানার ডিরেক্টর অফ স্ট্যাটিসটিক্সের সঙ্গে আলোচনায় বসে সেই সম্মেলনের মূল সুপারিশ কতোটা কার্যকরী করা যাবে, এবং বোঝা ওদের সমস্যার প্রকৃতি কি। সেই কাজ অবশ্য ইবাদানে নয় লেগোসে। কিন্তু বাকি দুটো কাজ গবেষণা সংক্রান্ত—যা নিয়ে পরে 'ভিলেজ ষ্টাডিজ' এবং 'মাইগ্রেশন' সংক্রান্ত তিনটে বই প্রকাশ হয়েছে। ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজনের এই নিয়ে ভালো লেখাপত্র আছে। এ সবের সঙ্গে যোগ নিছক বেড়ানো—কলা বেচার সঙ্গে রথ দেখা আব কি !

নাইজিরিয়ায় ঘুরতে হলে ইবাদান সবচেয়ে ভালো জায়গা। উত্তর, দক্ষিণ, আর পূর্ব যাবার অনেক সুবিধে। কিন্তু আরো এক বড় কারণ, ফ্যাকাল্টি ক্লাবে আমার নেশা ধরে গেল।

রোজ সন্ধ্যায় যথারীতি পাইন এ্যাপলের গ্লাস নিয়ে ওদের সঙ্গে বসি। পৃথিবীর সমস্ত রকম সমস্যার আলোচনা হয়, সমাধান পটাপট আসে। সুইমিং পুলের পাশে সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় কোন সমস্যাই আর সমস্যা থাকে না। তখন সমাধানটাই হয়ে দাঁড়ায় এক বড়ো সমস্যা।

কিন্তু গৃহযুদ্ধের আলোচনা কেউ করে না। এমন কি এনোও না। স্পোর্টস, গাড়ী, বিশ্বশান্তি, বীটল্‌স, পাম তেল, পেট্রোলিয়ম, সব কিছুর আলোচনা নিঃশেষ হবার পরও গৃহযুদ্ধের কথা এনো তুলবে না। লণ্ডনে থাকতে খুব জোর করলে বলতো, "আমি আদার ব্যাপারী আমার জাহাজের খবরে কি দরকার !" অথবা বলতো, "যুদ্ধ উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্বের। আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম। যারা জিতবে তাদের গলায় মালা দেবো।" এখানে বলে, "ওসব চুকেবুকে গেছে, কেউ তা নিয়ে কথা বলে না। যা ঘটে গেছে তা তো আর পাল্টানো যাবে না। কিছু লোক মরতে হবে মরলো।"

একবার ফ্যাকাল্টি ক্লাবের সন্ধ্যার আসরে কথাটা তুলে দারুণ ভুল করলাম।

আমার প্রশ্নে ওই সোচ্চার নেশাগ্রস্ত মানুষগুলোও যেন ক্ষণিকের জন্য বোবা হয়ে গেল।

তারপর একজন বললো, "সিভিল ওয়র ? কি বলছো তুমি ? যুদ্ধ কখনো 'সিভিল' হয় ! যুদ্ধ সব সময়ই একটা অসভ্যতা।"

আর একজন বললো, "বলো যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ নয়।"

তৃতীয় জন : "কোথাকার যুদ্ধ ? তুমি কি গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মার্কিন গৃহযুদ্ধের কথা বলছো ?"

চতুর্থ জন, "আগে কাশ্মীরে কি হলো বলো !"

পঞ্চম জন, কিছুটা রুক্ষ ভাবে, "তোমার এ ব্যাপারে নাক গলাবার কি দরকার ? নিজের চরকায় তেল দাও।"

বুঝলাম, প্রশ্নটা বড় তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আর একটু ভাব না করে এই প্রশ্ন যেন কোনো স্বল্প পরিচিত মানুষের মেয়ের অবৈধ প্রেম নিয়ে অনধিকার পরচর্চা। তাছাড়া ক্লাবের ওই আলোচনায় সব অঞ্চলের মানুষই রয়েছে। সংকটটা বুঝি। সরকার মিলিটারীর হাতে, সেখানে উত্তর অঞ্চলের মানুষই বেশী। অধ্যাপকদের মধ্যে এক বড অংশ পূর্ব অঞ্চলের। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান পশ্চিম অঞ্চলে। ওই যুদ্ধ তখনো টাটকা জিনিস—চার বছব আগের ঘটনা। সেই যুদ্ধের ঘা তখনও দগদগ করছে ওদের মনে। ওটাকে খুঁচিয়ে বাড়াতে কেউ আর চায় না।

যেমন হয় এইসব আলোচনায়, আলোচনা একটু পরে ঘুরে গেল অন্য বিষয়ে। হয়তো ভুলেও গেল সবাই আমার এই অর্বাচীন প্রশ্ন।

কমরেড আলাকিজা বললো, "এই বিশ্ববিদ্যালয়টা কয়েক বছর আগেও ঠিক আমাদের ছিল না। আমাদের ছাত্র অবস্থায় মাষ্টার মশাইদের এক বড় অংশই ছিল ইংরেজ বা মার্কিনী। পাঠ্যসূচীও ছিলো ওদের পছন্দমত তৈরী। এরা ওদের দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখতো। এখন অবশ্য অবস্থা পাল্টেছে।"

রবার্টস বলে, "বাঃবা। ওই সেদিনও ওদের কি দাপট ! আমি দ্যাখো এত ভালো ছাত্র ছিলাম, বিদেশ থেকে পি-এইচ-ডি হয়ে এলাম, বই লিখলাম, নাম হলো, তবু আমাকে প্রমোশন দেবে না। আমাকে টপকে আমার জুনিয়র ইংরেজ ছেলে উঠে গেল, আমি কোথায় ! তুমি বিশ্বাস করবে না, এক সময় আমরা ছিলাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়। ওদের মাতব্বরি আমরা স্বাধীনতার পরও দীর্ঘদিন বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছি। ছোঃ, এসব ভাবতেও লজ্জা করে। ওরা আমাদের ছোট ভাববে না কেন বলো ?"

কমরেড জানায়, ইবাদান বা লেগোসে এই অবস্থা পাল্টালেও ইফে বা জারিয়াতে এখনও বৃটিশ প্রভাব বেশ খানিকটা রয়েছে। সাংস্কৃতিক নির্ভরতা যায় নি।

তবু এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভিত্তি করেই এক নতুন 'এলিট' গড়ে উঠেছে। আলাফিন, ওনি আর ওবাদের প্রভাব কমছে। এখন ডিগ্রী চাই, বিদেশী তকমা চাই। এই এলিটকে তৈরী করেছে বৃটিশরা, আবার এরই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরতার জ্বালাটা বোঝে সবচেয়ে বেশী। খুঁজলে দেখা পাবো দু এক পুরুষ আগে এরাই ছিল চীফ—তাই শিক্ষার সুযোগ এরাই প্রথম পেয়েছে। বৃটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক এরা ভুলতে পারে না, কিন্তু নাইজিরিয়ান সত্তাটাও পুরোপুরি বিকিয়ে দিতে পারে নি। তাই কখনো লেজুড় কখনো বিদ্রোহী। সাদাবিদ্বেষী আলোচনা আর শ্বেতাঙ্গিনী শয্যাসঙ্গিনী।

যতো রাত বাড়ে, ততো রবার্টসের কথা বাড়ে। রোজই একটা ছক লক্ষ্য করি। প্রথম সন্ধ্যায় রবার্টস হাসিখুশী, হিউমার উইটে ঝলমল করছে। মাঝ সন্ধ্যায় সেই তরলতা কমে যায়, দারুণ

সিরিয়াস হয়ে পড়ে, চিৎকার করে তর্ক করে, গালাগালি করে ঝগড়া করে। রাত হলে, বেশ কয়েক পেগ পেটে গেলে তখন আলোচনায় আসে বিষাদের সুর, আত্মসমীক্ষা। সেই রবার্টসই আমার কাছে আসল মনে হয়।

"দ্যাখো, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় গলায় দড়ি দিই। আমরা কি মানুষ ? স্বাধীন হবার অধিকার কি আমাদের আছে ! এই যে দাসব্যবসা নিয়ে আমরা পর্তুগীজ-ডাচ-বৃটিশ এদের গালাগাল করছি, আসল দোষ তো আমাদের। কজন পর্তুগীজ আমাদের দেশের মধ্যে ঢুকে মানুষকে ধরে জাহাজের খোলে ঢুকিয়েছে বলো ? হিসেব করে দেখবে সামান্যই। দাস যোগাড় করেছি আমরাই, আমরাই আমাদের দেশের মানুষদের ধরে ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। ওরা এরপরেও আমাদের সম্মান দেবে কেন বলো ? আমরা নিজেরা মাবামারি কাটাকাটি করেছি, এ ওকে আক্রমণ করেছি ওই দাসব্যবসার অংশ পেতে, আমার পূর্বপুরুষরাই করেছে। কিন্তু বদলে কি পেয়েছি বলো ? যা পেয়েছি তার মূল্য কি এত ? ওগুলো না হলে কি চলতো না ? আমরা তো খেয়ে পবে ভালোই ছিলাম। এমন নয় যে সাহেলের মানুষের মতো এক খরার ধাক্কায় হাজার হাজার মানুষ মরলো !" রবার্টসের মনে ক্ষোভ।

এবাব এনো বলে, "আমাদের ইউরুবাদেব দীর্ঘদিনের পুরনো সংস্কৃতি। খৃষ্ট জন্মের নশো বছর আগে, মানে ধরো তিন হাজার বছব আগেই এখানে 'ধাতু বিপ্লব' হয়েছে, কৃষিবিপ্লব হয়েছে—মানুষ চাষ জেনেছে, লোহার ব্যবহার শিখেছে। তবু ভাবতেও খারাপ লাগে যে সামান্য কিছু বৃটিশ, কতো সহজে আমাদের দেশটাকে দখলে আনলো। ভারতীয় সৈন্য হয়তো কিছু ছিল ওদের সঙ্গে, তাদের সংখ্যা আব কতো বলো ? আসলে কয়েক শো বছরের দাসব্যবসা আমাদের প্রশাসন, সংগঠন, নীতিবোধ সব ঝাঁঝবা কবে দিয়েছিলো।"

আমি কিছু বলি না—কিন্তু মনে না এসে পারে না কতো সামান্য লোকবল নিয়ে বৃটিশরাও পলাশীব যুদ্ধ জিতেছিল। এবং পলাশী যুদ্ধেব আগের দেড়শো বছর বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা কিভাবে প্রচুর ভাবতীয়কে গোমস্তা বা নায়েব করে কিনে নিয়েছিল।

রবার্টস জিগ্যেস কবলো, "ইংরেজদের তোমাব কেমন লাগে ?"

আমি বললাম, "এই প্রশ্নের জবাব দেয়া শক্ত। ইংলণ্ডে থাকার প্রথম একবছর চটপট মতামত দিতাম—তখন ওপর ওপব জানতাম, মিশিনি, বুঝিনি। এত বছর থাকার পর বুঝি ব্যাপাবটা সহজ নয়। ব্যক্তি হিসাবে সববকম ইংবেজই তুমি পাবে। বর্ণ বিদ্বেষী, বদ, অহংকারী, উদ্ধত ইংবেজ যেমন আছে, তেমনই উদার, সৎ, ভালোমানুষ ইংরেজও প্রচুর। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে বহু খারাপ এবং বহু ভালো অভিজ্ঞতা জমানো। আমি তাই ব্যক্তি ধরে বলি না—আফ্রিকান, ইউরোপীয়, ভারতীয় সকলের মধ্যেই সবরকম মানুষই আছে। সমস্ত ব্যবস্থার সামাজিক কাঠামোর—যাকে অস্বীকার করে অল্প মানুষই জীবন চালাতে পারে।"

রবার্টস হঠাৎ প্রশ্ন করে, "তুমি কোন ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছো ?"

একটু হকচকিয়ে বলি, "না।" তারপর হেসে বলি, "আমার বউ প্রথম দিন থেকেই আমার সঙ্গে। তবে মহিলা বন্ধু অনেকেই আছে। কেন ?"

রবার্টস কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, "ওখানে পড়তে গিয়ে ওটাই আমার অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ মেয়ে বন্ধু করতে হবে, ওদের সঙ্গে ঘুরতে হবে, ওদের কারোকে বিয়ে করতে হবে। আমি ওখানকার নাচ জানতাম না, কয়েক মাস ধরে তাই·লেশন নিলাম, ভালো নাচ শিখলাম। তারপর থেকে নিয়মিত নাচের হলে যাই, মেয়ে পাকড়ে নাচবার চেষ্টা করি। নাচ কিছুক্ষণ হলে ভাবটা ঘন করতে চাই, আবার ডেট করি। সেটাই হয়ে দাঁড়ালো সব কিছু। এক সময় পড়াশুনো ডকে উঠলো। মন কিছুতে বসাতে পারি না। ভেবেও ছিলাম

দূর ছাই করে দেশে চলে আসবো। মেয়েগুলোর সঙ্গে ভাব হয়, তারপর আবার ওরা প্রজাপতির মতো উড়ে যায়। ওরা নাচবে, ডিনার খাবে, চুমু খাবে—কিন্তু ব্যাস, আর এগোবে না। আমারও রোখ চাপলো। রোখ বা জেদ থাকলে সহজ হওয়া যায় না, মেয়েরা আমার ভাবসাব দেখে আগে যা ভাব করতো তারপর আর তা-ও করতো না। তখনই ভেবেছিলাম, আর না, পড়াশুনো, প্রেম দুটোর একটাও হবে না—ধুস দেশে ফিরে যাই।"

তারপর আমার দিকে একটু হেসে বললো, "তুমি হয়তো অবাক হচ্ছো, এসব আমি তোমায় বলছি কেন ? আমার ভালোবাসা জমলো কিনা তাতে তোমার কি ? বা পৃথিবীর কি ? হয়তো ভাবছো একটু বেশী খেয়ে ফেলেছি। সেটা একদম ঠিক না। এখনও আরও কয়েক গ্লাস খেতে পারি। কথা হয়তো আমার একটু জড়িয়ে যাবে, কিন্তু জেনে রেখো, জ্ঞান আমার টনটনে আছে।"

আর এক বোতল এলো, নিজের আর এনোর গ্লাসে ঢেলে আমার গ্লাসে ঢালতে গিয়ে 'ও' বলে সরিয়ে নিলো, টম্যাটো জুস অর্ডার দিল। ততক্ষণে বারে আমরা ছাড়া কেউ নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। ক্যাম্পাসের অধিকাংশ বাড়ীতেই আলো জ্বলছে না আর।

রবার্টস বলে চলে, "আমি তোমায় বলছি, কেননা ঘটনাটা আমার হলেও, কারণটা বা অভিজ্ঞতাটা বলতে পারো অনেক বেশী ইউনিভার্সাল। তাছাড়া এখন বলছি সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, গবেষক হিসাবে। আমার কাছেও এখন আমি যেন একটা কেস স্টাডি। সমাজ বিজ্ঞানী আমি জিগ্যেস করি, আচ্ছা, রবার্টসের এরকম অবসেশন হলো কেন ? ঘটনাটা যে আমাকে নিয়ে সেটা বলতে পারো একটা এ্যাক্সিডেন্ট। আমি জানতে চাই, এর সাধারণ সূত্র কি ?"

"পরে ভেবে দেখলাম, কারণ দুটো। সবচেয়ে বড় হলো আমার হীনমন্যতাবোধ। ছোটবেলায় পাদ্রীদের কাছে পড়েছি, পরে এই বিশ্ববিদ্যালযেই ইংরেজ মাষ্টারদের কাছে পড়েছি। বুঝে গেছি ইংরাজীর মতো ভাষা হয় না, ইংরেজের মতো জাত হয না। ইবাদানে থাকতেই এই গরমে থ্রি-পিস স্যুট পরি, বাটন হোলে গোলাপ ফুল লাগাই, ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে চেন দেয়া ঘড়ি বের করে সময় দেখি, নেভিল চেম্বারলেনের মতো ছাতা হাতে ঘুরিয়ে চলি।

"দু নম্বর ওদেশে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা, যা ওই হীনমন্যতাবোধকে বাড়িয়ে দিলো। নাচের পর মেয়েটা আমাকে জিগ্যেস করে—তোমাদের বাড়ীতে তো বিদ্যুৎ ছিল না, সাওয়ার ছিল না, সিংক ছিলো না—এসব শিখতে নিশ্চয়ই তোমার খুব কষ্ট হয়েছে ? কেউ এসে জানতে চায়, পোষাক তৈরীর চামড়া কি করে যোগাড় করি, কেননা আমরা যখন আফ্রিকান তখন নিশ্চয়ই চামড়াই পরবো। যারা একটু বেশী জানে তারা নাইজিরিয়ার সঙ্গে আলজিরিয়া, লাইবেরিয়া সব গুলিয়ে ফেলবে। কোন কোন মেয়ে জিগ্যেস করে, আমি কোন সিংহ মেরেছি কিনা, কটা সিংহ মারবার পর আমার বয়ঃসন্ধির উৎসব হয়েছে। সকলের কাছেই আফ্রিকা একটা গোটা জিনিষ। নাইজিরিয়া যে তারই মধ্যে এক মস্তবড দেশ, সেটা বোঝানোই সমস্যা হয়ে উঠলো।"

"এইসব কথা যদি একবার দুবার হয়, ভুলে থাকা যায। কিন্তু রোজই শুনতাম। যারা বলতো তারা যে খারাপ লোক সে কথা বলবো না। কিন্তু আফ্রিকা নিয়ে গল্প, ফিল্ম, নানা কথা এমনভাবে মানুষের মনে দাগ কেটে রয়েছে যে পাল্টানো শক্ত। তাছাড়া খারাপ, সত্যি সত্যি বর্ণবিদ্বেষী মানুষও কম না। ওরা সুযোগ পেলেই এমন কিছু বলবে যা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে যাবে। একজন একবার রেস্টুরেন্টে জিগ্যেস করলো, তুমি কি পছন্দ করো—পর্ক, বীফ, চীকেন না হিউম্যান মিট ?"

"এসব তবু সহ্য করা যায়। যারা অজ্ঞ, তারা ইংরেজ হলেও ক্ষমার পাত্র। কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা ! দু বছর পি-এইচ-ডি করবার পরও কাজ শেষ হলো না, কিন্তু টাকা, স্কলারশিপ আর

নেই। চাকরীর দরকার। আমার সুপারভাইজার খুব ভালো—যেখানে চাকরীর জন্য লিখি সেখানেই ভালো সুপারিশ পাঠান। কিন্তু চাকরী পাই না। অনেক সময় হয়তো আমার সি-ভি ভালো করে না দেখেই ইণ্টারভিউতে ডেকেছে, খৃষ্টান নাম, পি-এইচ-ডি ছাত্র দেখেই। হয়তো ভাবেই নি আমার রক্ত কি। আমার ডাক পড়তে দরজা ঠেলে ঢুকতেই আমাকে দেখে ওদের মুখের ভাবের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি তার জন্য কোনো ভাষা লাগে না। বলা বাহুল্য, চাকরী হয় নি। অনেক সময় ভেবেছি দেশেও ফিরবো না, টেমস নদীর জলই ভালো—কিন্তু আত্মহত্যার সাহস আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত জেনী আমায় বাঁচালো।"

বুঝলাম ওর স্ত্রীর কথা বলছে।

"কাজ নিলাম লায়ন্‌স কর্ণারে। রেস্টুরেণ্ট—সমস্ত বৃটেন ছড়িয়ে ওদেব শাখা। তখনও কেনটাকী ফ্রায়েড চীকেন ম্যাকডোনাল্ড, ইউমপি এসব হয় নি। লায়ন্‌স বা ফোরটিসই ছিল মূল খাবার দোকান। পিকাডিলী সার্কাসের কাছে—কাউণ্টার থেকে খাবার দেবার কাজ। ঘণ্টা পিছু সামান্য মাইনা, খাওয়া ফ্রি—কিন্তু কোনমতে চলে যায়। জেনী আইরিশ, সর্টহ্যাণ্ড শিখছে, এবং আমার মতো ওখানেই কাজ করে—ডিশ ধোয়, মোছে, সাজিয়ে রাখে। জেনীর সঙ্গে ভাব হলো। ওকে নাচে নিয়ে গেলাম, ওকে নিয়ে ঘুরলাম, ও প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল না, সিংহ-হায়নার কথা সেভাবে জিগ্যেস করলো না। মোট কথা ও আমাকে একটা মানুষের সম্মান দিলো—যে সম্মান আর কেউ দেয় নি। আব এক বোতল চলবে!"

এনো বলে, "না। আজ পাততাড়ি গোটাও। কাল কথা হবে। অনেক রাত হয়েছে।"

রবার্টস বললো, "প্লিজ।" গ্লাস ভরলো, গ্লাসে-গ্লাসে টুং টাং 'চিয়ার্স' হলো।

আমি জিগ্যেস করি, "জেনীর সম্মান দেয়াটাই কেন তোমার কাছে বড় হলো! আফ্রিকান মেয়েরা কি ছিলো না? তারা কি তোমাকে চায় নি, তাদের কাছে কি সম্মানের কোন ঘাটতি ছিল?"

রবার্টস হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললো, "গুড কোয়েশ্চেন, সেটাই তো আসল কথা। ইংরেজরা যতো আমাকে দলেছে, নাক কুঁচকেছে, পিঠ চাপড়েছে, অবজ্ঞা করেছে, অসম্মান করেছে, ততো বেশী করে আমি ওদের কাছেই স্বীকৃতি চেয়েছি। যেন ওরা না আমাকে সম্মান দিলে আমি মানুষ নই। আফ্রিকানরা আমায় কি ভাবলো না ভাবলো তাতে এসে যায় নি। ওরাই ছিলো আমার সমস্ত মন জুড়ে।"

এনো বললো, "তার মানে তুমি জেনীকে ভালোবাসনি। ভালোবেসেছো একটা বৃটিশ মেয়ে বা একটা ইংরাজ মেয়ের আইরিশ প্রক্সি।"

রবার্টস এনোর কাঁধে চাপড় দিয়ে বলে, "হিয়ার হিয়ার। এর থেকে ভালো করে আমার কথাটা কেউ বলতে পারতো না।" তারপর গম্ভীর হয়ে বললো," তবে জেনীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জেনী যেদিন থেকে আমার জীবনে এলো সেদিন থেকে সুস্থির হলাম, মন আর ঘুরঘুর করলো না। আর দেড় বছরের মধ্যে পি-এইচ-ডি হয়ে গেল জেনীর সান্নিধ্যে।"

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "যত দিন যাচ্ছে জেনী একটা টিপিক্যাল হাউস-ওয়াইফ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওর সংসার, বাচ্চারা, ফার্নিচার, পারফিউম, পার্টি, ফ্লাওয়ার-শো, ডগ-শো, এই করেই ওর চলে। করতে চাইলে এখানেও এইসব বেশ চুটিয়েই করা যায়। কিন্তু…"

রবার্টস এক চুমুক দিয়ে গ্লাস শেষ করে বললো, "বড্ড ভাল। মাথায় কিছু নেই। আলোচনার বা তর্ক করবার উপায় নেই। চল বাড়ী যাই।"

॥ চার ॥

নাইজিরিয়ায় যতদিন থাকলাম, এনো আমার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকল। আমি ওকে বলি, "যাও ক্লাশ করো", বা "বউয়ের কাছে যাও," ও কিছুতে শুনবে না। ও ছুটি নিয়েছে। আমি এখন ওর নিজের দেশে, আর কোনো কাজ ওর থাকতে পারে না।

আমরা ফ্যাকাল্টি ক্লাবে খাই, নানাজনেব বাড়িতে খাই। কিন্তু নাইজিরিয়ান খাবার পাই না। এনোকে বলি, "আর ইউরোপীয় খাওয়া মুখে রুচছে না, তোমাদের খাওযা খাবো।" ও কিছুতে রাস্তার কোনো দোকানে নিয়ে যাবে না। বলে, "ওই খাবার তোমাদের ভালো লাগবে না, তোমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হবে।" শুনে হাসি। কলকাতার হাইড্রেন্টের জল ছোটবেলা যাব মুখে গিয়েছে, এবং যে তারপরও বেঁচে রয়েছে, পৃথিবীর কোন দেশের কোন জীবাণু তাকে ধ্বংস করবে!

একদিন আমি আব আরতি এনোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। এবং বাস্তার ধারে ভালো গোছের এক রেস্তোরাঁ দেখে সোজা ঢুকলাম। এনো তার অলিম্পিক-গতি নিযে ছুটে এসে বাধা দেবার আগেই সিটে জাঁকিয়ে বসে মেনু কার্ড দেখছি।

সেদিন সবচেয়ে ভালো খেলাম। খুব পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁ নয়। কিন্তু একটু ধুলো না মিশলে রান্না ভালো হয় না। কলকাতার এক মেসবাড়ির ঠাকুবের বান্নাঘব ছিল দ্রৌপদীব ভাণ্ডার। যত মানুষই হোক, ঝোলভাত পাবেই। মাথা গুণে ঠাকুর তার কাঁধেব গামছা কলের জলে ধোবে, তারপর নিংড়ে সেই জল সদ্য তৈরি ঝোলে প্রয়োজনমতো যোগ করবে। ঘাম, ধুলো, হাতে মাখানো হলুদ মিশে সেই জলসহ ঝোলের স্বাদ যেন আরো বাড়ত।

ইবাদানের ওই দোকানে খেলাম ভাতসহ কাসাভা, ইয়াম এবং প্লানটেইন। প্লানটেইন হল কলার মতো, তবে পাকা খায় না। বরং চিনি, নারকেলের জল মিশিয়ে ভাজা করে বা ঝোল করে খায়। ইয়াম যেন মিষ্টি আলু। কাসাভাও আলুর মতো। এই দুটো হয় মাটির তলায়—এবং জল ঠিক মতো না পেলেও বাঁচতে পারে।

ইবাদান থেকে লেগোস মাত্র একশো মাইল। কিন্তু আমার হিশেবে আরও অনেক অনেক বেশি হতে পারত। ইবাদান যেন বড় গোছের গ্রাম ছাড়া কিছু নয়। লেগোস সেখানে সত্যি সত্যিই এক মহানগরী। অথচ তফাৎটা লোকসংখ্যায় নয়। কেননা লোকসংখ্যা প্রায় একই হবে। হয়তো ইবাদানে একটু বেশিই। কিন্তু লেগোসে মেট্রোপোলিসের যে মেজাজ পাই তার কণামাত্র ইবাদানে নেই।

রাত্রে ওখানে পৌঁছে ছিলাম মূল শহরের বাইরে, এক হোটেলে। পরদিন বেশ কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। তারিখ, সময় সমস্তই চিঠি লিখে ঠিক করা। ধারণা ছিল, যেমন ইউরোপে করা সম্ভব, গাড়ি করে বেরুব, একটার পর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষ করব, রাত্রে হোটেলে ফিরব।

কিন্তু এই পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনায় লেগোসের রাস্তাঘাট পরিবহন ইত্যাদির কথা ভাবি নি। পরিবহণ সমস্যা বললেই ভারতীয়রা ভাবে কলকাতার কথা। আমি লেগোস দেখবার পর আর কলকতার নামও মুখে আনি না। শেষ অবধি আমার প্রোগ্রামের এক-তৃতীয়াংশও কার্যকর হল না।

হোটেল থেকে লেগোস দ্বীপের দূরত্ব বোধহয় মাইল পাঁচেক। আমার দু ঘণ্টা লাগল সেইখানে পৌঁছতে। রাস্তা ভালো, আধুনিক ব্যবস্থা, ফ্লাইওভার রয়েছে, সব ঠিক। তবু পুরো দু ঘণ্টা। চারপাশে গিজগিজ করছে গাড়ি। গাড়ির গ্যাস নাকে আসে। নানারকম হর্ণের আওয়াজ, মানুষের চিৎকার। রিকশার টুংটাং না থাকলেও, তারকেশ্বর যাত্রীর ভোলে বাবা নামোচ্চারণ না হলেও, সোরগোলটা বেশ। তারপর রয়েছে ভ্যাপসা গরম। ঘামে গা ভিজে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার খানিকটা বৃষ্টি হল, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় জল জমল। মনে মনে ভাবলাম, আর কী চাই? এখানকার পীচের রাস্তার খোঁদলে, জমা জলে, যানজটের হুল্লোড়ে পরিচিত স্বাদ।

আজকের লেগোস নাইজিরিয়ার রাজধানী, আটলান্টিকের উপকূলে। এত মানুষ। রাজধানী বলতে যা যা থাকে সবকিছুই আছে। কিন্তু এই শহরের যারা প্রথম মানুষ তারা ছিল ভীত, সন্ত্রস্ত কিছু লোক, যারা পাশের রাজা ডাহোমির লোকদের অত্যাচারে ছুটে পালিয়ে এখানে এসে উঠেছিল। তখন ছিল জনমানবশূন্য দ্বীপ। একদিকে আটলান্টিক, অন্য পাশে এক মস্ত বড় লেগুন। অসংখ্য পাম আর নারকেল গাছে ঢাকা জঙ্গল, জলা দ্বীপের এই অনাদৃত জায়গায় ওরা ধরে নিয়েছিল কেউ ওদের পিছনে লাগবে না।

লেগোস, ইকোই, ভিক্টোরিয়া—তিনটি দ্বীপ পাশাপাশি সাজানো। লেগোস প্রশাসনের মূল কেন্দ্র, বাকি দুটো দ্বীপে থাকে আজকের নব্য ধনীরা। সেখানে অসংখ্য ভিলা, সবুজ লন, লনের চারপাশে সুন্দর করে কাটা হেজ। লেগুনের পটভূমিকায় দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একবার পৌঁছলে এখানে, সত্যিই খুব ভালো লাগে।

কিন্তু পৌঁছনোটাই এত সংকটজনক, অন্তত সময়সাপেক্ষ। কারণ ওই দ্বীপমালা আর মূল ভূখণ্ডের মধ্যে মাত্র দুটি ব্রিজ—কার্টার ব্রিজ আর ইকো ব্রিজ। সেই দুটো রাস্তা ধরেই দুটো বড় এক্সপ্রেসওয়ে। সব কিছু যানবাহন চলবে শুধু এই দুটো রাস্তা ধরে। কলকাতায় যেমন হাওড়া ব্রিজকে ঘিরে এক বড় যানজট। ১৯০৯ সালে ওই দুই ব্রিজ তৈরি হল, যা না হলে হয়তো লেগোস এত বাড়ত না। কিন্তু মানুষ ব্রিজের ওপারেও জমি নিয়ে বসেছে। আজকের শহর শুধু লেগোস দ্বীপ নয়। সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের এক বড় অংশ। প্রচুর মানুষ সকালবেলা অফিস করতে এবং অন্য নানা দরকারে ব্রিজ পেরিয়ে লেগোস দ্বীপে আসতে চায়, এবং বিকেলে একই সময়ে ব্রিজ পার হয়ে ঘরে ফেরে। যানজট না হয়ে উপায় কী?

লেগোস বললেই তাই শিউরে উঠি, কল্পনা করি সমস্ত ব্রিজ আর রাস্তা গাড়িতে গাড়িতে ভর্তি। এবং সবকিছু স্থির, নিষ্কম্প প্রাণহীন। কারো এক ইঞ্চি নড়বার জায়গা নেই। কেউ জানে না কখন এই জট খুলবে। বারবার ঘড়ি দেখছি, মন অস্থির। তারপর একটা সময় দার্শনিক ভাব নিয়ে ভেবেছি—কী করা যাবে? যা হবার হবে।

এই সমস্যার একটা বড় কারণ গাড়ি। এখানে রিকশা বা ঠেলা সমস্যা নয়। ইঞ্জিনে চালানো দ্রুত গাড়ির সংখ্যাই প্রচুর এবং দারুণভাবে বাড়ছে। বাস তো রয়েছে, তার সঙ্গে দু ধরনের মিনিবাস যার নামগুলো অদ্ভুত। এক ধরনের মিনিবাসের নাম—"কিয়া কিয়া', মানে 'জলদি জলদি', আরেক ধরনের মিনিবাসের নাম 'বোলেকাজা', মানে 'নেমে এসো, লড়ে যাও'—যারা সত্যি সত্যিই মারমুখী এবং কোনো নিয়ম মানে না। তারপর প্রাইভেট গাড়ি।

লানরে ফাপোহুণ্ডা লেগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ও বলল, "১৯৬০ সালেও মাত্র আট

হাজার গাড়ি ছিল লেগোসে। এখন, চোদ্দ বছরে, পাঁচগুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৪২,০০০। যাতায়াতের এই যে সমস্যা তার এক বড় কারণ এই গাড়ি।"

এনোকে বলি, "তাহলে তো তোমার পোয়াবারো। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করে কী হবে ? লেগোসে গ্যারাজ খোল। গাড়ি সারাও, সারাতে গিয়ে ভাঙো, ভেঙে আবার সারাও। কতো সুযোগ ভেবে দেখেছ ?"

এনো মুচকি মুচকি হাসে।

কার্টার ব্রিজের পাশে দাঁড়ালে চোখে পড়ে সেই বিপুল গাড়ির স্রোত। কত রকম ডিজাইন আর রং। কত রকম কারিকুরি। মার্কিনী গাড়িগুলো যেন জাহাজ, কোনো গাড়িতে আবার প্লেনের আভাস। ছোট গাড়ি, যেমন ভক্সওয়াগেন, ফিয়াট চোখেই পড়ে না। অন্তত ১৯৭৪ সালে ওই রকম ছিল।

"আমাদেব সংস্কৃতিটা এখন মার্কিনী ধাঁচের হযে উঠছে," লানবে বলে, "স্বাধীনতা মানে আমেরিকায় পড়তে যাও, ফিরে এসে ওদের মতো মাইনা নাও, থাকো। আগে ছিল বৃটিশবা, এখন স্বাধীন হযে আমরা সব আমেবিকান হযে গিয়েছি। সেই ধ্যানধাবণাটা তাই গাড়ির ডিজাইনেও দেখবে।"

১৯৬৯ সালে আমি প্রথম নিউইয়র্ক যাই। মনে আছে, ওখানেও একই প্রশ্ন কবেছিলাম, "সবই এত বড় বড় ঢেউ খেলানো গাড়ি কেন ? ছোট গাড়ি নেই ?"

আমার বন্ধু বললেন, "আছে, তবে যাবা ছোট গাডিতে চড়ে লোকে ধবে নেয তাদেব বৌয়েব সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে। বড গাডিটা বউকে দিযেছে। বউকে ভরণপোষণ করে, নতুন গার্লফ্রেণ্ডদের খাইয়ে ওর হাতে বড় গাড়ি কেনবাব টাকা নেই। না হলে ছোট গাড়ি কেউ কিনবে কেন ?"

১৯৭৪ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য ওই দেমাক ভেঙেছে। এখন তেলের দাম যথেষ্ট, তাই ছোট গাড়ির কদর বেশি। আমি এরপর কখনো নাইজিরিযা যাই নি—তাই বলতে পারব না ওখানে এখন অবস্থা কী।

লানরে আর এনো আমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুবে লেগোস দ্বীপ দেখাল। উত্তর ভাগে দেখবার মতো হল 'ওবা'র প্রাসাদ। 'ওবা' ওদের পুরনো রাজা। তবে সেই প্রাসাদ দেখবার মতো কিছু না। প্রাসাদের পাশেই ইবুটে এরো বাজার—গমগম কবছে। এর চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট সংকীর্ণ রাস্তা, ফুটপাত, বস্তি, জবাজীর্ণ বাড়ি। যেন কলকাতার বাগবাজার বা বড়বাজার অঞ্চল।

আর দেখার আছে মেরিনা—সমুদ্রের ধার ঘেঁষে পশ্চিমে। ঠিক সমুদ্র নয়, লেগুন। ওপাশে সবুজ। তবে কার্টার ব্রিজের গাড়ির ভিড়, ধোঁয়া আর ভ্যাপসা গরমের পর মেরিনায় হেঁটে বেড়াতে খুবই ভালো লাগে। লেগোস বিশ্ববিদ্যালয় মূল ভূখণ্ডে, কিন্তু লেগোস লেগুনের ঠিক ওপরে—সেখানেও লেগুনের নীল জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মন শীতল হয়। মেরিনার আশেপাশেই বড় বড় নানা সরকাবি অফিস।

লেগোস দ্বীপের পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর, একটু পশ্চিম ঘেঁষে, ব্রড স্ট্রিট। আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গি রোড। দ্বীপের মূল রাস্তা। আমি যখন গেলাম তখন ওই রাস্তার নাম ইয়াকুবু গাওয়ান স্ট্রিট—তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের নামে। পরে গাওয়ানের নৌকো যখন ওল্টালো, তখন রাস্তা আবার পুরনো নামে ফিরে গেল।

এনো বলে, "আজকের লেগোস ফুলে ঢোল হয়েছে। এত মানুষ, গাড়ী, হইচই। কিন্তু এ সবই অল্পদিনের। বলতে পারো ষাট সত্তর বছরের ব্যাপার। বেশীর ভাগটা বেড়েছে আরো

সম্প্রতি, গৃহযুদ্ধের সময়। কিন্তু প্রথম কারণটা হলো," বলে আমার দিকে মুচকি হেসে বলে, "পাম তেল।"

এনোর হাসবার কারণ পাম তেল ওর পি-এইচ-ডি থিসিস, যা নিয়ে দীর্ঘ দিন আমাদের মধ্যে টেনশন থেকেছে। এনোর যুক্তি প্রয়োগ বা তথ্য পরিবেশন নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ওর থিসিস পড়তে গিয়েই নাইজিরিয়া আর পাম তেল সম্বন্ধে আমার প্রথম বিশদ জ্ঞান।

পাম কথাটার অবশ্য অনেক কিছু মানে। নারকেল গাছ বা তালগাছও পাম গাছ। সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকাতেই সমুদ্রের উপকূলে নারকেল গাছ হয়—নারকেলের সাদা খাবার শুকিয়ে 'কোপরা' তৈরী করে বিক্রী ছিল দীর্ঘ দিন নাইজিরিয়ার বহির্বাণিজ্যের আয়ের এক বড় সূত্র। কিন্তু পাম তেলের গাছ হচ্ছে সেই জাত যার তেল দিয়ে সাবান তৈরী হয়। 'পাম-অলিভ' সাবান পরিচিত নাম, যা দু ধরণের জৈবিক তেল দিয়ে তৈবী।

ঔপনিবেশিক যুগে পাম তেল তৈরীই হয়ে দাঁড়ালো বৃটিশদের এক বড় আয়ের সূত্র। ১৮৮০র দশকে প্রথম বৃটিশ কোম্পানী—রয়াল নাইজার কোম্পানীই হয়ে দাঁড়ালো দেশের মালিক, আমাদের দেশের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো—যাদের জিম্মায় দেশটা ছিল ১৮৯৬ সাল অবধি। সেই কোম্পানী পরে নাম পাল্টে হলো ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানী, তারপর সাবানের কোম্পানী 'ইউনিলিভার' ওদের কিনে নিলো। দক্ষিণ নাইজিরিয়ার উপকূলের জঙ্গল হয়ে দাঁড়ালো ওদের পাম তেলের বাগিচা। সেই তেলেব এক বড় অংশ লেগোস হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পৌঁছলো।

আফ্রিকান চাষী পাম তেল তৈরি করে। কিন্তু কেনে এই বড় কোম্পানিরা। চাষীদের এরা সেইটুকু দেয় যা না দিলে চাষী উৎপাদনে যাবে না। পুরো লাভটা পায় ওরা। ইউনিলিভার ফুলেফেঁপে ঢোল হল, চাষীর অবস্থা পাল্টাল না। বরং ইউরোপীয ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো গণ্ডগোল হলে ওরা ঝপাং করে দাম ফেলে দেয়—চাষী টাকা পায় না। এইভাবেই চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং অর্থনৈতিক শোষণ থেকেছে—কিন্তু গ্রামের সনাতনী সমাজকে বৃটিশরা ঘাঁটাতে চায় নি। বৃটিশরা দখল নেবার আগে জমির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। বৃটিশরা সেই ব্যবস্থা পাল্টায় নি। কেনিয়ার মতো বৃটিশ চাষী এখানে অনেকখানি অঞ্চল দখল করে চাষ করে নি। বরং ভারতের কায়দায়, কোথাও কোথাও পাম তেলের বাগিচা করলেও, মোটামুটি আফ্রিকার চাষীর হাতেই উৎপাদন রেখেছে। ওদের নিয়ন্ত্রণ থেকেছে ওই উৎপাদন বিক্রির সময়, রপ্তানির বাজারে এবং জিনিসের দামে। তাই, যেটুকু না পাল্টালে ওদের চলবে না সেটুকু বাদ দিয়ে ওরা সনাতনী গ্রামীণ সমাজ পাল্টাতে চায় নি। ওরা চেয়েছে গ্রাম পশ্চাদপদ থাক, এবং মোড়লেরা শক্তিশালী হোক।

তবু গ্রামীণ সমাজেও প্রভাব না পড়ে পারে নি। সামাজিক মালিকানা আনুষ্ঠানিকভাবে থাকলেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কমেছে, ব্যক্তিগত অধিকার বেড়েছে। চাষী মারা গেলে তার ভাগনে—মাতৃতান্ত্রিক প্রথায়—চাষ করেছে, মোড়ল সেই জমি পুরনো নিয়মে নতুন করে বণ্টন করে নি। এবং টাকা ও বাণিজ্য দারুণভাবে ঢুকেছে। যে চাষী বপ্তানির জন্য পাম তেল তৈরি করে সে কখনো সনাতনী সামাজিক কাঠামো বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

সেই আলোচনা আর বাড়াবো না। যাদের আগ্রহ তারা ডঃ এনো উসুরুর বই পড়ে নেবেন। কিন্তু এইটুকু বলা যায় যে লেগোসের কলেবর বৃদ্ধি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়—পাম তেল, নারকেল, এবং আরও দশটা কৃষিপণ্যের একটা বড় ভূমিকা থেকেছে। তারও আগে বড় কারণ ছিল দাসব্যবসা। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের অন্যান্য বড় শহরের মতো লেগোসও ছিল ওই

ব্যবসার এক বড় ঘাঁটি। তারপর রাজধানী হবার একটা সুবিধা তো আছেই। ব্রিজ পেরিয়ে লেগোস মূল ভূখণ্ডে ঢুকেছে—এবং বেড়েই চলেছে।

ভিত্তিটা পাম তেল আর কোপরা হলেও লেগোসের সমাজ জীবন আর গ্রামের সমাজ এক নয়।

"গ্রামের সমাজে আগে সঞ্চয়ের বিশেষ সুযোগ ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না।" লানরে বলে, "টাকা জমিয়ে লাভ কি বলো ? খরচ করবে কিসে ? আগে তো আর শহরের কারখানার জিনিসে গ্রাম ছেয়ে যায় নি। এই অঞ্চলেব মাটি ভালো, খরা হয় না, ফলন ভালোই পাওয়া যায়। জঙ্গলই এক বড় সম্পদ। এক উত্তর নাইজিরিয়ার ফুলানিরা বাদ দিলে বাদবাকিরা ছিল মূলতঃ চাষী, দক্ষিণে তো বটেই। জমিও প্রচুর। যা দরকার সবই ছিল। তাই, একেবারে ওপর তলার সামন্ত রাজাদের বাদ দিলে মানুষে মানুষে পোষাকে বা চালচলনে জীবন-যাত্রায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কারো যদি হাতে টাকা জমতো সে বড় ভোজ দিতো—সেখানে গ্রামেব সবাই আসতো। সেটাই ছিল সামাজিক নিযম।"

লানরে রাস্তায় ধাবমান গাড়ীর স্রোতের দিকে তাকায়। তারপর বলে, "এখানে এখন গাডীই এক বিরাট ব্যাপার। গাড়ী না থাকলে তুমি কিছুই না, তোমার সামাজিক কোন মূল্য নেই। গাড়ী হচ্ছে স্টেটাস সিম্বল। তোমাকে বুঝবার আগে লোকে দেখবে তোমাব গাডী। যতো বড় তোমার গাড়ী ততো বড় তোমার সম্মান। তুমি যদি ব্যবসায়ী হও, লোকে তোমার গাড়ী দেখে চুক্তি করবে, জিনিস কিনবে। তোমাব গার্লফ্রেণ্ডেব কাছেও প্রথম কথা তোমাব গাড়ী তাবপর তোমার হৃদয়। আমাদের এখানে বৈরাগীব কোন কদব নেই। গাডীই ধর্ম। আর কিছু না পারলেও দূতাবাসেব বা তেলের কোম্পানীব কর্মচাবীদেব চলে যাবাব সময বিক্রী করা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী কেনো। গাডী চাইই।"

এনো বলে, "লেগোসের সমাজ বিষাক্ত। এই যে দেখছ ইকোই দ্বীপের সুন্দব সুন্দর ভিলা—এর সবের পেছনেই রযেছে দুর্নীতি। এখানকার মানুষ টাকা ছাড়া বোঝে না। কেউ জানতেও চাইবে না টাকা তুমি কি কবে পেলে। মোট কথা টাকা চাই, বড বাড়ি চাই, গাডি চাই।"

সেই দুর্নীতির শুরু ১৯৬০ সালে স্বাধীন নাইজিরিয়াব জন্মলগ্ন থেকে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী আলহাজি আবুবকর তাফাওয়া বালেওযা। উত্তরেব অঞ্চলের মানুষ, মুসলমান। রাষ্ট্রপতি আজিওএ পূর্বাঞ্চলে, খ্রীস্টান। কিন্তু লোকে বলত, আসল নেতা হল উত্তরের শহব সকোটোর 'সারাদুনা' মানে প্রাক্তন রাজা—স্যার আহমেদো বেলো। এখন সারাদুনার নামে উত্তর নাইজিরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই হল আহমেদো বেলো বিশ্ববিদ্যালয।

সরকারে যাওয়া মানেই টাকা। কাজেই প্রশ্ন দাঁড়াল সরকার কে নিয়ন্ত্রণ করবে ? নানা দুর্নীতি চক্র তৈরি হল লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান সিদ্ধান্ত ভিত্তি করে।

কিন্তু ধীরে ধীরে ওই দুর্নীতির প্রতিযোগিতা এক সাম্প্রদায়িক রূপ নিল। উত্তরে মুসলমান, দক্ষিণের সংখ্যাধিক্য খ্রীস্টান। উত্তরে হাউসা-ফুলানিদের বাস। দক্ষিণ-পূর্বে ইবোরা, দক্ষিণ পশ্চিমে ইয়ুরুবারা। উত্তর-দক্ষিণ, সাভানা-উপকূল মুসলমান-খ্রীস্টান, হাউসা-ফুলানি-ইউরুবা-ইবো—এইভাবে সমস্ত দ্বন্দ্ব দাঁড়িয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

গৃহযুদ্ধের সময় লেগোস শুধু রাজধানী রইলো না—হলো যুদ্ধব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র। সামরিক শিবির বসলো। ট্রাকে, ট্যাংকে আর ইউনিফর্মে শহর ভরে গেল। বিদেশ থেকে জাহাজ ভরে অস্ত্র এলো লেগোসে, সেখান থেকে ছড়ালো রণাঙ্গনে। গৃহযুদ্ধের সাড়ে তিন বছর নাইজিরিয়ার ইতিহাসের এক অভিশাপ। কিন্তু কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। ইউরুবারা

ব্যবসা বোঝে, টাকার জন্য দিদিমাকে দুমড়ে চলে যাবে—একথা রোজের কাছে শোনা, হয়তো বেশ খানিকটা বাড়িয়ে বলে। লেগোস ইউরুবা অঞ্চলে। যুদ্ধে ভীষণভাবে লেগোস বাড়লো।

যুদ্ধের পরও সেই বৃদ্ধি বন্ধ হয় নি। বরং বৃদ্ধির হার বেড়েছে। নাইজিরিয়ায় সামরিকতন্ত্র। জেনারেল আর আমলারাই দেশটা চালায়। সত্যি সত্যিই পারমিট-কন্ট্রাক্ট রাজ—যার সিদ্ধান্ত হয় রাজধানীর এলিট ক্লাবে গলফ কোর্সে। সবাইকে তাই আসতে হয় লেগোসে।

লেগোস তাই বাড়ছে। পেট্রোলের গন্ধ, গ্যাসের ধোঁয়া আর হর্ণের চিৎকার নাকে গুঁজে মুখে চেপে লেগোস ভীষণভাবে বাড়ছে।

॥ পাঁচ ॥

ওউডুর গালে তিনটি পরিষ্কার দাগ। যেন তিনটি সমান্তরাল রেখা। ওটা হচ্ছে যাকে বলে ট্রাইবাল মার্ক। জন্ম থেকে চিহ্নিত করা, যাতে ভুল না হয়।

ওই দাগ দেখে এবং বিরাট চেহারা দেখে ভয় লাগে খানিকটা। কিন্তু যখন ওউডু সত্যি সত্যি আমাদের লণ্ডনের বাড়ির দোতলার ঘরে এসে ঢুকল, এবং আলাপ হল তখন দেখলাম মানুষটি খুবই শান্ত এবং ভালো। ওউডু কখন আসে কখন যায় জানি না, যখন বাড়িতে থাকে তখন মাথা গুঁজে পড়াশুনো করে। ওউডু ইঞ্জিনিয়ার হবে। না কথা বললে যেচে এসে কথা বলে না—শুধু রবিবার ছাড়া। ওইদিনটা সকাল দশটা নাগাদ আমার লাউঞ্জে এসে দশ রকমের গল্প করে। ওর বাড়ির গল্প, মায়ের গল্প, ভাইদের গল্প। বাড়ি থেকে চিঠি এলে দেখায়। বাড়ির জন্য ওর খুব মন খারাপ। ও প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাড়াতাড়ি পড়াশুনা চোকাতে। মাঝেমধ্যে 'ব্যাক' পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির লোক সেটা বুঝছে না। ওদের ধারণা, ওউডু বোধহয় কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর মোহে পড়েছে, তাই পড়াশুনা শেষ করে ফিরছে না।

"আপনিই বলুন, এইভাবে বলা কি ঠিক? আমি কি পড়াশুনো করছি না? আমি কি খাটছি না? আমি কি বাবা মায়েব কথা ভাবি না?" ওর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ।

"এ নিয়ে তুমি মন খারাপ কোর না।" আমি বলি, "পরীক্ষাটা শেষ করো, পাশ করো, দেশে ফেরো, তখন সমস্ত ভুল ধারণা এমনিই কেটে যাবে।"

ওউডু খুব আরাম করে আস্তে আস্তে চা খায়। মদ খায় না। ও খাঁটি মুসলমান। দিনে পাঁচবার নামাজ না পড়লেও একবার নিশ্চয়ই আল্লার নাম করবে। মাঝেমধ্যে লণ্ডনের মসজিদে যায়।

ওউডু হাউসা। নাইজিরিয়ায় হাউসারাই সংখ্যাধিক্য। হাউসারা শুধু নাইজিরিয়াতে নেই। উত্তরের 'নিজের' দেশেও ওদের সংখ্যাধিক্য আছে।

রোজ বলে, "হাউসারা ভেড়ার জাত। ওদের মালিক হল ফুলানিরা।"

রোজের কথা অবশ্য না ধরাই ভালো। ষাটের দশকের শেষ। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ চলছে। ওরা আর ওউডুরা দুটো পক্ষ। তাছাড়া রোজ এমনিই একটু বদরাগী। ওউডুর মতো ঠাণ্ডা, শান্ত মানুষকেও ও সুযোগ পেলে কথা শুনিয়ে দেয়। সিঁড়িতে উঠতে নামতে পাশাপাশি হলে রোজই কনুই দিয়ে ওকে ধাক্কা দেবে। বা বাথরুমে ওউডু গেলে দরজায় টোকা দেবে। রোজ ওকে সহ্য করতে পারে না। ওউডুও যেন ওকে একটু ভয়ই করে।

তবে ওউডুকে দেখে বোঝা শক্ত নয় যে হাউসাদের অন্যরা, বিশেষ করে ফুলানিরা, চোখ রাঙাতে পারে। তবু ওউডুরও অনুভূতি আছে। গৃহযুদ্ধ নিয়ে ও কখনো আলোচনা করে না। কিন্তু যেদিন ফেডারেল সৈন্যরা প্রথম পূর্বাঞ্চলেব বিদ্রোহী রাজ্য বিয়াফ্রায় ঢুকলো, সেদিন রাত্রে ফিরে আমাকে আর আরতিকে এক বাক্স কেক দিল। পরে যেদিন বিদ্রোহ পুরোপুরি শেষ হল, সেদিন পেলাম আর এক বাক্স কেক। কিন্তু গৃহযুদ্ধ নিয়ে একটা কথা বলল না, কোনো উল্লাস

দেখাল না। বরং রোজের ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে তড়িঘড়ি নিজের ঘরে ফিরে গেল। ওর দল যুদ্ধ জেতায় যেন ও খুব লজ্জিত।

দানবের মতো চেহারা, শিশুর মতো মন এই ওউডুই আমাদের এক চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এক বাড়িতে থাকি, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এক বড় সমস্যা, রোজ। আরতি বলে, "মেয়েরা যে এত রুক্ষ হতে পারে ভাবি নি।" রোজ সত্যিই খুব রুগ্ণ। বিশেষ করে ওউডুকে দেখলেই রণরঙ্গিনী মূর্তি নেবে। ওদের যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক, শুধু পার্থক্য এই যে ওউডুকে কখনোই সাপ বলে ভাবা যাবে না। রোজকে দেখলেই ও কিছুটা গুটিয়ে যায়—তবু রোজের আক্রমণ এড়াতে পারে না।

আমি রোজকে বলি, "তোমাদের দুই অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ—সেটা যারা করছে করুক। তুমি সেই যুদ্ধ লণ্ডনে টেনে আনছো কেন ? ওউডু কি করল ? ও তো একটা ছারপোকাও টিপে মারতে পারবে না।"

রোজ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, "এখানে ওকে দেখে ভুল করবেন না। এখানে ভিজে বিড়াল, আর নিজের দেশে হায়েনার মতো হিংস্র। ওরাই তো বিয়াফ্রার সব কিছু ধ্বংস করছে। আমাদের ঘর বাড়ি, আমাদের মেয়েদের সম্মান, কিছুই রাখছে না। কতো মানুষ যে খুন হল তার হিশেব রাখেন ?"

রোজের ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে কর্ণেল ওজুকুর ছবি। গোলগাল চেহারা, বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্তের মহানায়ক। রোজের সামনে ভুলেও ওজুকু সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলি না—জানি বললেই ও ফোঁস করে উঠবে। রোজের কাছে ওজুকু দেবতার চেয়েও বড়।

রোজ রুক্ষ। কথাবার্তায় নমনীয়তা নেই। কিন্তু প্রচণ্ড সৎ। ওর কতোগুলো নীতিবোধ আছে। নিয়মিত চার্চে যায়, নিয়ম করে বাবা-মাকে চিঠি দেয়। ছেলে বন্ধু মাইক চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যান্ট হচ্ছে—সুশ্রী, পেশীবহুল চেহারা। রোজের মতোই ইবো এবং ওজুকুর ভক্ত। রোজের আত্মসম্মানবোধই এক বিরাট সমস্যা নানা সময়। দোকানে রাস্তায় বাসে অফিসে ওকে কালো বলে কেউ তাচ্ছিল্য করলে বা অপমান করলে; সেটা ও কখনো মেনে নেবে না। হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আবার ওর কোমল নমনীয় রূপটাও যে চোখে পড়ে না এমন নয়। মাইকের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা যখন সেজেগুজে হাত ধরাধরি করে বেরোয় তখন ওর মুখে যে প্রশান্তি ও স্বর্গীয় আনন্দের আভাস দেখেছি তা তুলনাহীন। অথবা, নাইজিরিয়ার, বিশেষ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী পূর্ব অঞ্চলের, বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ওর দেশের প্রতিটি শিরা-উপশিরাকে আন্দোলিত করে। লণ্ডনে থেকেও যেন ও নেই—মনের দিক থেকে ও বিয়াফ্রায়। বিয়াফ্রা বাঁচবে কিনা, এই চিন্তাতে ওর ঘুম হয় না। যুদ্ধের শেষ পর্বে প্রতিটি পরাজয় যেন ওর হৃদয়ে এক একটা বড় শেলের মতো এসে লাগে।

বিয়াফ্রা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি ওই আলোচনায় কোন লাভ নেই। কোনো যুক্তির স্থান সেখানে নেই। আলোচনার শুরুতেই ও ধৈর্য হারাবে। বলবে, সমস্ত পৃথিবী বিরুদ্ধে গেলেও ওই যুদ্ধ চলবে। যতদিন বিয়াফ্রার একজন মানুষও বেঁচে—সে শিশুও হতে পারে—ততদিন বিয়াফ্রাও বেঁচে।

রোজের মধ্যে স্ববিরোধ প্রায়ই লক্ষ্য করি। যেমন, একদিকে প্রচণ্ড আফ্রিকান মানসিকতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজের নতুন নতুন ফ্যাশনের ঢেউতে হাবুডুবু খাবে। ওর সুন্দর ঘন কোঁকড়া চুল—সমস্ত আফ্রিকার মেয়ের মতোই। কিন্তু সেটা ওর পছন্দ নয়। তাই এখানকার সেলুনে গিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেই কোঁকড়া চুল সোজা করবে। সোজা

হয়তো হয়, কিন্তু সেই চুলে লাবণ্য থাকে না, স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। রোজের সমস্ত রকম কাজকর্মের মধ্যে এটাই আমাব সবচেয়ে আপত্তিকর মনে হয়। তারপর মিনিস্কার্ট যখন ফ্যাশন হল তখন মিনিস্য মিনি স্কার্ট এবং সোজা চুলে ওকে মোটেই মানাবে না।

রোজ লণ্ডনে সেক্রেটারি হবার ট্রেনিং নিচ্ছে। পূর্ব নাইজিরিয়ায় তেল পাওয়া গিয়েছে, বড় বড় বহুজাতিক সংগঠনে ছেয়ে গিয়েছে। তাই ভালো শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং জানে, ফাইল গুছিয়ে রাখতে পারে, চিঠি লিখতে পারে এবং চটপটে মহিলাব কদর খুব। সেক্রেটারিয়াল ট্রেনিং শেষ হবার পরও হয়তো ও লণ্ডনে কিছুদিন থাকত। ততোদিনে নাইজিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু এক বিরাট দাগা মনে নিয়ে ওকে দেশে ফিরতে হল। মাইক, ওর নিজের মাইক, বিয়াফ্রা আন্দোলনের শরিক, ওর জীবনের স্নিগ্ধতম মুহূর্তের সঙ্গী, হঠাৎ দুম করে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করে গ্লাসগো চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, ও আর নাইজিরিয়া ফিরবে না।রোজ বলল, ও আর বিয়ে করবে না, রাজনীতি করবে না। ওর জীবন পেশাদারী চাকুরে মহিলার—সেই কাজটাই ও ভালো করে কববে। বিয়াফ্রা যখন নেই, মাইক যখন নেই, আর কিইবা থাকল ওর জীবনে ?

নাইজিরিয়ায় ফিরবার দিন রোজকে খুবই বিষণ্ণ মনে হয়েছিল। এমন বিধ্বস্ত, জীর্ণ রোজকে দেখব বলে কখনো ভাবি নি। যাবার আগে পোর্ট হারকোর্টে ওর ঠিকানা দিয়ে গেল—যদি ওখানে যাই।

ওউড়ুকে নিয়ে সমস্যা অন্য রকমের। এক সময় প্রায়ই এসে বলতো এই অসুখ সেই অসুখ। একদিন রাতে চিৎকার শুনে ওর ঘরে দিয়ে দেখলাম সমস্ত বিছানায় ছড়িয়ে থাকা বিরাট দানব চেহারাটা কাৎলা মাছের মতো যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। নানা মালিশ ইত্যাদি করেও যখন কিছু হল না, তখন ওকে কোনোমতে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে গেলাম। তারপর প্রায় দু সপ্তাহ হাসপাতালে।

রোজ হাসপাতালে যাই, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করি। ডাক্তাররা নানা পরীক্ষা করে দেখছেন, কি অসুখ, কিন্তু ধরতে পারছেন না। রক্ত, থুতু, মল, মূত্র, ত্বক, প্রেশার, তাপ, নাড়ি, ব্রেন—কিছুই সেই পরীক্ষা থেকে বাদ গেল না। তবু বোঝা গেল না ব্যথার কারণটা কি।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আমাকে ডেকে আলাদা করে বললেন, "ওর কিছুই হয় নি।"

"সে কি ?" আমি অবাক হয়ে বলি, "এতো ব্যথা, এতো ছটফটানি—এসব কিছুই না ?"

"না," ডাক্তার হাসেন। তারপর বলেন, "কারণটা পুরো মনস্তাত্ত্বিক," সাইকোসোম্যাটিক। "এই সমস্ত ব্যাধিই ওর কল্পনা।" তারপর জিগ্যেস করলেন, "ওর এখানে আর কেউ আছে ?"

"না।"

"বন্ধু বান্ধব ? গার্লফ্রেণ্ড ?"

"না।"

"সিনেমায় যায় ? ফুটবল খেলা দেখতে যায় ? পার্টিতে যায় ?"

"না।"

"তাহলে ওইটাই অসুখ। ও খুব নিঃসঙ্গ। এই অসুখবিসুখ দিয়ে কিছুটা সহানুভূতি পাবার চেষ্টা। ও নিজে অবশ্য সেটা সচেতন ভাবে জানে না। ও নিশ্চয়ই খুব 'হোমসিক'। ওর এখানে ভালো লাগছে না। আপনারা বরং বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে সাভানায় ফেরৎ পাঠান। এখানকার কংক্রিটের জঙ্গলের চেয়ে ঘাসের বন অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।"

হাসপাতাল ওউড়ুকে ছেড়ে দিল, আমার ডাক্তারি শুরু হল।

ওউডুকে জিগ্যেস করলাম, "তুমি মাডাম টুসা দেখেছ ?"
"না।"
"টাওয়ার অফ লণ্ডন ?"
"না ?"
ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়াম ? সাইন্স মিউজিয়াম ? হোয়াইট হল ? ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবির ভিতরটা ?
প্রতিটি উত্তরই 'না'।
"তবে এদেশে এলে কেন ?" হাল ছেড়ে দিয়ে বলি, "তুমি তো পড়াশুনো ছাড়া কিছুই করো নি দেখছি।"
তারপর বললাম, "আজ কাল শনি-রবি, তোমার পড়াশুনো বন্ধ। চলো আমরা বেড়িয়ে আসি।"
কিছুটা আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত ওইডু রাজি হলো। গেলাম ওবার্ন পার্কে, উইণ্ডসর কাসেলে, হ্যাম্পটন কোর্টে। গ্রীষ্মের ঝলমলে রোদ্দুরে, টেমস নদীর পাশের সবুজ প্রান্তরে শুয়ে থাকা নানা রঙচঙের পোশাকের চেহারার অসংখ্য মানুষ, ছুটে বেড়ানো ফুটফুটে ছেলেরা মেয়েরা, হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ানো, কাঁধে রুকশ্যাক, গলায় ক্যামেরা ঝোলানো অসংখ্য ট্যুরিস্ট—সব মিলিয়ে খানিকটা প্রভাব ওউডুর ওপর না পড়ে পারল না। ওর চলাফেরা মেজাজে পরিবর্তন হল লক্ষ্য করবার মতো। রাত্রে শুনলাম,এই প্রথম ওউডু শীষ দিয়ে গান গাইছে।
সেই ওউডু পড়া শেষ করে একদিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরল। প্রথম দিকে কার্ড-টার্ড পাঠাল। তারপর, যেমন হয়, ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে গেল।

নাইজিরিয়ায় গিয়ে মনে পড়ল ওউডুর কথা। ও থাকে কানো শহরে—অনেক উত্তরে। এনো বলল, "ঘাসের বন পার হয়ে ৫০০ মাইল যেতে হবে। দারুণ দূর। বরং ইবাদানেই কাটাও।" এনোর ধারণায় নাইজিরিয়ায় কোথায় যাব কোথায় যাব না সেটা ওর ঠিক করার ব্যাপার।
ইবাদান থেকে ঘাসের বন ভেঙে রেলপথ ও রাস্তা। এই সাভানায় সিংহ, চিতা, হায়েনা থেকে হাতি, শিম্পাঞ্জি, নানা ধরনের হরিণ—সবকিছুই আছে। তবে কেনিয়ার ধারে কাছে আসে না। মাঝের এক বড় অঞ্চল সত্যি সত্যি দারুণ ফাঁকা—গ্রাম, মানুষ কম।গ্রামে নানারকমের বাড়ি। সনাতনী ধাঁচ হচ্ছে গোল মাটির বাড়ি, ওপরে পাতা বা ঘাসের ছাউনি। গোল ছাদ দিয়ে ছাউনি উঠে যেন উঁচু চুলের খোঁপার মতো লাগে। তবে আজকালকার ধরন হচ্ছে চৌকো বাড়ি, কোথাও করোগেটেড টিনের ছাদ।
কানো-জারিয়া-কাতুনা যেন পর পর তিনটি শহর।কাটসিনা উত্তর-পশ্চিমে,সকোটো আরও উত্তর-পশ্চিমে। এই পাঁচটি বড় শহর, কিন্তু আরও অনেক শহর আছে। এক সময় প্রতিটি শহর ছিল আলাদা রাজ্য। প্রতিটি শহরের পিছনেই অন্তত এক হাজার বছরের ইতিহাস। বাংলাদেশে যেমন মোগল আমলে ছিল বারো ভুঁইয়া ; এদের ছিল 'হাউসা-সপ্তক'। সাতটি হাউসা শহর-রাজ্য। ওদের ভাষায় 'হাউসা-বাকওয়াই'।
প্রশ্ন উঠবে, উপকূল থেকে এত দূরে, রেইন ফরেস্ট ছাড়িয়ে, অনুর্বর ঘাসের বনে কীভাবে এতো শহর তৈরী হল ? কারণটা কী ?
কারণটা সাহারার ওপারের উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য। নাইজিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে চাদ হ্রদ। সেই হ্রদ অগভীর—গ্রীষ্মকালে এক বড় অংশে জল থাকে না। কোনো

কোনো বছর জল প্রচুর মাইল নেমে যায়। চাদের উত্তরে সাহারা। লিবিয়ার ফেজান থেকে চাদ অবধি এক সময় একটা পথ ছিল। পথটার নাম ছিল—চল্লিশ দিনের রাস্তা। সাহারা পার হবার স্বল্পতম দৈর্ঘ্যের পথ, কাজেই প্রচুর উট আর মানুষ এই পথে সাহারা পার হতো। এই হ্রদকে ঘিরে একসময় গড়ে ওঠে কানেম-বোরনু রাজ্য এবং পরে সংঘেই রাজ্য। দুটোই খুব বড় এবং দুটোরই মূল ভিত্তি সাহারা পারাপারের বাণিজ্য। পরে যখন ওই দুই রাজ্য ভেঙে গেল তখন বড় হয়ে উঠল এই শহরভিত্তিক হাউসা রাজ্যগুলো।

ওই শহরগুলোর কাজই ছিল উপকূলের রেইন ফরেষ্ট থেকে কাঠ, হাতির দাঁত , পশুর চামড়া এবং আরো দশ রকমের জিনিস জোগাড় করা, তারপর উটের ক্যারাভানে করে উত্তরে পাঠানো।

উত্তর থেকেও নানা জিনিস এসেছে। ইসলাম ধর্ম এবং আরব প্রভাবও এসেছে। এবং টিম্বাক্টুর মতোই জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচর্চা ছিল ওই বড় বড় শহরকেন্দ্রিক রাজ্যগুলোর এক বড় ভিত্তি।

সাহারার উত্তরের এই আফ্রিকা তাই বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ইউরোপীয় চোখে আবিষ্কৃত হবার আগেই অন্তত আরব দুনিয়া এই পৃথিবীটা চিনত এবং এর নিয়মকানুন জানত।

বাইরের জগৎ অবশ্য অনেক সময় জানত না, ওই মাল কোত্থেকে এসেছে। যেমন কানো থেকে পাঠানো লাল চামড়া ইউরোপে প্রচলন ছিল 'মরক্কো লেদার' নামে। নাইজিরিয়ার তাঁতের কাজের সুনাম ছিল সর্বত্র—বিক্রি হতো ত্রিপোলি, টিউনিস বা অন্য উত্তর-আফ্রিকাব উপকূলের শহরের বাজারে। খাদ্য ছিল পর্যাপ্ত, কৃষি বিরাট সমস্যা ছিল না, চারপাশে প্রচুর জমি—ঝোপ পরিস্কার করে চাষ করলেই হতো। তাই কৃষির ওপর ভিত্তি করে নানা শিল্প ওখানে অতীতে গড়ে উঠেছিল। ছুতোর, চর্মশিল্পী, কর্মকার, কুমোর—এমন কোনো হাতের কাজ নেই যা ওদের জানা ছিল না। ওদের অর্থনীতি ছিল বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ—না হলে এত বড় বড় শহর এবং শহরকে ভিত্তি করে নানাধরনের কাজ ও শিল্প গড়ে উঠত না।

কানোতে ওউডু ছিল। পশ্চিম নাইজিরিয়ায় যেমন এনো, উত্তরে ওউডু হল আমার অভিভাবক। আমার যেন নিজের কোনো মতামত থাকতে পারে না।ও-ই ঠিক করবে কোথায় যাব, কোথায় থাকব। এই ওউডু অবশ্য লণ্ডনের·মাথানিচু সলজ্জ বিনীত ছাত্র নয়। নিজের দেশে ওর চেহারা অন্য, মুখে খই ফুটছে। একে হুকুম দিচ্ছে, ওকে ডাকছে। বোঝা গেল ওউডু এখানে কোনো প্রভাবশালী লোক। লণ্ডন-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়র। অনেকেই খানিকটা সম্মান দিয়ে কথা বলে।

উত্তরের সভ্যতা দীর্ঘদিনের। সে কথা আগেই বলেছি। এক সময় এই অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি নিয়ে লড়াই হয়েছে। সংঘেই বোরনু বা কাটসিনা থেকে বারবার আক্রমণ হয়েছে। সেই আক্রমণ থেকে বাঁচবার আর কোনো পথ ছিল না।

"যুদ্ধ কী নিয়ে?" জিগ্যেস করি।

"মূলত সাহারার বাণিজ্য নিয়ে। যারা এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই বণিকদের ওপর কর বসাবে। সেই ছিল মূল কারণ। তারপর জাতিগত ধর্মগত কারণও থেকেছে। উত্তর থেকে বার্বার-আরবেরা চাদ হ্রদ ধরে কয়েকবার এখানে আক্রমণ করেছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক, বৃটিশদের ঠিক আগে, ফুলানিয়া আক্রমণ।"

এই অঞ্চলে সংখ্যায় হাউসাদের পরেই হল ফুলানিরা তবে ফুলানিরা অনেক বড় অঞ্চল নিয়ে ঘোরে। পশ্চিমের আটলান্টিক থেকে পূর্বের চাদ, সেনেগাল থেকে নাইজিরিয়া এবং উত্তরে সাহারা থেকে দক্ষিণের রেইন ফরেস্ট সমস্ত অঞ্চলটায় ছড়িয়ে থাকে ফুলানিরা।

এক সময় ওরা সবাই ছিল যাযাবর। তবে তুয়ারেগদের মতো ভেড়া, ছাগল বা উট নয়, ওদের মূল পশু ছিল গরু। পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মতো সেটসী মাছির আক্রমণ এখানে নেই, তাই গরু নিয়ে নির্বিঘ্নে ঘোরা যায়। গরুই ওদের অর্থনীতির ভিত্তি, কেনিয়ার মাসাইদের মতো। ওরা মুসলমান, বার্বারদের মতো। কিন্তু গরুর মাংসের চেয়ে দুধ, মাখন ইত্যাদিই ওদের পছন্দ।

যতোদিন গিয়েছে ততো ফুলানিরা একের পর এক চাষে বসে গিয়েছে। ওদের ধর্মবোধ ছিল গভীর। সেটা ওরা উত্তরের বার্বার বা অন্য গোষ্ঠীর থেকে পেয়েছে। ওদের জাতিগত উৎস নিয়ে অবশ্য অনেক প্রশ্ন আছে। নাক বান্টুদের মতো থ্যাবড়া নয়, ঠোঁটও পুরু নয়, যা দেখে অনেকের ধারণা ওরা আসলে উত্তরের কোনো অঞ্চল থেকে সাহারার দক্ষিণে গিয়েছে। কিন্তু রং কুচকুচে কালো—সেই রঙেরও একটা সুন্দর জেল্লা আছে, আমাদের রঙেব মতো নিষ্প্রভ কালো নয়। চুলও ঘন এবং কোঁকড়া। ভাষাটা মূলত সাহারার দক্ষিণের।

অবশ্যই সাহারা-প্রান্তের কোনো জাতির পক্ষে 'খাঁটি' হওয়া সম্ভব নয়। ওরা এক বড় অঞ্চল নিয়ে থেকেছে। অনেক রক্ত মিশেছে। আরব আর বার্বার, সেমিটিক-হ্যামিটিক-বান্টু সব রকম চেহারা আর আদল তাই ওদের মধ্যে।

হাউসারা ওদের খানিকটা ভয়ই করে। কিন্তু দুশো বছর আগে ওরাই ছিল হাউসাদের প্রজা—হাউসা রাজাদের অধীনেই এই অঞ্চলে থাকত, কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ওরা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। ওদের এক ধর্মীয় নেতা 'জিহাদ' ঘোষণা করল, বলল, হাউসা রাজারা দুর্নীতিপরায়ণ, অধার্মিক—ওদের সরাতে হবে। ফুলানদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে আজকের নিজের ও উত্তর নাইজিরিয়ার পুরো অঞ্চলটা এল ওদের অধিকারে। উত্তর-পশ্চিম নাইজিরিয়ার সকোটো হল ফুলানি সাম্রাজ্যের রাজধানী বা মূল কেন্দ্র।

সেই থেকে ফুলানি আর হাউসা পাশাপাশি থেকেছে—প্রতিটি শহরেই। কিন্তু ফুলানিরা শাসন করেছে—ওরাই যেন শাসক জাতি। হাউসাবা সেটা মেনে নিয়েছে। ১৯০৬ সালে বৃটিশদের হাতে পরাজিত হবার পরও ফুলানিদের আধিপত্য এই অঞ্চলে যায় নি। ওদের সাম্রাজ্যের কাঠামো ছিল অন্য সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতোই সুলতান, আমির থেকে প্রদেশ, জেলা, অঞ্চল প্রশাসনের বিস্তাবিত ব্যবস্থা।

"শহরের ফুলানি আর আমাদের মধ্যে এখন বিয়ে-টিয়ে হয়। দুই জাতি তাই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।" ওউড় বলে। অনেকটা যেন উত্তর আফ্রিকার বার্বার আর আরবদের মতো।

এই বিবাহগত যোগসূত্রের প্রভাব ওদের চেহারায়। শহরের ফুলানিদের নাক আর ততটা খাড়া নয়, ঠোঁট একটু বেশি পুরু। সাহেল বা মরুভূমি অঞ্চলের ফুলানিদের সেটা একদম পছন্দ না। ওরা বলে, শহরের ফুলানি খাঁটি ফুলানি নয়। আসল ফুলানি তারাই যাদের কোনো ঘর নেই, মরুভূমিই যাদের ঘর, পথ হাঁটাই যাদের ব্রত।

কানো শহরে দেখবার মতো জিনিস হল ওখানকার প্রাচীর। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম তৈরি, তারপর অনেকবার ভেঙেছে এবং নতুন করে তৈরি হয়েছে। বেশ উঁচু—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ফিট পর্যন্ত। শহরের চারপাশ ঘিরে কুড়ি কিলোমিটার লম্বা।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে বাইরে থেকে আক্রমণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেয়ালের নিরাপত্তাব ভেতর ছিল বড় বড় বাজার। সেখানে আসত আরবরা, বার্বারা এবং অসংখ্য আফ্রিকান জাতি। পণ্য নিয়ে দরদাম হতো, তর্ক হতো, এবং তারপর বহু হাত ঘুরে সেই মাল দূরদুরান্তের ছড়িয়ে পড়ত। ইউরোপের এক বড় অংশ. আরব দুনিয়া, ভারত এমন কী চীনেও সেই জিনিস পৌঁছত। ওদের তৈরি চামড়া, নানারকম ধাতুর কাজ এবং কাপড়ের যথেষ্ট সুনাম ছিল। ওরা বিনিময়ে

পেতো সুগন্ধি প্রসাধন সামগ্রী, ভালো তলোয়ার, নানারকমের মশলা, সিল্কের কাপড়, এবং সাহারার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আনা লবণ, আর দক্ষিণের জঙ্গল থেকে পাওয়া 'কোলা নাট' বা বাদাম।

চার লক্ষ লোকের শহর কানো এখন এক জমজমাট জায়গা। কলেজ হাসপাতাল অফিসে ছড়াছড়ি। এক বিরাট বড় মসজিদ, শহরের মাঝখানেই। পাড়ায় পাড়ায় আরো অনেক মসজিদ।

উত্তর নাইজিরিয়ার এই প্রাচীন নগরসভ্যতা হয়তো ভূমধ্যসাগরের উপকূলের ফিনিশীয় বা রোমানদের তৈরি নগর সভ্যতার মতো পুরনো নয়। এখানকার নগর প্রাচীর নিশ্চয়ই সুবিশাল, বাঁধানো রোমান ওয়ালের ভাস্কর্যের সমতুল্য নয়। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যথেষ্ট অগ্রগতি ওখানে হয়েছিল, রাজ্য প্রশাসনের ব্যবস্থা ছিল বিস্তারিত, এবং তখনকার তুলনায় অর্থনীতি ছিল শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাই এত মানুষ এখানে এসেছে। নীল নদের অববাহিকা এবং রুয়াণ্ডা-বুরুণ্ডি ছাড়া আফ্রিকার অন্য কোনো অঞ্চলে এত মানুষ আসে নি। মানুষ হঠাৎ আসে না, তার কারণ থাকে। সেই কারণ ছিল অর্থনৈতিক প্রাচুর্য।

উত্তর নাইজিরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণের উপকূলের কোনো প্রশাসনিক সম্পর্ক ছিল না। কখনই একটা রাজ্য ছিল না। বৃটিশরা দখল নেবার পরও দীর্ঘদিন দুই অঞ্চল আলাদা থেকেছে। অবশ্য অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

"আমাব বাবা-মা এখনও মানতে পারেন না যে আমরা একটা দেশ। ওদের বিচার জাত ধরে ধর্ম ধরে। আমরা হাউসা বা ফুলানি। আমরা মুসলমান। ওরা ইবো বা ইউরুবা বা অন্য কিছু। ওরা খ্রীস্টান। এই তফাৎটা এখনও গভীর।" ওউডু বলে।

ইউরোপীয় আক্রমণের পর থেকে সাহারাপারের বাণিজ্যের গুরুত্ব কমেছে। আজকেব কানো, কাডুনা, সকোটো, জারিয়া বা কাটসিনা আগের মতো এত তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ নয়। উপকূলের কাছের শহরগুলো বড় হচ্ছে। লেগোস, ইবাদান অল্পদিনেই বিশাল মহানগবীব রূপ নিয়েছে।

"এটা ঠিক আমাদের লোকদের ভালো লাগে না।" ওউডু বলে, "এখন যেন সমস্ত দেশটা চলছে উপকূল থেকে।"

ঘাসের বন বনাম সমুদ্র উপকূল। যেন দুটো মানসিকতার দ্বন্দ্ব। ঘাসের বনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো যায়। উপকূলের জঙ্গলে বা শহরে পদে পদে বাধা। ফুলানিদেব বিশেষ কবে ওই জীবন ভালো লাগে না ওরা হাঁপিয়ে ওঠে।

"উত্তর আর দক্ষিণ এক হলো ১৯১৪ সালে", ওউডু বলে, "লুগার্ডের আমলে।" লুগার্ড বলা চলে ওখানকার লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস মিলিয়ে। দু দফায় নাইজিরিয়ার বৃটিশ হাই কমিশনার। ১৮৯৭ সাল থেকে ছ বছর, তারপর আবার ১৯১২ সাল থেকে কয়েক বছর। লুগার্ডই সকোটোর সারাদুনা আর কানোর রাজাকে পরাজিত করেন—কিন্তু ভারতীয় কায়দায় প্রত্যক্ষ শাসনের ভার উত্তরে নিলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে আমীর সুলতানের রাজত্ব রইলো, কিন্তু বৃটিশ ছত্রছায়ায়, যেমন ভারতের পলাশীর যুদ্ধের পরও কয়েক বছর নবাবরাই বাংলার শাসনে ছিলেন।

ঠিকই, যুদ্ধজয় আর রাজ্য শাসন এক ব্যাপার নয়। ইংরেজরা হয়তো বুঝলো যে আমীর, সারাদুনাদেরই ওদের প্রশাসনের ভিত্তি করা যাবে। তাই যুদ্ধে হেরেও ওরাই রইলো নিয়ন্ত্রণে। এমন কি চুক্তি হলো যে উত্তরে খৃস্টান মিশনারীরা প্রচার করবে না। দক্ষিণে তাই বৃটিশ প্রশাসন

আর প্রভাব জনজীবনের যতোটা গভীরে গেল এখানে সেটা হলো না। কাঠামোটা মোটামুটি বজায় রাখা হলো। সেটা পরবর্তী কালে গেল উত্তরেরই বিপক্ষে।

"বৃটিশরা কখনো চায় নি যে নাইজিরিয়া আধুনিক হোক" রবার্টস একদিন বলছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বারে, "বলতে পারো ওদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বক্ষণশীলতার চূড়ান্ত সীমায়। সনাতনী সমাজ থাক, সনাতনী নেতৃত্ব থাক এটাই ওরা চেয়েছে।ওবা চায় নি ধর্ম বা জাতের নাম করে কোন বিদ্রোহ ওদেব বিরুদ্ধে হোক। বরং ওরা আমীবদেব জাযগা দিলো, প্রশাসনের মাথায় বসলো।"

উত্তরে ইসলাম এক বড় ব্যাপার। কানোর মূল মসজিদ দেখবার মতো। বিরাট গম্বুজ। গগণস্পর্শী মিনার—দুই থাক গোল ব্যালকনি দিয়ে ঘেরা। শ্বেতস্তম্ভ। কতো মানুষের সেখানে ভীড়। ওউডু আলাপ করিয়ে দিলো ওদের এক ধর্মীয় নেতার সঙ্গে—ওবা বলে মাল্লাম, তার পোষাক সাদা। মাথায় পাগডী, ঢোলা গাউন। গাউনের তলায় হাতকাটা গলা খোলা পাঞ্জাবীর মতো পোষাক—যেটা ওরা অনেকেই পবে। ওউডুর কাছে জানলাম—এবা মূলতঃ সুন্নি, তবে ইয়ুরুবাদের মধ্যে কিছু আহমদীযাও আছে।

মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর নাইজিরিয়ায় গিয়ে বাংলাদেশ বা ভারতেব কথা না মনে হয়ে পারলো না। বৃটিশরা মুসলিমদের সরিয়ে ভারতের সিংহাসনে বসেছে—এটা মুসলমান সমাজ দীর্ঘদিন ভুলতে পারে নি। তাই বৃটিশ শিক্ষা ওরা নেয় নি। ধর্মীয় শিক্ষা এবং আচারই আঁকড়ে থেকেছে। এখানেও তাই. আমি যখন গেলাম. মানে বৃটিশ শাসন শুরুব প্রায় সাত দশক পরে, তখনও উত্তর নাইজিরিয়ায় ২৭৫৯০ কোরানিক স্কুল, আমাদের দেশের মাদ্রাসার মতো। সেখানে প্রায তিন থেকে চার লাখ ছেলেমেয়ে পড়ে মাল্লাম বা মৌলবীর কাছে। মৌলবীরা আরবী ভাষা শেখান, ঐস্লামিক আচার শেখান, এবং স্কুলের বাইরেও নানা ধর্মীয় কাজে ওদের ডাক পড়ে। অনেকেই কোরানিক স্কুলে ছেলেমেয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

আমি ওউডুর বাবাকেই জিগ্যেস কবি, "এতো ছেলেমেয়ে কোরানিক স্কুলে কেন যায়?"

উনি বলেন, "বলতে পারেন অন্যান্য স্কুলগুলোর ভয়ে। আজকাল ছেলেরা বড়দের মানে না, বড়রা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও জুতো খোলে না। স্কুলে গেলে দৈহিক কাজ, চাষের কাজ করতে চায় না। ওরা একেবারে পাল্টে যায়—সেইটাই ভয়। তারপর মেয়ে হলে তো আরো ভয়। আমরা চাই বয়ঃসন্ধির আগেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক, না হলে অধর্ম হবে। কিন্তু স্কুলে গেলে বিয়ের সময় পার হয়ে যাবে। তারপর ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পড়া, ওই বয়স, কতো কিছু ঘটতে পারে। মৌলবীর কাছে সেইসব ভয় নেই।"

"আপনি তাহলে ছেলেকে কেন ইংল্যাণ্ড পাঠালেন?"

বৃদ্ধ হেসে বলেন "কি করবো? যুগের হাওয়া।" ওউডু অনুবাদ করে দিচ্ছিল। এবার ওকেই যেন একটু বিব্রত মনে হলো। তবু পরের কথাগুলোও অনুবাদ করলো, ধরে নিচ্ছি ঠিক ঠিকই। বাবা বললেন, "এই যে আমার ছেলেকে পাঠালাম, ইঞ্জিনীয়ার হলো ঠিকই, কিন্তু আমাদের সমাজটাকে যে একদম মানে না। আমাদের কত আত্মীয় স্বজন, ওরা ওকে চায়, নেমন্তন্ন করে, ডাকে, তবু ও যাবে না। ও শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত।" বলতে গিয়ে ওউডুর চোখমুখ লাল হয়ে গেল।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "তবু ভালো, আমার ছেলেটা কোন মেমসাহেব বিয়ে করে আনে নি। বয়স্কদের সম্মান করে, চেঁচিয়ে কথা বলে না, সংসারের সব কিছু দেখে। তবু যেন ও সংসারে থেকেও নেই।"

ওউডুর বাবা তবু অন্যদের তুলনায় অনেক অনেক এগিয়ে। আধুনিক শিক্ষা সদ্য আসতে

শুরু করেছে। কিন্তু তিনটি মূল অঞ্চলের মধ্যে উত্তরই এখনো শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, এবং কাজের ক্ষেত্রে পিছিয়ে। যে হাউসারা নিজেদের মনে করতো ওরা পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে অগ্রণী অংশ, যেখানকার তিনটি বড় শহর কানো, কাটসিনা এবং জারিয়ার লোকসংখ্যা প্রাক-বৃটিশ যুগেও ছিল পঞ্চাশ হাজারের বেশী, এখন দরকার হচ্ছে তাদেরই নতুন করে তুলবার। ইতিহাস এইভাবেই মানুষ আর জাতের অবস্থান পাল্টায়।

যে ওউডু গৃহযুদ্ধ নিয়ে লণ্ডনে একটা কথাও বলতে চাইতো না, এখন কিন্তু অনেক কিছু বলে। ওর হীরো গাওয়ান, যদিও গাওয়ান হাউসা নয়।

"সেটাই সবচেয়ে বড় সুবিধে", ওউডু বলে, "গাওয়ান উত্তরের একটা ছোট ট্রাইবের মানুষ। গাওয়ান থাকলে কেউ বলতে পারবে না যে হাউসারা প্রতিশোধ নিচ্ছে। গাওয়ান না হয়ে কোন হাউসা নেতা থাকলে এতো সহজে নাইজিরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করা যেতো না। তাছাড়া গাওয়ানের মতো মানুষ কোথায় ?"

"তুমি কি মনে করো না দূর্নীতি প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে ?" জিগ্যেস করি, যে কথা এনো এবং দক্ষিণের অন্য বন্ধুরা বলে।

"ঠিকই দূর্নীতি বাড়ছে।" ওউডু বলে, "এখন পুরনো সামাজিক বিচার আর নেই। আমীর, মোল্লারাও এখন আর কিছু না। সবচেয়ে বড় সম্মান পায় কন্ট্রাকটর—যদি টাকা করতে পারে। মূল কথা সেইটাই সবকিছুর মূল্য। কেউ জিগ্যেসও করবে না টাকাটা কোথা থেকে এলো ?"

"তোমার গাওয়ান কেন কিছু করছে না ?"

"উনি একা কি করবেন ? যুদ্ধ করতে গিয়ে সৈন্য বেড়ে হলো দুই লক্ষ। এদের ছাঁটাই করবার উপায় নেই, তাহলে বিক্ষোভ হবে, এবং সেই বিক্ষোভের সামাল দেয়া যাবে না। অথচ যুদ্ধ এখন আর নেই, ওদের শুধু বসে বসে খাওয়াও। সেনাপতিরাই হচ্ছে দূর্নীতির মূল ভিত্তি—যতো কন্ট্রাক্ট পারমিট বেনামে ওদের হাতে।"

এবার আর একটা খারাপ প্রশ্ন করি, "ইবোদের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে যে দাঙ্গা হলো, সেটা কি গাওয়ান ঠেকাতে পারতেন না ?"

"না।" ওউডু বলে, "গাওয়ান ক্ষমতায় আসার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে এই দাঙ্গা হয়েছে। উনি তখনো গুছিয়ে বসতে পারেন নি। তবে এটা ঠিকই যে এই দাঙ্গা না হলে এতো ইবো বিয়াফ্রার পক্ষে চলে যেতো না।"

তারপর বলে, "তবে কি জানেন, ইবোদের কথার কোন ঠিক নেই। আবুবকর তাফাওয়া, বালেওয়া যখন ফেডারেল প্রধানমন্ত্রী তখন ওরা বলতো প্রতিটি অঞ্চলকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিতে হবে। তারপর যখন প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের পর জেনারেল ইরোনসি ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে ক্ষমতায় এলেন তখন তিনি চাইলেন এবং অন্য ইবোরাও চাইলো আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন তুলে দিয়ে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা। উল্টোভাবে আমরা উত্তরের মানুষ চাইলাম আঞ্চলিক শাসন, যেহেতু জেনারেল ইরোনসির সরকারে ইবোরাই ভারী। ওই বছরই জুলাই মাসে আবার যখন সামরিক অভ্যুত্থান হলো, ইরোনসি মারা গেলেন, গাওয়ান এলেন, তখন ফের ইবোরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তব শাসনের কথা তুললো।"

এতোটা রাজনৈতিক আলোচনা ওউডুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিলো না। লণ্ডনের ওউডুর কাছ থেকে তো নয়ই। ওকে জিগ্যেস করি, "তোমার শরীর কেমন আছে ?" আরতি জিগ্যেস করে, "পেটের ব্যথা ?"

ওউডু হেসে বলে, "না। কোন অসুখবিসুখই নেই।"

"সিনেমায় যাও ?"

"যাই।" ওউড়ু হিন্দী সিনেমার ফ্যান। ও বলে তারক-তারকাদের নাম, যা আমারও অজানা।

"হিন্দী সিনেমা এতো চলে কেন এখানে?"

ওউড়ু বলে, "কারণটা হয়তো এই যে আমরা আর ভারতবর্ষ নানাদিক দিয়ে কাছাকাছি। তারপর গান ভালো, নাচ ভালো, অনেক থ্রিল আছে।" ওকে আর বলতে পারলাম না যে ভারতবর্ষে থেকেও ওই ফিল্মী দুনিয়া আমার কাছে বিদেশী। কিন্তু নাইজিরিয়ার শতকরা আশি ভাগ ফিল্ম হয় হিন্দী নয় ইটালীর স্পাগেটি ওয়েস্টার্ন—হলিউড লণ্ডন এখানে কল্কে পায় না।

"বিয়ে করবে না?" আরতি জিগ্যেস করে।

"করবো।"

"কবে?"

"একটু গুছিয়ে নিই নিজেকে, তারপর। এমনিই বিয়েব বয়স পার হয়ে গেছে। দু এক বছরে খুব একটা এসে যাবে না।" নিজের দেশে স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ ওউড়ুকে সত্যি বেশ ভালো লাগে।

এখানে খাওয়ার ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। বাজরাই হলো এখানকার মূল খাবার—যে শস্য অল্প বৃষ্টি, অনাদরেও বড় হবে। ভুট্টা আর ছোলাও এবা খায়। একটু দক্ষিণের সাভানায় অবশ্য ইয়াম পাওয়া যায়। নীচু জমিকে ওবা বলে 'ফাদামা', যেখানে জল জমে এবং ধান, আঁখ, পেঁয়াজ, শব্জী এমনকি তামাকও করা যায়। সেই জমি মোট চাষের জমির মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ।

উত্তরের রাস্তার পাশের গ্রাম যেন আমাদের ভারতেরই মতো। মাটির বাড়ী, গরু, নোংরা, ঝোপ জঙ্গল, একগাদা মানুষ। রক্তের পার্থক্য ছাড়া মানুষগুলোও আলাদা নয়। লেগোসের সুপার মার্কেট আর আকাশছোঁয়া প্রাসাদের থেকে অনেক অনেক দূরে। লেগোস যেখানে আফ্রিকায় থেকেও পশ্চিমী দুনিয়ার অংশ, উত্তরের অঞ্চলগুলো সেখানে সনাতনী জীবনযাত্রার অনেকখানি আঁকড়ে রয়েছে। কিন্তু উত্তরেও পরিবর্তন আসছে।

ওউড়ুর বাবাই বলেন "আমাদের জমির মালিকানার নিয়ম কানুন পাল্টাচ্ছে। আগে দু ধরনের নিয়মের মধ্যে কাজ করতাম। একটি হলো আফ্রিকান নিয়ম, যে জমি সমাজের, কোন ব্যক্তির নয়। কোন মানুষ বলতে পারবে না এই জমিটা আমার। চীফ জমি ভাগ করে দেবে সমাজের হয়ে—সেই জমিতে চাষ করবে । চীফ চাইলে প্রতি বছর পাল্টে পাল্টে জমি দেবে। এমন কি চীফ সেই জমি কেড়েও নিতে পারে—তবে সেটা সচরাচর হতো না। পরের দিকে হলো, জমি আর পাল্টায় না, যে ব্যবহার করছে জমি তারই, যদিও মালিকানাটা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজের। কিন্তু সেই জমি বিক্রী করা যেতো না, বা জমিতে প্রজা বসানো যেতো না। দু নম্বর নিয়ম ছিলো ইসলাম ধর্মের—সেটা হলো খানিকটা ব্যক্তিবাদী, মৃত্যুর পর আপনার ব্যবহৃত জমি ভাগ হয়ে সব ছেলেরা পাবে। এর ফলে আগে খুব একটা অসুবিধা ছিলো না, যখন জমি বেশী ছিলো। এখন ক্রমশই জমি ছোট হচ্ছে, আর অনেক মানুষই বাধ্য হচ্ছে অন্য জায়গায় কাজের খোঁজে যেতে।"

"এখন কি চীফরা জমি বণ্টন করে না?" প্রশ্ন করি।

"করে, তবে সেটা আনুষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ মারা গেলে জমি ভাগ হয় সাক্ষী রেখে চীফেরা সামনে, তার বেশী কিছু নয়।"

"জমি কি বিক্রী করা যায়?" এই প্রশ্ন করেছিলাম পরে, লণ্ডনে, ডেভিড নরম্যানকে। ডেভিড দীর্ঘদিন জারিয়ার আহমেদো বেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলো, এবং উত্তর নাইজিরিয়ার কৃষি নিয়ে বেশ কিছু বইও লেখা ওর আছে।

ডেভিড বলে, "উত্তরটা হ্যাঁ এবং না। না এইজন্য যে সনাতনী নিয়মে জমির মালিক সমাজ, কারো বিক্রী বা হস্তান্তরের অধিকার নেই। কিন্তু তবু হচ্ছে—সমাজের নিয়ম ভেঙে ইনফরমালি হচ্ছে। বিশেষ করে কানো বা সকোটোর মতো ঘনবসতি অঞ্চলে। আমরা সকোটোর এক গ্রামে সমীক্ষা করে দেখেছি—ওখানকার তিনজনে একজন চাষী জমি এইভাবে কিনেছে। কোথাও কোথাও বর্গাদারী প্রথাও আসছে। তবে আইন এই ব্যাপারে কি বলবে সেটা স্পষ্ট নয়।"

মোট কথা সময় থেমে নেই।

ট্রেনে উঠবার আগে ওউডু জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল। আবার কবে দেখা হবে জানি না।

॥ ছয় ॥

শুধু মানুষ আর মানুষ। নাইজিরিয়ার যেখানে যাই সেখানেই প্রচুর মানুষ। একমাত্র উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানের সাভানা অঞ্চল বাদে—যে অঞ্চলটা থেকে দাসব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশী লোক যোগাড় করতো। অনেকটা যেন ভারতেরই মতো। লোকসংখ্যা ১৯৭৪ সালেই আট কোটির মতো, এবং দশ বছরে আরো দু কোটি যোগ হবার কথা। আয়তনে ভারতের চার ভাগের এক ভাগ। জনসংখ্যার বিচারে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দেশ। পশ্চিম আফ্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে যেন এক বিরাট দৈত্য একপাল বামনের মধ্যে। এখানে জনসংখ্যার বিচার লাখে নয় কোটিতে।

এতো মানুষ এমনি এমনি হয় না। আজকাল নানারকম ইঞ্জেকশন, টিকা আছে, যাতে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়—কিন্তু এক বড় বাধা হলো খাদ্যের অভাব। নাইজিরিয়ার উত্তরেও হাউসাদের দেশ নিজের, ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু সেখানে মানুষ সামান্যই। মাঝে মধ্যে যখন খরা আসে তখন মানুষ নিজের, মালী, সুদান, মৌরিটানিয়ার সাহেল অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণে নেমে আসে। নাইজিরিয়ায় সেই সমস্যা অনেক কম, আরো দক্ষিণে ভীষণ বৃষ্টি হয়। এখানে প্রকৃতি কৃপাহীন নয়, তাই অন্য জায়গা থেকে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে এসেছে।

কিন্তু মানুষের হিসাব ঠিক আছে তো?

সেই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। নাইজিরিয়ার রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ে বলা চলে এটাই এক বিস্ফোরক প্রশ্ন। সেখানে অবশ্য মোট জনসংখ্যার থেকেও বড় কথা হলো, কোন অঞ্চলে কত মানুষ। কেননা সেই হিসাবই ঠিক করবে কোন ভাষাভাষী বা অঞ্চলের মানুষ কতোটা ক্ষমতা পাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিচার হবে ভোটের অঙ্কে, সেই অঙ্ক নির্ধারণ করবে মানুষের হিসাব।

এই সমস্যা ভারতের মানুষের কাছে নতুন নয়। ১৯৪১ সালের ভারতীয় আদম সুমারি নিয়ে তাই নানা প্রশ্ন, বিশেষ করে আসাম, বাংলা এবং পাঞ্জাবে। কারণটা সাম্প্রদায়িক : হিন্দু বেশী না মুসলমান বেশী! স্বাধীনতার পরেও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেছে, কোন ভাষাভাষী বেশী—পাঞ্জাবী না হিন্দী! আদমসুমারী তখন আর বিজ্ঞান থাকে নি—প্রয়োজনমত সংখ্যা বেড়েছে বা কমেছে।

আফ্রিকার বহু দেশে অবশ্য লোকগণনা খুব কঠিন। গভীর জঙ্গল, স্রোতস্বিনী নদী, মরুভূমি পার হয়ে কাজ করানো শক্ত। যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ। প্রশাসনও সেইভাবে গড়ে ওঠেনি। নাইজিরিয়ায় অবশ্য সেই ধরনের সমস্যা কম যেহেতু তুলনামূলকভাবে শহর বেশী।

স্বাধীনতার আগে মূল দ্বন্দ্ব ছিল উত্তর বনাম দক্ষিণ—কোথায় মানুষ বেশী? ১৯৫২-৫৩ সালের লোকগণনার হিসেব অনুযায়ী প্রতি একশো জন মানুষে ৫৪ জন উত্তরের, বাকি ৪৬ জন দক্ষিণের। সেই হিসেব অনুযায়ী ৩১২ জনের পার্লামেন্টে উত্তর পেলো ১৭৪টা আসন। অবশ্য এটাও ঠিক যে উত্তর মানেই হাউসা-ফুলানি বা মুসলমান নয়, যেমন দক্ষিণ-পূর্ব মানেই ইবো খৃষ্টান নয়। কিন্তু এই হিসেব অনুযায়ী, ঐক্যবদ্ধ থাকলে নাইজিরিয়ার পরিচালনাভার থাকবে

উত্তরের হাতে।

জনসংখ্যার এই হিসেব দক্ষিণের ইবো ইউরুবারা মানতে পারলো না। ওরা অভিযোগ করলো, এই হিসাব ইচ্ছে করে ওইভাবে বৃটিশ অফিসাররা করেছে, যাতে দেশের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশের হাতেই থাকে ক্ষমতার ভার।

১৯৬৩ সালে আদম সুমারী হলো। দেখা গেলো মোট পাঁচ কোটি ছাপান্ন লক্ষ মানুষের মধ্যে দু কোটি আটানব্বুই জনই উত্তরের। ততদিনে নাইজিরিয়া স্বাধীন হয়েছে, এবং ফেডারেল সরকার উত্তরের নেতৃত্বে চলছে। কাজেই ভীষণভাবে অভিযোগ উঠলো ওই তথ্য নিয়ে—দক্ষিণের দুই অঞ্চলই বললো, ইচ্ছে করে উত্তরের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

জনসংখ্যার প্রশ্ন এতো বড় হতো না, যদি ঘানা বা কেনিয়ার মতো নানা জাতপাত নিয়ে তৈরী একটা দল থাকতো, বা নক্রুমা বা কেনিয়াট্টার মতো কোন সর্বজনস্বীকৃত নেতা থাকতেন। নাইজিরিয়ার দূর্ভাগ্য যে সেই রকম কোন রাজনৈতিক দল তৈরী হলো না, বা নেতৃত্ব গড়ে উঠলো না। রাজনীতির ভাগ হলো জাতি ধরে, অঞ্চল ধরে—নীতির ভিত্তিতে নয়। উত্তরের দল, সকোটের সারাদুনার নেতৃত্বে— নর্দার্ন পিপ্লস্ কংগ্রেস। দক্ষিণ-পশ্চিমের দল, চীফ আওলোওর নেতৃত্বে এ্যাকশন গ্রুপ, এবং দক্ষিণ-পূর্বে, নাইজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি, আজি কিওয়ের নেতৃত্বে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নাইজিরিয়ান সিটিজেনস(এন-সি-এন.-সি)। তিনটি অঞ্চল, তিন দল, তিন নেতা—স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই এই রকম ভাগ।

অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বে ঠিক এতোটা খারাপ ছিল না। প্রথম বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় দক্ষিণের নেতৃত্বেই, তখন ইয়ুরুবা আর ইবোরা একসঙ্গেই ছিল। নাইজিরিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা ছিলেন লেগোস ডেইলী নিউজের সম্পাদক হারবার্ট মেকলে, কিন্তু আজিকিওয়ে ছিলেন ওর সবচেয়ে বড় সঙ্গী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক। একজন ইউরুবা একজন ইবো। কিন্তু চল্লিশ দশকের শেষে এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথমে বৃটিশদের 'ভাগ করো আর শাসন করো' নীতি সফল হলো, যখন ইউরুবাদের নিয়ে চীফ আওলোও আলাদা দল গড়লেন—এ্যাকশন গ্রুপ, সারাদুনা তৈরী করলেন নর্দার্ন পিপল্স্ কংগ্রেস, এবং আজিকিওয়ে এন-সি-এন-সি।

এই তিন দলের মধ্যে পার্থক্য আঞ্চলিক পার্থক্যেরই সূচক। ইউরুবা অঞ্চলের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী, এমন কি ইবোদেরও দুগুণ। দাসব্যবসা, বাণিজ্য, নগরায়নের বড় অর্থনৈতিক লাভ ওরাই পেয়েছে। তাই এ্যাকশন গ্রুপের নেতৃত্বে থাকলো বড়ো ব্যবসায়ীরা এবং কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। এন-সি-এন-সির নেতৃত্ব ছিলো মূলতঃ ইবোদের মধ্যের শিক্ষিত এবং নব্যধনীদের হাতে। কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পশ্চাদপদ অঞ্চল উত্তরের নেতৃত্বে এলো সামন্ততান্ত্রিক সনাতনী আমীররা।

"অবশ্য দক্ষিণের মতো শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি নেতৃত্বের দল তৈরীর চেষ্টা যে উত্তরে হয় নি এমন নয়", রবার্টস বলে, "যেমন, ১৯৫০ সালে কানোতে তৈরী হলো নরদার্ণ এলিমেন্টস প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন (নেপু), যারা ঠিক করলো এন-পি-এর মধ্যে থেকেই কাজ করবে. এবং দলকে প্রগতিশীল জাতীয় স্বার্থে চালাবে। কিন্তু হলো না। ১৯৫৯ সালে নেপুর লোকদের সরিয়ে দেয়া হলো ওই পার্টি থেকে, এবং নেতৃত্ব এলো সারাদুনা এবং আবুবকর তাফাওয়া বালেওয়ার হাতে।"

স্বাধীনতার মুহূর্তে অবশ্য এই তিন আঞ্চলিক দলের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ ছিলো না নীতিগতভাবে। এরা সবাই ছিলো পাশ্চাত্য ঘেঁষা। প্রথম নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয়ভাবে এক কোয়ালিশন সরকার হলো উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে—আজিকিওয়ে হলেন রাষ্ট্রপতি এবং

আবুবকর হলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই বোঝাপড়াও ভেঙে গেল ১৯৬৩ সালের আদম সুমারীর পর—যখন বোঝা গেল লোকসংখ্যার বিচারে উত্তর একাই পারবে ফেডারেল সরকার চালাতে। ইতিমধ্যে চীফ আওলোওও-র দল একটু বাম দিকে ঘেঁষেছে-সত্যিকারেরজোট নিরপেক্ষতার দাবী করছে, বৃটেনের সঙ্গে সামরিক চুক্তি খাঁরিজ করতে বলছে এবং চাইছে বিদেশী কোম্পানীগুলোর জাতীয়করণ হোক। সেই থেকে শুরু হলো পশ্চিম অঞ্চলের সংকট, এ্যাকশন গ্রুপের মধ্যে আওলোও এবং আকিনতোলার বিরোধ, জরুরী অবস্থা জারী এবং পশ্চিমী বিরোধী নেতাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবাস।

রাজনৈতিক দলগুলো যখন জাতি বা অঞ্চলের উর্ধ্বে উঠতে পারলো না, তখন আর একটা উপায় ছিলো। সেটা ছিল সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। চল্লিশের দশক থেকেই নাইজিরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন এক বড় শক্তি। ১৯৪৫ সালের এক বড়ো সাধারণ ধর্মঘটে সেই শক্তি বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু ওদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল। এক ভাগের বক্তব্য ছিল, ট্রেড ইউনিয়ন কোন রাজনীতির মধ্যে ঢুকবে না, নিজের মতো চলবে। আরেক ভাগ চাইতো নাইজিরিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে—সেই ভূমিকা হবে আঞ্চলিকতা-বিরোধী এবং সমস্ত জাতি ও ধর্মের মানুষকে নিয়ে। ওদের বলতো জিকি-পন্থী, এবং ওদের উদ্দেশ্য ছিলো বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন। ওরা চেষ্টা করলো নাইজিরিয়া সরকারের বৃটিশ চীফ সেক্রেটারীকে হত্যা করবার—ফলতঃ ১৯৫০ সালেই এই সংগঠন বে আইনী ঘোষিত হলো। তবু ওই বছরেরই আগষ্ট মাসে অনেকগুলো ধর্মঘট ওরা করলো। ওদের কেউ কেউ মার্কসবাদী হলো।

"তবে কেন ওরা এক বড় সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠলো না?" জিগ্যেস করি।

রবার্টস বলে, "কারণটা আবার সেই আঞ্চলিক চেতনা। শ্রমিক নেতারা না চাইলেও, এটা ঘটনা যে শ্রমিক আন্দোলন দক্ষিণ অঞ্চলেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিলো। ওদের নেতৃত্বে ছিলো মূলত ইবো বা ইয়ুরুবারা—হাউসা-ফুলানিদের ওরা টানতে পারলো না। অবশ্যই এটা ঠিক, যে শিল্প, বন্দর, বড় বড় শহর এবং অফিস সবই দক্ষিণে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের আঞ্চলিক বৈষম্য গেল না।"

১৯৬৪ সালে হলো দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এবার সত্যি সত্যি দুটো ভাগ হলো—উত্তর এবং দক্ষিণের রাজনৈতিক দলগুলোর আলাদা জোট, শুধু আকিনতোলার গ্রুপ পশ্চিমী হয়েও উত্তরের সঙ্গে থাকলো। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করলো দক্ষিণের জোটকে। তার কয়েক মাস আগেই, জুন মাসে, এক বড় সাধারণ ধর্মঘট এরা করেছে। দক্ষিণের জোট ভোট বয়কটের কথা বললো, অভিযোগ করলো রিগিং-এর। নির্বাচনে মাত্র এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী লোক ভোট দিলো। উত্তরের জোট ভালো ভোটে জিতলো। দক্ষিণের জোট বললো, প্রশাসনের ব্যবহার করে জালিয়াতি হয়েছে।

১৯৬৫ সালের পুরোটা জুড়ে নাইজিরিয়ার এক বিরাট অস্থিরতা। আঞ্চলিক প্রশ্ন 'ই বড় হয়ে উঠলো। ভোট জাল, আদম সুমারী জাল, দুর্নীতি এবং তারই পাশাপাশি আসতে লাগলো তেলের টাকা। নাইজিরিয়ার তেলের রপ্তানীর পরিমাণ এই দেশকে পৃথিবীর প্রথম ছয়টি দেশের তালিকায় ঢোকালো।

"তখনও আমরা বুঝিনি আর এক বছরের মধ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে," রবার্টস বলে, "নাইজিরিয়াকে তখনও আফ্রিকার মধ্যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের এক বড় দৃষ্টান্ত বলে ধরা হতো। বলা হতো, শুধু জনসংখ্যার বিচারে নয়, গণতন্ত্রের বিচারেও আমরা এগিয়ে। যেভাবেই হোক, অন্তত কয়েকবার নির্বাচন তো হয়েছে, এবং অনেকগুলো পার্টিতো কাজ করছে।"

এর এক বছরের মধ্যেই হলো সামরিক অভ্যুত্থান। তারপরই গৃহযুদ্ধ।

॥ সাত ॥

দুরন্ত নাইজার নদী ঘাসের বন ভেঙে, জঙ্গলে শাদা-হলুদ দাগ কেটে গাল্‌ফ অফ গিনীর দিকে ছুটছে। এই দৃশ্য আকাশপথেও দেখেছি।

আমাদের যেমন গঙ্গা, ইজিপসিয়ানদের কাছে যেমন নীল নদী, তেমনই পশ্চিম আফ্রিকার মানুষের কাছে নাইজার নদী।

আফ্রিকার তৃতীয় বড়ো নদী। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে অববাহিকা। আটলান্টিক মহাসাগরের মাত্র দেড়শো মাইলের মধ্যে ফুটা জালান মালভূমিতে জন্ম, কিন্তু সোজা পশ্চিমে আটলান্টিকে না নেমে অনেক ঘুরে ২৬০০ মাইল পথ পার হয়ে নামলো গাল্‌ফ অফ গিনীতে। নদীর এক বড় অংশই নাব্য নয়, অনেক জায়গায় হঠাৎ অনেক নীচে জল নেমে গিয়েছে। একটা অংশ আবার বেশ কিছু বড় হ্রদ তৈরী করেছে। মালভূমি, কাঁটাগাছের ঝোপ, ঘাসের বন, ঘন জঙ্গল সবকিছু পার হয়ে নাইজার সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। নদী কোথাও শীর্ণ কোথাও কয়েক মাইল চওড়া, কোথায় গভীর কোথাও সামান্য জল। বহু নদী এসে মিশেছে. আবার সূর্যের তাপে সাহেলের অংশে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জলই বাষ্প হয়ে গিয়েছে। যাত্রার প্রথমে উত্তরে, পরে পূর্বে, তারপর মোড় ঘুরে দক্ষিণে ঢুকেছে—এই মোড়ের কাছেই উত্তরের দুই পুরানো শহর, টম্বাকুট আর গাও। নাইজার দেখা মানে পশ্চিম আফ্রিকার সব রকম মাটি-জঙ্গল আর মানুষ দেখা। ওদের ভাষায় নাইজার মানে 'নদীর সেরা নদী।'

ইউরোপীয়রাও জানতে চেয়েছে এই নদীকে। তবে উদ্দেশ্যটা ছিল অন্য রকমের। হাতির দাঁত, সোনা, দাস—এই ছিল ওদের লক্ষ্য। ওরা চেয়েছে আফ্রিকার গভীরে ঢুকতে—কোন পথে যাবে ? নদী ছাড়া তখন কোনো পথ নেই। ওরা তাই লোক পাঠিয়েছে জানতে নাইজার নদীর কোথায় উৎপত্তি, কোথায় সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

ওদের ধারণা ছিল নাইজার পশ্চিম উপকূলে আটলান্টিকের দিকে ছুটছে। মুঙ্গো পার্ক ১৭৯৬ সালে সেই ভুল ভাঙলেন। দেখালেন নদীর উৎপত্তি সেনেগাল-মালী সীমান্তে ফুটা জালান মালভূমিতে। তারপর, আরো অনেকে, যেমন মেজর আলেকজাণ্ডার লেইং বা জন ও রিচার্ড ল্যাণ্ডার এবং জার্মান হেইনরিখ বার্থ ও রিচার্ড ফুগেল এই নদীপথের ছবি সুন্দর করে আঁকলেন। কত নদী, শাখা-প্রশাখা এই বড় নদীতে এসে মিশেছে, তারও মানচিত্র তৈরি হল। সেই পথ বেয়ে এল ইউরোপীয় পাদ্রীরা। পরে কোম্পানিরা এবং সৈনিকরা।

নাইজার যেখানে গাল্‌ফ অফ গিনীতে এসে মিশেছে. সেখানে এক বিরাট বদ্বীপ। নদী শতধা বিভক্ত হয়ে উপকূলের দুশো মাইল অঞ্চলকে প্লাবিত করছে। এ যেন গঙ্গার অববাহিকা—মিলটা সহজেই চোখে পড়ে।

এবং সমুদ্রের কাছে গঙ্গার যেমন নানা দ্বীপ এবং গভীর জঙ্গল—এখানেও তাই।

পূর্বদিকের এই অঞ্চলে ইবোদের বাস। ইবোদের সঙ্গে বাঙালিদের নানা মিল চোখে পড়বে। মিলটা শুধু নদী-মুখের শতধারার নয়, বা অববাহিকার জঙ্গলে নয়, বা ভৌগোলিকভাবে পূর্বদিকে

অবস্থানের নয়।

"ঐতিহাসিকভাবে বলতে পারো আমরা উত্তর বা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের থেকে অনেকটা পিছিয়ে ছিলাম। জঙ্গল ছিল এক বড় বাধা। প্রতিটি জায়গার মানুষ সেখানেই আটকে ছিল। আমরা নাইজিরিয়ার অন্য অঞ্চলের লোকদের জানতাম না। ওরাও আমাদের জানত না। ইউরুবা বা হাউসাদের মতো বড় বড় শহর এখানে ছিল না। বলতে পারো সাংস্কৃতিক ভাবেও আমরা ছিলাম পিছিয়ে।" সিলভানো বলে। ডঃ সিলভানো মদুজুবেয়া লণ্ডনের এক বড় পলিটেকনিকের অধ্যাপক।

"অবশ্য এটাও ঠিক যে নাইজিরিয়া বলে তখন কিছু ছিল না। প্রত্যেকেই বুঝত তার নিজের ট্রাইব বা জাতিকে। জানত তার নিজের অঞ্চল। জঙ্গলে যা তৈরি হত সেটা ছিল যথেষ্ট। বাইরের পৃথিবীকে না জানলেও চলত।" সিলভানো যোগ করে।

ইউরোপীয় শক্তি এসে সেই অবস্থা পাল্টে দিল। নাইজিরিয়ার মধ্যে ইবোবাই প্রথম ইংরাজি শিখল, এবং ইংরেজদের প্রশাসনে এক বড় ভূমিকা নিল বাঙালিদের মতোই। ওরা খ্রীস্টান হল দলে দলে। এর আগে কিছু কুসংস্কার, দেবদেবী ছাড়া কোনো সংগঠিত ধর্ম ওদের ছিল না। খ্রীস্টান হওয়া তাই ছিল ওদের পক্ষে সহজ। ভাষাগত জাতিগত যোগাযোগ, এবং উদ্যোগী মানসিকতা অল্পদিনেই ওদের তুঙ্গে তুলে দিল। সেই মানসিকতা ছিল উত্তবের থেকে আলাদা।

বৃটিশরা উত্তরও দখল করেছে। কিন্তু ওদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ছিল, প্রচণ্ড গর্ববোধ ছিল। শক্তির দ্বন্দ্বে না পারলেও মনের দিক থেকে ওরা ইউরোপীয়দের মেনে নিল না। তাই বিরাট সংখ্যাধিক্য থাকলেও ঐতিহ্য থাকলেও, আধুনিক, ঔপনিবেশিক নাইজিরিয়ায় ওরা পিছিয়ে পড়ল। ইংরেজরাও চাইল, জাতিগত-ধর্মগত ভাগ থাক। ওদের তখন ধাবণাই ছিল, সব জাতিকে দুটো ভাগের একটাতে ফেলা যায়। হয় 'মার্শাল রেস' বা যুদ্ধ করবে, নয় ভালো কেরানী হবে, প্রশাসন দেখবে, মাস্টার হবে। ফুলানি হাউসাদের ধরা হল, আমাদের দেশের পাঞ্জাব গাড়োয়াল বা নেপালের মানুষের মতো প্রথম ভাগে এবং ইবোদের ধরা হলো বাঙালিদের মতোই, দ্বিতীয় ভাগে।

শিক্ষাগতভাবে ইউরুবারা দীর্ঘদিন ওদের থেকে এগিয়ে ছিলো। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে ইবোরা ওদের ছাড়িয়ে গেল। মাথা পিছু আয়ের বিচারে ষাটের দশকেও ইউরুবারা ছিল এগিয়ে—কিন্তু পূর্বাঞ্চলে যতো তেলের উৎপাদন বাড়লো ততো সেই তফাৎও কমলো। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে তেল খোঁজা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ দশকের প্রথমে বৃটিশ পেট্রোলিয়ম পূর্বাঞ্চলে তেলের খনি পেলো। তারপর এলো অন্যরা—মার্কিন, ডাচ, ইটালীয়ান, বেলজিয়ান, কেউ বাকি থাকলো না। এক সময় জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্যমানের আদ্ধেক আসতো উত্তর থেকে—তেলের আয় যতো বাড়লো ততো সেই অবস্থাও পাল্টালো। ১৯৬৫ সাল থেকে তেলই হলো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মূল মাধ্যম। ১৯৭৩ সালে মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়ের দশভাগের নয় ভাগ এলো তেল থেকে, এবং সরকারী রাজস্বের চার-পঞ্চমাংশেরও সূত্র হলো তেল। আগে ছিল জনসংখ্যার রাজনীতি, এখন তেল হয়ে উঠলো রাজনৈতিক দাবা খেলার সবচেয়ে মূল্যবান গুটি। তেলের দরিয়ায় পূর্বাঞ্চল এবং সামগ্রিক দেশের রাজধানী ভেসে বেড়ালো—স্বচ্ছন্দে নয়, কেন না ঝড় উঠলো।

রোজ থাকে পোর্ট হারকোর্টে। এই বন্দর হল নাইজার নদীর মোহনার কাছে। রোজের উচ্চারণে "পোটাকোঠ"। আমার বহুদিন লেগেছে বুঝতে যে এই দুটো জায়গা আলাদা নয়।

১৯৭৪ সালের পোর্ট হারকোর্ট কর্মব্যস্ত। শহরে স্কুল কলেজের ছড়াছড়ি, আর চার্চের সমারোহ। চার্চের সঙ্গে চার্চের ঝগড়া। কেউ অ্যাঙ্গলিকান, কেউ মেথডিস্ট, কেউ বা রোমান

ক্যাথলিক। কিন্তু যেটা লক্ষণীয়, মসজিদের বিরাট গম্বুজ বা আকাশচুম্বী মিনার চোখে পড়ে না বা আজানের আওয়াজ কানে আসে না। বন্দর, জুবিলি মেমোরিয়াল, পার্ক, মূল কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, এই সব ঘুরেই শহর দেখা শেষ।

পোর্ট হার্টকোর্টের রোজ, লণ্ডনের রোজ নয়। ওর চুল আর সোজা নয়। কোঁকড়া চুল ফিরে এসেছে আর লাল-নীল-সবুজ পুঁতি আর ফিতে দিয়ে চুল ভাগ করে বেঁধে অনেকগুলো সিঁথি দিয়ে সাজানো। স্কার্ট পাল্টে ঢোলা আফ্রিকান পোশাক। সেই রুক্ষতা আর নেই। দেশে ফেরার আগের বিষণ্ণতাও নেই, বরং খুশি খুশি ভাব।

রোজকে বললাম, "আর কী দেখবার আছে এখানে ?"

রোজ বলে, "আপনি কি ভেবেছিলেন এখানে মাদাম টুসো দেখবেন বা চেঞ্জ অফ গার্ড দেখবেন ! বন্দরই আমাদের সব।" এবং এই বন্দর ইংরেজদেরই তৈরি, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে। শহর দেখবার মতো নয়, কিন্তু মানুষগুলো দেখবার মতো। আড়াই লক্ষ মানুষের শহর পনেরো লক্ষের ইবাদানের থেকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈহৈ বেশি। ইবোদের দুর্নাম ওরা বড্ড ঝগড়াটে।

১৯৭৪ সালের এই ইবো অঞ্চল খুব শান্ত। ষাটের দশকের কটা বছর এখানে ছিলাম না। তখন হয়তো এর রূপ ছিল অন্য। কাগজে পড়েছি, টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি, বন্ধুদের মুখে শুনেছি সেই সব কথা।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭০—সাড়ে তিন বছর। নাইজিরিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক অভিশপ্ত যুগ। ওই ইতিহাস রক্তাক্ত, কলঙ্কিত।

ওই সময়ে লণ্ডনের টেলিভিশনে প্রায় রোজই একটা মুখ দেখতাম। এত দেখতাম, যেন মনে হতো ঘরের মানুষ।

কর্নেল ওজুকু। দাড়ি গোঁফ, অবিন্যস্ত মুখ, গোল গোল ভাব, বড় ভুঁড়ি ঘুমন্ত চোখ। সুন্দর ইংরাজি বলেন, কবিতা পড়েন। আস্তে আস্তে একটা একটা করে কথা, যেন স্বপ্নাবেশের মধ্যে বলছেন। কথা শুনে মনে হবে না, যুদ্ধ চলছে। বা সেই যুদ্ধের দুই বিবদমান পক্ষের একদিকের উনি মহানায়ক। অথবা মানুষ মরছে, রক্ত ঝরছে। ওজুকু অক্সফোর্ডের ছাত্র। ওজুকু কবি। চেহারা দেখলে ভাবতে কষ্ট হয় যে ওজুকু একজন সেনাপতি, ওর অস্ত্র বন্দুক। অথবা ওর পিছনে সি-আই-এ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু কথাটা সত্যি।

১৯৬৬ সালের গোড়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে পুরনো, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার বিদায় নিল তাতে কেউ চোখের জল ফেলে নি। সংগ্রামটা যদি দুর্নীতি বনাম পরিচ্ছন্ন প্রশাসন হতো তাহলে হয়তো এক সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে দেশটা এগোতে পারত।

কিন্তু সেটা হল না। সামরিক শক্তির নেতৃত্বে জেনারেল ইরোনসি, তিনি ইবো, খ্রীস্টান। ব্যাপারটা জাতিগত ধর্মগত রূপ নিল।

সেটা দুঃখের, কেননা সত্যি সত্যি আঞ্চলিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই অভ্যুত্থান হয় নি। বরং ১৯৬৫ সালের অঞ্চলগত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দেশ যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তার সমাধানই ছিলো জেনারেল ইরেনসির নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্য। এই অভ্যুত্থানের এক বছরের কিছু বেশী আগে, রাষ্ট্রপতি আজিকিউয়ে এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি ঐক্যের আবেদন রেখে বলেন, যদি দেশ ভাগ হতেই হয় যেন তাড়াতাড়ি হয়, না হলে, "যদি সেই ট্র্যাজেডীর ভূমিকা আমাদের নিতে হয়, তখন কঙ্গোর অভিজ্ঞতা তার কাছে ছেলেখেলা মনে হবে।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "আমি দেয়ালের লিখন দেখতে পাচ্ছি।"

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের

এক বড় অংশ। ওরা ভেবেছিল, এই আঞ্চলিকতাবাদে ক্ষতবিক্ষত দেশে একমাত্র সৈন্যবাহিনীই পারবে ঐক্য আনতে। সন্দেহ নেই, অভ্যুত্থানের সময় উত্তর-দক্ষিণ ভেদ ছিলো না। যারা উত্তরাঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী সকোটোর সার্‌দুনা স্যর আহমেদো বেলোকে খুন করলো তারা উত্তর অঞ্চলেরই সৈন্য। সামরিক অভ্যুত্থান নিশ্চয়ই ভালো জিনিস নয়, কিন্তু অনেকে মনে করলেন এটি একটি অপরিহার্য ধাপ। নাইজিরিয়া ঐক্যবদ্ধ হোক, তখন আবার নির্বাচন হোক, গণতন্ত্র আসুক।

কিন্তু সেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সবকিছু হলো না। যারা মারা গেল তাদের বড় অংশই হাউসা-ফুলানি। যারা ক্ষমতায় এলো সেনাপতি হিসাবে, তাদের মধ্যে ইবোরাই ছিল সংখ্যাধিক্য। তাই যখন ইরোনসি বললেন বিভিন্ন অঞ্চলের সিভিল সার্ভিস আলাদা থাকবে না, এক হয়ে যাবে, প্রচার হলো এরপর আর উত্তর অঞ্চলের লোক ভালো চাকরী পাবে না—শিক্ষিত ইবোরা আর্মি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রশাসনেও প্রভূত্ব করবে। যখন ইরোনসি বললেন, নাইজিরিয়া হবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তখন হাউসা-ইউরুবা দু পক্ষই ভয় পেলো, যেহেতু কেন্দ্র তখন ইবোদের নিয়ন্ত্রণে। আঞ্চলিক সংকীর্ণতা নিশ্চয়ই ভালো নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক বিভিন্নতা, জাত-ভাষা-ধর্মের বৈচিত্রকে পুরোপুরি অস্বীকার করে জাতীয় ঐক্য আসে না। উত্তবের মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হলো।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে হলো পাল্টা অভ্যুত্থান। উত্তরের সৈন্যবাহিনীর উদ্যোগে। জেনারেল ইরোনসি মারা গেলেন। ক্ষমতায় এলেন একত্রিশ বছরের যুবক, ইয়াকুবু গাওয়ান, যিনি হাউসা নন যদিও উত্তরের লোক। নাইজিরিয়ার রাজধানীতে থমথমে ভাব রইলো। সবাই ভাবতে লাগলো—এরপর কি? পূর্বাঞ্চল এখন কি করবে?

পরেব এগারো মাসে তিনটি বড় বড় ঘটনা ঘটলো।

এক, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ইবোবিরোধী দাঙ্গা। উত্তরাঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার ইবো মারা গেল। ইবোরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করলো। দশ থেকে কুড়ি লক্ষ ইবো ভয় পেয়ে ফিরে গেল পূর্বাঞ্চলে। সঙ্গে নিয়ে গেল ওই দাঙ্গাব বীভৎসতার নানা কাহিনী। পূর্বাঞ্চলের এক বড় অংশের মানুষের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো এই ঘটনায়।

দুই, জেনারেল গাওয়ান বুঝলেন পূর্বাঞ্চল হয়তো ভাবতে পারে ফেডারেশন ছেড়ে আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাবার কথা। সেই প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য গাওয়ান এক ফন্দী আঁটলেন। হিসেব মিলিয়ে দেখলেন যে পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ইবোরা বিপুল সংখ্যাধিক্য হলেও ওরা একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত। ইবোরা ছাড়াও ইবিবিও এবং আরও নানা জাত পূর্বাঞ্চলেব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে তেলের উৎপাদন অঞ্চলে ইবিবিওরাই সংখ্যাধিক্য।

এতদিন ছিল পাঁচটা অঞ্চল—উত্তর, পশ্চিম, মধ্য-পশ্চিম (বেনিনকে ভিত্তি করে) পূর্ব এবং রাজধানী লেগোস। এখন গাওয়ান তৈরী করতে চাইলেন বারোটা রাজ্য—উত্তরে হবে ছটি এবং পূর্বে তিনটি। সেই তিনটির মধ্যে মাত্র একটিতে ইবোরা হবে সংখ্যাধিক্য। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হলে ইবোরা হয়ে দাঁড়াবে বারোটা রাজ্যের মাত্র একটার সংখ্যাধিক্য, তেলের নিয়ন্ত্রণ ওদের হাতে থাকবে না।

"তেলই ছিল গৃহযুদ্ধের এক বড় কারণ" এনো বলে, "ফেডারেল সরকার চাইলো পূর্বাঞ্চলকে ভাগ করে তেলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে। পূর্বাঞ্চল চাইলো ওই ভাগকে অস্বীকর করে তেলের খনি নিজেদের হাতে রাখতে।"

"আর পিছনে ছিল কোম্পানীরা," রবার্টস বলে, "পূর্বাঞ্চল যদি আলাদা হয়ে যায়, নতুন দেশ হয়, তাহলে সেই ছোট দেশের সরকারের ওপর তেলের কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ভালোভাবে

থাকবে। কোম্পানীরাও চেয়েছে নাইজিরিয়া ভাগ হোক। আমেরিকা চেয়েছে।"

মাবোগুঞ্জে বলেন, "কথাটা ঠিকই, কিন্তু এটাও ভাবতে হবে, সি-আই-এ বা বিচ্ছিন্নতাপন্থীরা এই সুযোগ পেল কি করে ? যদি উত্তরে দাঙ্গা না হতো, এতো লোক না মরতো, লক্ষ লক্ষ ইবো পূর্বাঞ্চলে ফিরে না যেতো, তাহলে হয়তো ইবোদের মধ্যে এতোটা তিক্ততার সৃষ্টি হতো না। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা গণ-সমর্থন পেতো না।" তারপর একটু ভেবে বললেন, "আর একটা ব্যাপার অতি-কেন্দ্রীকতা। জেনারেল ইরোনসি যে ব্যর্থ হলেন তার কারণ তিনি জোর করে কেন্দ্রীকতার সমাধান চাপাতে চাইলেন যেটা উত্তর মানলো না। গাওয়ানও চাইলেন কেন্দ্র শক্তিশালী হোক, তবে আলাদা পন্থায়, রাজ্যগুলোকে ছোট আর দুর্বল করে দিয়ে। দুজনেরই যেটা ভুল হলো, ওরা বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস আর স্বাতন্ত্র্য মানলেন না। অবশ্যই জাতীয় সত্তা শেষ পর্যন্ত গড়ে তুললেই হবে—কিন্তু তড়িঘড়ি করতে গিয়ে আঞ্চলিকতাবাদী চেতনাই উসকে দিলো। উল্টো ফল হলো।"

মার্কিন-কোম্পানী-সহায়তার অভিযোগ অবশ্য অমূলক নয়। এ্যাঙ্গোলা স্বাধীন হবার পর চেষ্টা হয়েছে তৈলসিক্ত কাবিণ্ডা অংশটাকে আলাদা করতে। পঞ্চাশের দশকে কঙ্গো স্বাধীন হলে হীরকখনির অঞ্চলকে আলাদা করে কাটাঙ্গা দেশ তৈরির চেষ্টা হয়েছে। কুয়াইৎ খুব ছোটই থাকুক, ইরাকের অংশ না হোক, বাহরিন যেন ইরানেব প্রদেশ না হয়—এসব কোম্পানিরা চেয়েছে। ওরা চায়, ছোট ছোট দেশের ছোট ছোট দুর্বল সরকার যারা ওদের হাতের মুঠোয় থাকবে।

১৯৬৭ সালের মে মাসে গৃহযুদ্ধের সূচনা হলো কর্নেল ওজুকুর স্বাধীন বিয়াফ্রার ঘোষণা থেকে। প্রথম দিকের যুদ্ধে মনে হলো যেন পূর্বাঞ্চলই জিতবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পুরো মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল ওরা দখল করলো-এবং ওই বছরের প্রায় শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ওদের ফেডারেল সৈন্যরা সরাতে পারলো না।

কিন্তু যতো দিন গেল ততো উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলেব সম্মিলিত বিপুল জনশক্তি এবং সম্পদের সঙ্গে ওরা এঁটে উঠতে পারলো না। আফ্রিকার অন্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য বা সমর্থন ওরা পেলো না। আফ্রিকার মাত্র চারটি দেশ ওদের আলাদা দেশ হিসাবে স্বীকার করলো—জাম্বিয়া, টানজানিয়া, গ্যাবোন ও আইভরী কোষ্ট। আর সমর্থন করলো দক্ষিণ আফ্রিকা, পতগাল, দক্ষিণ রোডেশিয়া। শেষের তিনটি দেশের সমর্থন বুঝিয়ে দিলো স্বাধীন বিয়াফ্রার চরিত্র কি হবে। বাকি আফ্রিকান দেশগুলোর পূর্ণ সমর্থন পেলো ফেডারেল সরকার। ওরাও চায়নি বিচ্ছিন্নতাপন্থীরা জিতুক, কেননা আফ্রিকার প্রায় সব দেশেই অল্প-বিস্তর এই সমস্যা আছে।

শুধু রাজনৈতিক সমর্থনে যুদ্ধ জেতা যায় না। ফেডারেল সরকারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এলো সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে। যতো দিন গেল আরো কামান, বিমান আর গাড়ী ওরা পেলো। যেখানে রাস্তাঘাট ছিলো না সেখানে রাস্তা হলো, সেতু হলো, জেনারেল গাওয়ানের সৈন্যবাহিনী সংঘবদ্ধ হলো। যুদ্ধের শুরুতে ফেডারেল সৈন্য ছিলো মাত্র সাত হাজার—যুদ্ধ শেষে প্রায় দুই লক্ষ।

সন্দেহ নেই, বিয়াফ্রার পিছনে মার্কিনী সমর্থন ছিল—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দিতে ওদের চক্ষুলজ্জায় বেধেছে। ওরা তাই গৃহযুদ্ধের পুরো সময়টা নিরপেক্ষতার ভেক ধরে বসে থাকলো। সাহায্য গেল নানা সূত্র থেকে—টোগোল্যাণ্ড হয়ে, ক্যামেরুন হয়ে কখনো 'মানবিক সাহায্যে'র নামে, যেমন ফরাসী সাহায্যের বেলায়। আর এলো বেশ কিছু মারসিনারি, যেমন প্রিন্স কার্ল গুস্তাভ ভন রোসেন, সুইডিশ রাজপরিবারের একজন, দক্ষ পাইলট, যিনি এর আগে

ইথিওপিয়ার বিমানবাহিনীকেও সাহায্য করেছেন। বৃটিশরা আনুষ্ঠানিকভাবে ছিলো ফেডারেল সরকারের পক্ষে, কিন্তু ওদের ভাবসাব দেখে মনে হয় নি সেটা ওদের মনোগত ইচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ফেডারেল সৈন্য বিয়াফ্রায় ঢুকল। একবার টেলিভিশনের পর্দায় আমরা দেখলাম একজন ফেডারেল ক্যাপ্টেন নিজের হাতে গুলি করে একজন বিয়াফ্রার বন্দীকে হত্যা করল। সেই দেখে ওপরে রোজ অনোউজুর ঘর থেকে কান্নার রোল উঠল। আমরা ওপরে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলাম, আমাদের ঘরে নিয়ে এসে যত্ন করে খাওয়ালাম।

যুদ্ধের শেষের দিকে প্রতিদিনই বিয়াফ্রার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল অনেকখানি করে ছোট হতে লাগলো। এবং যতোই ফেডারেল সৈন্য এগিয়ে গেল তাতোই পোঁটলা-পুঁটলী সমস্ত সম্পদ নিয়ে পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে মানুষ পিছিয়ে আরও ছোট জায়গায় আশ্রয় চাইলো। উৎপাদন কমলো কিন্তু অল্প জায়গায় মানুষ প্রচণ্ডভাবে বাড়লো। এর অনিবার্য ফল হলো দুর্ভিক্ষ। কয়েক লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গেল। বিয়াফ্রা হয়ে দাঁড়ালো অস্থিচর্মসার লক্ষ লক্ষ কঙ্কালের আশ্রয়। বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাবে একটি প্রগতিশীল, শিক্ষিত, উদ্যোগী সমাজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

১৯৭০ সালের ৬ই জানুয়ারী, সাড়ে তিন বছর পর, যুদ্ধ শেষ হলো, যখন ওয়েরি শহর ফেডারেল সৈন্য দখল করলো এবং ওজুকু পালালেন। ওজুকু কোথায় গেলেন কেউ জানে না। সম্ভবতঃ মৃত। দু পক্ষে কজন মারা গেল তার কোন সঠিক সংখ্যা নেই,তবে সবাই একমত যে অন্তত দশ থেকে কুড়ি লক্ষ। যারা পঙ্গু হলো, যারা বাস্তচ্যুত হলো, তাদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। আমাদের মনে প্রশ্ন থাকলো : গৃহযুদ্ধের এই গভীর ক্ষত কি শুকোতে পারে?

শুকলো শেষ অবধি। এবং সেই জন্য কৃতিত্বের এক বড় দাবিদার জেনারেল গাওয়ান। তিনি যুদ্ধ জিতেও বললেন জাতীয় সংহতির কথা, ক্ষমা করলেন, ক্ষমা চাইলেন। যুদ্ধে হারলেও ইবোরা অপমানিত হল না। ঐক্যবদ্ধ নাইজিরিয়ার নাগরিক হিশেবে পূর্ণ স্বীকৃতি ওদের মিলল। এই যুদ্ধ যেমন দুঃখের, যুদ্ধ-পরবর্তী এই সংহতি তেমনই আনন্দের।

ইবাদানের ফ্যাকাল্টি ক্লাবের কোনো কোনো সন্ধ্যায় এই প্রসঙ্গ তুলেছি। সেখানে ইবো, ইউরুবা, হাউসা, মুসলমান, খ্রীস্টান এ্যানিমিস্ট সবাই হাজির ততদিনে ওরা আমাকে জেনে গিয়েছে।আলোচনায় আপত্তি নেই। ওরা সবাই বলল, সমস্যাটা বৃটিশদেরই তৈরি।

রবার্টসই বলল, "দ্যাখো, বৃটিশরা আসার আগে ছিল রাজ্য বা সাম্রাজ্য। আধুনিক রাষ্ট্র যাকে বলে সেটা ছিল না। আজকের নাইজিরিয়া ছিল অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত। ওরা এসে জবরদস্তি করে জোড়াতালি দিয়ে একটা দেশ তৈরি করল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে তো আমরা এক ছিলাম না।"

তারপর আর এক গ্লাসে গলা ভিজিয়ে বলল, "এই যে দেখো বৃটিশরা, ফ্রেঞ্চরা, জার্মানরা নিজের নিজের মতো সবকিছু ভাগ করে নিল, দেশ হল, দেশগুলোর সীমান্ত তৈরি হল, চেক-পোস্ট বসল, ইমিগ্রেসন, কাস্টমস হল—এর কি মানে আছে? ফুলানিরা কোথায় নেই বলো? সেনেগাল, মালী, নিজের নাইজিরিয়ার—এতগুলো দেশে ওরা ছড়িয়ে। হাউসার বড় ভাগ দুটো দেশে—নাইজিরিয়া আর নিজের। আরো কত জাতি, পশ্চিম আফ্রিকার বহু দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেশ আর জাতি মিলছে না। এক একটা দেশে অসংখ্য জাতি, তারা যেমন সেই দেশের নাগরিক, তেমনি একটা জাতিগত সত্তাও ওদের রয়েছে। তুমি কী করবে এই অবস্থায়?

মাবোগুঞ্জে বলে, "গত একশো বছরে সমস্যা আরো জটিল হয়েছে। প্রবণতা হচ্ছে মানুষের ঘাসের বন ছেড়ে উপকূল বা জঙ্গলের দিকে যাবার। সেখানে শিল্প হচ্ছে, কোকো, পাম তেলে,

বাদামের বাগিচায় কাজ আছে, সেখানে শহর বড় হচ্ছে। এই হচ্ছে প্রবণতা। এর ফলে জাতিগুলো মিশছে। সেটা হয়তো দীর্ঘমেয়াদি বিচারে ভালো, কিন্তু আপাতত নানা-সমস্যা তৈরি করছে। শহরেও জাতি ধরে ধরে পাড়া বা অঞ্চল ভাগ হচ্ছে।"

সমাধান কী?

সীমান্ত নতুন করে তৈরি করা?

"সেটা সম্ভব নয়।" রবার্টস বলে, "সীমানা সমস্যা সাপুড়ের ঝাঁপি। যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই ভালো। ঠিক হোক ভুল হোক, বৃটিশরা করুক বা যেভাবেই হোক, কতোগুলো দেশ তৈরি হয়েছে। একবার যদি এই প্রশ্ন ওঠে, দেশ ভাঙতে ভাঙতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নেই। তখন হয়তো দেখবে একশোটা নাইজিরিয়া তৈরি হয়েছে। তার থেকে সমস্ত ঝামেলা নিয়েও, যেমন সীমান্ত আছে তেমনই থাক। পাল্টাতে গেলে ঝাঁপি থেকে কোন কালনাগিণী বেরিয়ে আসবে তার ঠিক নেই। এক নাগিণী বেরিয়েছিল, তাকে আবার ঝাঁপিতে ফেরৎ পাঠিয়েছি। আর না।"

ঠিকই। সভ্যতার পথ মসৃণ নয়। ঝামেলা থাকবেই, কিন্তু যত যোগাযোগ বাড়ছে, শিল্প তৈরি হচ্ছে, মানুষ মিশছে, তত এক নতুন, বৃহত্তর, জাতিগত সত্তা—নাইজিরিয়ান সত্তা—জন্ম নিচ্ছে। সেই সত্তা দেখেছি লেগোসেব বন্দরে, ইবাদানের শিল্প অঞ্চলে, শ্রমিক আন্দোলনের প্লাটফর্মে। কাজ বাড়ুক, শিল্প বাড়ুক, মানুষ ছড়িয়ে পড়ুক, দূর দূরান্তে যাক, নতুন নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে হোঁচট খাক—সেটাই একমাত্র পথ।

"তবে ফেডারেল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে।" মাবোগুঞ্জে বলে, "ওরা যেন শুধু নিজেদের মুসলমান বা হাউসা-ফুলানি না ভাবে। ওরা যেন স্টিমরোলার না চালায। জাতিগত ধর্মগত চেতনা একদিনে যাবে না। সময দিতে হবে। সমস্ত ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতের মুঠোয় রাখলে চলবে না।"

সেই আলোচনার পর নাইজার নদী বেয়ে অনেক জল, পাথর, বালি আর পাঁক নিচে নেমেছে। ইয়াকুবু গাওয়ান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, ওর নামে রাস্তা পাল্টে হয়েছে ব্রড স্ট্রিট, তেলের টাকায় দেশ ভেসেছে। দুর্নীতিও বেড়েছে। এসব কাগজে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি। এর পর আর নাইজিরিয়া যাই নি।

যখন ক্ষমতা হস্তান্তর হল গাওয়ান তখন বিদেশে। তিনি গেলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন। তারপর এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলেন।

একদিন ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখল, তাদের রেস্তোঁরায় অন্যদের সঙ্গে ট্রে হাতে খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে এমন একজন কালো মানুষ যার ছবি তোলবার জন্য সমস্ত পৃথিবীর টেলিভিশন ক্রু ভিড় করেছে। গাওয়ান ছাত্র হলেন। যে গাওয়ান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত পি-এইচ-ডি।

নাইজিরিয়ার নতুন সরকারের কাছে গাওয়ান দুচোখের বিষ। কিন্তু ওদের চোখে এটা খারাপ লাগল। ওরা গোপনীয় চিঠি পাঠালো গাওয়ানের কাছে। বলল, "তোমার কী দরকার বলো, আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই তোমার, ছাত্র হয়ো না। একজন এত বড় দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়ক এইভাবে ছাত্র হয়ে ট্রে হাতে ঘুরে বেড়াবে সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।"

গাওয়ান শুনলেন না। সম্মানিত আনুষ্ঠানিক পি-এইচ-ডি নয়, আসল পি-এইচ-ডি শেষ অবধি হলেন।

গাওয়ানকে সরতে হলো কেন? কারণ, বোধহয়, যা এনো লেগোসের দ্বীপমালায় হাঁটতে হাঁটতে বলছিল—দুর্নীতি এবং বেকার সমস্যা। গাওয়ান যুদ্ধ জিতলেন, দেশকে ঐক্যবদ্ধ

করলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা মেটাতে পারলেন না। নাইজিরিয়ায় কেউই সেটা পারে নি, গাওয়ানের আগে বা পরে।

গাওয়ানের পরে যিনি রাষ্ট্রনায়ক হলেন, ব্রিগেডিয়ার মুর্তালা মোহাম্মেদ, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। গৃহযুদ্ধের পর ১৯৭৩ সালের আদমসুমারীতে দেখানো হলো, মোট জনসংখ্যার চৌষট্টি ভাগই উত্তরের, এবং সেই নিয়ে আবার পরিসংখ্যানের আঞ্চলিক রাজনীতি শুরু হতে চলেছিল—মুর্তালা সেই ১৯৭৩ সালের হিসাব খারিজ করলেন। তারপর নাইজিরিয়াকে আরো ভাগ করলেন, বারোটা থেকে উনিশটা রাজ্যে। উত্তরে হলো নটি রাজ্য, পশ্চিমে হলো তিনটে, পূর্বে চারটি, মধ্য-পশ্চিম দুটো, সঙ্গে লেগোস। সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, উত্তরের নটি রাজ্যের মধ্যে মাত্র তিনটিতে হাউসা-ফুলানিদের সংখ্যাধিক্য থাকলো। আরো সাহসের পরিচয় দিলেন এক লক্ষ সৈন্যকে ছাড়িয়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে, এ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক-ভাবাপন্ন কেন্দ্রীয় নেটো সরকারকে সমর্থন জানিয়ে। চেষ্টা হলো সত্যি সত্যি নাইজিরিয়ান জাতি সত্তা তৈরীর।

পরিণামে প্রাণ দিতে হলো। মাত্র সাত মাসের মধ্যে, ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন। এই হত্যার পর সমস্ত দেশে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ সংঘটিত হলো তা থেকে বুঝি অল্পদিনেও মুর্তালা কম জনপ্রিয় হননি। এবং মুর্তালার পর রাষ্ট্রনায়ক হলেন মুর্তালারই সহযোদ্ধা একজন ইউরুবা, যাকে উত্তরের লোক মেনে নিল—নাম ওবাসাঙ্গো।

কয়েক বছর পর, যেটা সত্যি দেখবার মতো, ওবাসাঙ্গো স্বেচ্ছায়—১৯৭৯সালে রাষ্ট্রের শাসনভার ছেড়ে দিলেন। নতুন করে নির্বাচন হলো, এবং রাষ্ট্রপতি হলেন উত্তরের আলহাজি সেগু সাগারি। আবার গণতন্ত্র ফিরে এলো। মনে হলো নাইজিরিয়ার জাতীয় সংহতি এখন নিরাপদ। কিন্তু সেই আশা সাময়িক—আবার সামরিক শক্তি ক্ষমতা দখল করলো। মাঝে ব্যর্থ চেষ্টা হলো গাওয়ানেব সমর্থনে অভ্যুত্থানের। এই লেখা শেষ করবার সময় কাগজে দেখলাম সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের কাহিনী।

সেই সব পরে ঘটেছে। ১৯৭৪ সালের নাইজিরিয়া আর এখনকার নাইজিরিয়া নিশ্চয়ই এক নয়।

রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে রোজের কথা বলা হলো না। পোর্ট হারকোর্টের রোজ যেন লণ্ডনের রোজ নয়, যেমন লণ্ডনের আর কানোর ওউডু বেশ খানিকটা আলাদা। তফাৎটা আরো চেখে পড়ে গৃহযুদ্ধের আলোচনায়। লণ্ডনের রোজের আলোচনার এক বড় ভাগই ছিল বিয়াফ্রা। ও আর মাইক বিয়াফ্রা নিয়ে ছাপানো প্রচারপত্র বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিতো, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে খামে ভরে ডাকে পাঠাবার চেষ্টা করতো, টাকা তুলতো। পোর্ট হারকোর্টের রোজকে দিয়ে গৃহযুদ্ধ নিয়ে আলোচনাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

"তুমি কি ফিরে এসে খুশী?"

"নিশ্চয়ই। এতো আমারই দেশ।"

"গৃহযুদ্ধের ক্ষত কি এখনও শুকিয়েছে? না মানুষের মনে এখনও ক্ষোভ রয়েছে?"

"এসব নিয়ে এখন আর ভাবি না। বিয়াফ্রা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিছু করবার নেই।"

রোজ আর কিছু বলে না, না বলাই স্বাভাবিক। বিয়াফ্রার সঙ্গে মাইকের স্মৃতি জড়িত। মাইক কোথায়?

কিন্তু রোজকে অসুখী মনে হয় না। ও বলে, "আমি এখন পুরো দস্তুর প্রফেশনাল।

কম্পিটেন্ট সেক্রেটারী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছি। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকি। তাছাড়া এখানে আমাদের প্রচুর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সব সময়ই কেউ না কেউ আসছে যাচ্ছে, গল্প করেই অবসর সময় কেটে যায়।"

রোজের বাড়ী শহরের অভিজাত এলাকায়। ওর বাবা উকিল। বাড়ীর সামনে ছোট্ট লন। বাড়ীর মধ্যে ইউরোপীয় কায়দায় সবকিছু সাজানো। রোজের বাবার পোষাক কথা সবই ইউরোপীয় মাপে। উনি মুখ খুললেন।

"আপনিও কি বিয়াফ্রার পক্ষে ছিলেন ?" জিগ্যেস করি।

"কে ছিলো না ?" পাইপের মুখে একটা লোহার কাঠি দিয়ে খোঁচাখুচি করতে করতে বললেন, "আমরা সবাই ছিলাম স্বাধীন বিয়াফ্রার নাগরিক। বিয়াফ্রাই ছিলো আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। ওই কটা বছর বিয়াফ্রা ছাড়া অন্য কিছু ভাবি নি।"

"বিয়াফ্রা কি আলাদাভাবে বাঁচতে পারতো ?"

"কেন নয় ? আফ্রিকার বহু দেশের থেকেই বিয়াফ্রার লোকসংখ্যা বেশী ছিলো। দেড় কোটির মতো—ঘানার লোকের থেকে বেশী। তারপর উত্তরের মতো ভূখণ্ডে বাঁধা নয়, সমুদ্রের পাড়েই। অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমাদের রয়েছে। তেল তখন আমাদের ভাগ করে নিতে হতো না, সবটাই পেতাম আমরা—আফ্রিকার সবচেয়ে বড়লোক দেশ হতাম আমরাই। শুধু কি তেল ? আমাদের এখানে পাম তেল আছে, নারকেল আছে, নানারকমের অরণ্য সম্পদ আছে, আর কি চাই বলুন। সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।" রোজের বাবার দীর্ঘশ্বাস শুনলাম।

"কিন্তু ইবিবিওরা যদি একই কথা বলতো ? বলতো পূর্বাঞ্চল ভেঙে ওদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হোক, তেল, অরণ্য সম্পদ সবই থাকতো ওদের—আপনাদের সঙ্গেও ভাগ করতে হতো না।"

"সেটা কেন হবে ? ওরা তো খুবই ছোট।"

"কেন হবে না ?" আমি বলি, "ধরুন কুয়াইৎ, বাহরিন, আবুধাবির কথা। ওরা যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে ইবিবিওরা ও পারে। ইবোদেরও বা ভাগ দেবে কেন ?"

রোজের বাবা আমার যুক্তিটা বোঝেন। পাইপে টান দিয়ে বলেন, "দেখুন এসব কথা উঠতোই না যদি না জুলাই মাসের অভ্যুত্থানে জেনারেল ইরোনসি এবং অন্য ইবো নেতারা মারা যেতেন। জানুয়ারীর অভ্যুত্থানের পর ইবোরা ছিল তুঙ্গে। আমরা ভেবেছিলাম, ভুল করেই ভেবেছিলাম, নাইজিরিয়ার নেতৃত্ব আমাদেরই হাতে। আমরা শিক্ষিত, উদ্যোগী, আধুনিক, নাইজিরিয়া আমাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে। জুলাই মাসের ক্যুতে সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমরা যারা নাইজিরিয়ার ঐক্য চেয়েছি তারাই এখন চাইলাম বেরিয়ে আসতে।"

তারপর পাইপটা টেবিলে ঠুকে ছাই ট্রেতে ফেলে বললেন, "সেপ্টেম্বরের দাঙ্গার পর সবচেয়ে বড় হয়ে উঠলো ভয়। পূর্বাঞ্চলের খুব কম পরিবারই আছে যাদের কেউ না কেউ ওই দাঙ্গায় মারা যায় নি। আমাদেরও গ্রামের কিছু আত্মীয় মারা গেল। রোজ দুবেলা কান্নার রোল উঠতো। তারপর আসতে শুরু করলো উদ্বাস্তুরা—সহায় নেই সম্বল নেই ভীতত্রস্ত মানুষগুলো। যে মানুষগুলো সেদিনও মাথা উঁচু করে গর্ব করে সমস্ত নাইজিরিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা রিলিফ কমিটি করলাম, টাকা তুললাম, আশ্রয় শিবির হলো, ওদের খাবার দিলাম থাকতে দিলাম। আমার এই বাড়ীতেই তখন কত লোক ! আমরা ধরে নিলাম নাইজিরিয়ায় আমাদের স্থান নেই, ওরা আমাদের চায় না। ওরা আমাদের শত্রু অর্থনীতির কথা তখন মাথায় আসেনি। কর্ণেল ওজুকু আমাদের আশা দিলেন। আমরা ধরে নিলাম মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াবে। বলতে পারেন, আমাদের চিন্তাটা ছিল তখন বেপরোয়া।"

রোজের বাবা বলেই চলেন, "যুদ্ধ যখন শেষ হতে চললো তখন মনে হলো সমস্ত আকাশটা যেন মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ছে। রোজই শুনি ফেডারেল সৈন্য আসছে। দলে দলে মানুষ চারপাশের অঞ্চল ছেড়ে এদিকে এলো। শুনলাম ফেডারেল সৈন্যরা সবকিছু জ্বালিয়ে দিচ্ছে, প্রতিটি মানুষ—শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা কারোকে বাঁচতে দিচ্ছে না। মেয়েদের ধর্ষণ করছে। মারবার আগে নানারকম যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন যা মনের অবস্থা—কতোটা সত্য কতোটা মিথ্যে সেই বিচার করা সম্ভব ছিল না। বরং ঝোঁকটা ছিল সবকিছু খারাপ বিশ্বাস করবার দিকে। এই যুদ্ধ তাই হয়ে দাঁড়ালো বেঁচে থাকার যুদ্ধ। রোজ সকালে জানলা দিয়ে রাস্তার ওপাশে বসে থাকা হাড় জিরজিরে মাথা-সর্বস্ব কঙ্কাল বাচ্চাগুলোকে দেখতাম, আর ভগবানকে বলতাম, তুমি আমাদের কেন এই শাস্তি দিলে! ইবোরা কি ছিলো কি হলো।

"তারপর?"

"ফেডারেল সৈন্য যেদিন শহরে ঢুকলো সেদিন দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি দরজায় ধাক্কা দেবে, লাথি আর বন্দুকের গুঁতোয় দরজা ভাঙবে, আমাদের মেয়েদের সম্মান রাখবে না। আমি গুলীভর্তি বন্দুক হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে ছিলাম। ওরা ঢুকবার আগেই বাড়ীর সবাইকে নিজের হাতে মেরে তারপর নিজে মরতাম।"

"এখন কি ভাবছেন?"

রোজের বাবা হাসেন, "এখন এসব আর ভাবি না। আপনি জিগ্যেস করলেন বলে মনে হলো, তাই বললাম। পূর্বাঞ্চলের মানুষ তো সত্যি সত্যি আলাদা হতে চায় নি। দেখুন না কতো ইবো দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। গৃহযুদ্ধটা যেন এক দীর্ঘদিনের জ্বর—সেই জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। এখন অন্য আরও দশ রকমের নতুন সমস্যা তৈরী হয়েছে—ও কথা তাই ভাবিই না।"

॥ আট ॥

এয়ারপোর্টে এনো হাউ হাউ করে কাঁদল। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "ক্যাডিলাকে ডানা লাগিয়ে উড়ে চলে এসো লণ্ডনে। মাঝে মাঝে দেখা হলে খুব ভালো লাগবে। আমার গাড়িটাও প্রায়ই গণ্ডগোল করছে। তোমাকে আমার খুব দরকার।"

এনো চোখের জল মুছে বলল, "তুমি নাইজিরিয়ার কিছুই দ্যাখোনি। আসল দেখা হতো যদি গ্রামে গিয়ে আমার বাবা-মা-ভাইদের সঙ্গে থাকতে। ইবাদান লেগোস বেনিন-এ সবই হচ্ছে কড়াইয়ের ওপরের সরটা। পরের বার যখন আসবে তখন সোজা গ্রামে নিয়ে যাব।"

এর আগে পোর্ট হারকোর্টে রোজ অনোউজু জানিয়েছে ওর বিয়ে হবে। বিয়ের পর হয়তো ও লেগোসে আসবে।

"ভাগ্যবান পুরুষটি কোথাকার?" জিগ্যেস করি।

রোজ মাথার স্কার্ফটা ঠিক করতে করতে সলজ্জ হেসে বলে, "ওটা একটা শয়তান, জানোয়ার।"

"জানোয়ার তো বটেই। সব পুরুষই জানোয়ার। কিন্তু কোথাকার?"

রোজ মাথা নিচু করে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলে, "বদমাসটা ফুলানি। উত্তরের লোক। গৃহযুদ্ধের সময় ফেডারেল সৈন্যের সঙ্গে বিয়াফ্রা ঢুকেছিল। যুদ্ধের পর সৈন্যবাহিনী ছেড়ে পোর্ট হারকোর্টেই থেকে গেল।"

"তারপর?" জিগ্যেস করি।

"তারপর আর কী? আমার সর্বনাশ করল। ওর চোখে যে কী দেখলাম! বাঁদরগুলো যেমন সাপের চোখের দিকে তাকিয়ে অবশ, সম্মোহিত হয়ে যায়, আমিও তাই হলাম। ও বর্বর, যাযাবর, আমরা চাষী সমাজ। ও ঘাসের বনের মানুষ, আমরা জঙ্গলের আর উপকূলের। ও রোজ নিয়ম করে পাঁচবার আল্লা আল্লা করবেই—যেটা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আপনিই বলুন, মুসলমান আর খ্রীস্টান কি বিয়ে হওয়া উচিত? তাবপর ও হল মার্ডারার, খুনী—আমাদের বিয়াফ্রার শত্রু। তবু—"

"তবু কী?"

"তবু কী যে হল ওকেই ভালোবাসলাম। এখন বিয়ে করছি। জানোয়ারটা আমায় গিলে ফেলেছে।"

রোজ বলে আর মিষ্টি হাসে।

ওর গালে আলতো চুমু খেয়ে বললাম, "ভালো থেকো। ওই জানোয়ারটাই তোমার আসল শান্তি। আমি খুশি যে তোমার মতো বন্য মেয়েকে ও পোষ মানিয়েছে।"

কয়েক বছর পর রোজের কার্ড পেলাম। ওর ছেলে হয়েছে। নতুন নাইজিরিয়ার সন্তান। সেই সন্তান ফুলানি নয়, ইবো নয়। খ্রীস্টান নয় মুসলমান নয়। সেই সন্তানের জাত একটাই। সমস্ত জাত আর ধর্ম গলে পুড়ে এক নতুন প্রজন্ম। আমি সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। □

ঘানাসুন্দরী কোকো ও সেট সি মাছি

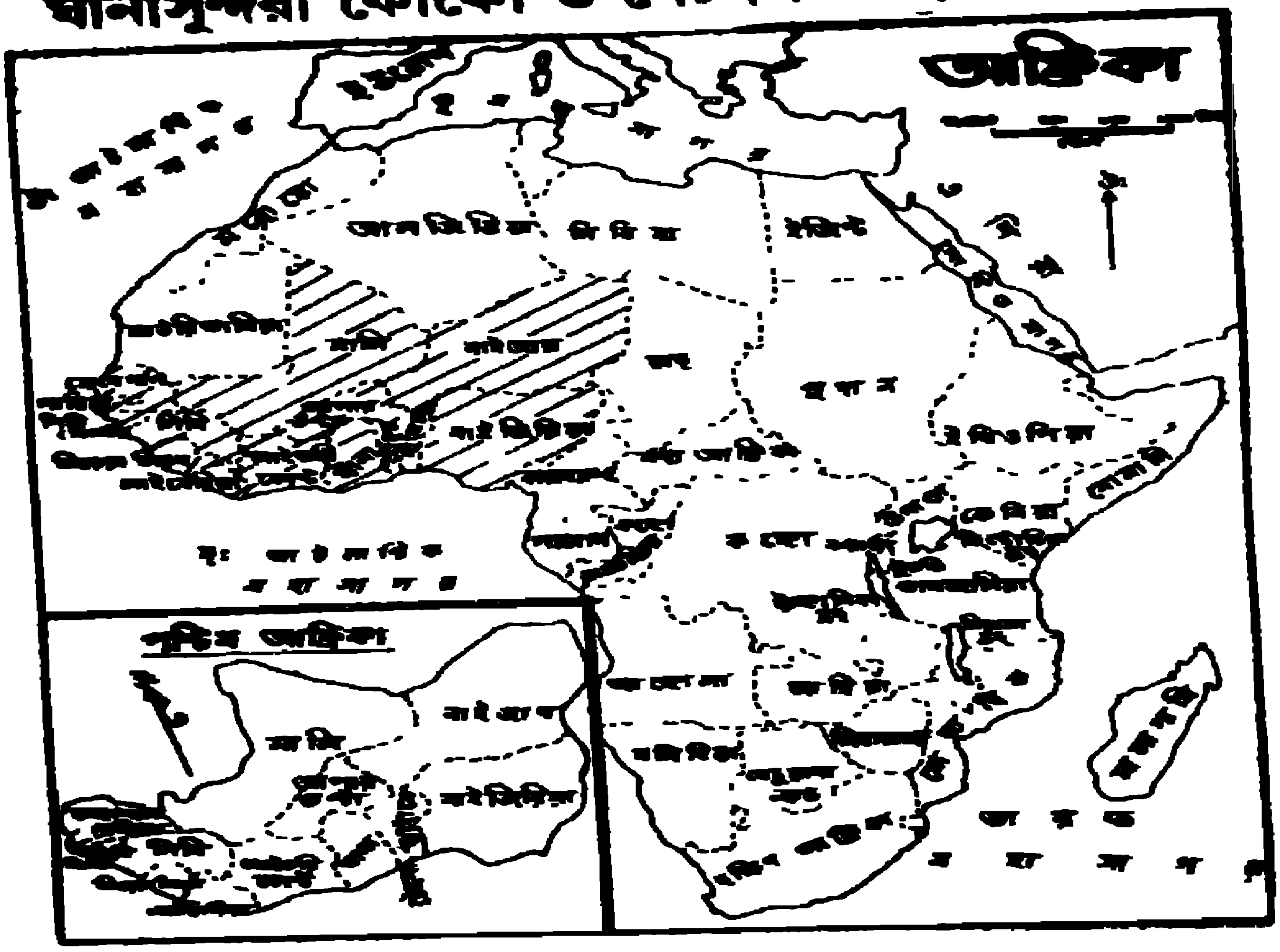

॥ এক ॥

দুবার ঘানা গেলাম, দুবারই অল্প সময়ের জন্য। একবার গেলাম সেনেগাল যাবার পথে, আর একবার আইভরী কোষ্ট হয়ে। একবার আরতি সঙ্গে ছিল, আরেকবার একা। দুবারই ফাউ, অন্য দেশটাই মুখ্য। তবু, অল্প সময় হলেও, আমার সঙ্গীরা ভালো ছিল—যারা ঘানা জানে, দেশটার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সব বলতে পারে। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী—সেই গাড়ীতে পেট্রোল থাকলে, শরীরে দম থাকলে, অল্প সময়েও অনেক ঘোরা যায়। মূল প্রশ্ন হলো, কেন যাওয়া, কি দেখতে !

দেশভ্রমণের দুটো মডেল চোখে পড়ে। একটা বৃটিশ একটা আমেরিকান। বৃটিশ কায়দা হলো ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে আনা ব্রোসিওরগুলো আদ্যোপান্ত দেখে যে কোন একটা জায়গা ঠিক করা। মরক্কো, জিব্রলটার, মাল্টা বা স্পেন সাধারণতঃ ওদের পছন্দ। এই দেশগুলো পছন্দের দুটো মূল কারণ—রোদ্দুর বেশী, পয়সা কম। ধরনটা হলো হোটেল বুক করে যাওয়া, এক থেকে চার সপ্তাহের জন্য। একই হোটেলে ওরা থাকবে, রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে সমুদ্র সৈকতে ভাড়া করা চেয়ার নিয়ে বসবে—সারাদিন কাটিয়ে রাতে ফিরবে। আবার পরের দিন। উদ্দেশ্য হলো সমুদ্রের হাওয়া গেলা, রোদ্দুর শরীরে মাখা, স্নান করে ভিজে গায়ে বালিতে গড়াগড়ি দেয়া, কখনো সখনো ওই যায়গাটা কেন্দ্র করে দু একটা এখানে ওখানে ডে ট্রিপ—ভোরে যাও, সন্ধ্যার আগেই হোটেলে ফেরো। খুব বেশী একটা দেখাদেখির মধ্যে নেই, দেশ জানবার আগ্রহ নেই, ওখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপে ব্যগ্রতা নেই। মোট কথা বিশ্রাম সমুদ্র সূর্য। গায়ের রঙে কেমন একটু কালচে ছোপ—ট্যান্ড হয়েছি, সেইটাই বড় কথা। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়রা ওইটাই চোখ বড় করে দেখবে।

আরতি মাঝে মাঝে বলে, "আর পারি না ঘটর ঘটর করে এখানে ছোটো ওখানে ছোটো করতে। আচ্ছা তোমার কি মাঝেমধ্যে একটা জায়গায় মাস্তুল গুটিয়ে দিনের পর দিন কাটাতে ভালো লাগে না ? ওই দ্যাখো কেমন সামনের ওই মহিলা সারা গায়ে তেল মেখে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে আছেন। কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, 'রাশ' নেই। পরের বার চলো ওইভাবে কোথাও গিয়ে কদিন থাকি।"

আমি বলি, "পাগল হয়েছো ! দিনের পর দিন ওইভাবে একই জায়গায় বসে একই দৃশ্য দেখলে আমি পাগল হয়ে যাবো। ওই দেখার কি মানে বলো ? বেড়াতেই যদি গেল তাহলে এক যায়গায় বসে থাকা কেন ? তুমি যদি এই ব্যাপারে বৃটিশ হতে চাও, অন্য কোন সঙ্গী খোঁজো। আমি তোমার ত্রিসীমানায় যাবো না।"

আর একটা, ঠিক উল্টো, মডেল আমেরিকান। ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য কত অল্প সময়ে কত বেশী দেশ দেখা যায়। পাশপোর্টে কটা দেশের ছাপ সেটাই বড় কথা। কেউ কেউ দেয়ালের মানচিত্রে মোটা লাল আলপিন লাগিয়ে দেখান কটা শহর বা দেশ দেখেছেন। "দিস টাইম আই

উইল ডু রিড টোকিও আলেকজান্ড্রিয়া" ওরা বলবে। 'ডু' করলেই হলো—দেখাটা যেভাবেই হোক।

ইউরোপে বেড়াতে বেরুলে প্রায়ই ওই দৃশ্য চোখে পড়ে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। প্যাকেজ ট্যুরের কল্যাণে প্রচুর অবসর প্রাপ্ত মার্কিনী বৃদ্ধ বৃদ্ধা বেড়াতে বেরোন, বয়স ষাট থেকে নব্বুই। ওদের সময়ের শতকরা আশিভাগ হোটেলে-এয়ারপোর্টে প্লেনে বা টুরিস্ট কোচে যায়। এক শহর শেষ করার আগেই পরের শহরের চিন্তা—মাঝে আবার ব্রেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনার সব ঠিক ঠিক চাই। সঙ্গে গাইড থাকে, যারা নানা ভাষায় কথা বলে। যায় মিউজিয়মে, আর্ট গ্যালারিতে, রাজার বাড়ীতে, কোন টাওয়ার বা মনুমেণ্টে। আইফেল টাওয়ার, লিনিং টাওয়ার অফ পিশা, লণ্ডনের পোষ্টাল টাওয়ার, টাওয়ার অফ লণ্ডন। লোকের ভীড়ে গাইড তাঁর ছাতাটা উঁচু করে হাঁটে, সেই দেখে ওই দলের সবাই পিছুপিছু এক সঙ্গে চলে। গাইড বলে, ওই হলো গোয়য়ার সেই বিখ্যাত ছবি। তারপরই দা ভিঞ্চি, তারপরই বটিচেলি, তারপরই মনে বা রেমব্রান্ট। যাদের জন্য বলা তারা বিরস বদনে দেখে এবং শোনে। এদের কাছে সব সমান। অনেকে কান থেকে হিয়ারিং এইড খুলে অপেক্ষা করে কতক্ষণে এক ঘর শেষ করে গাইড অন্য ঘরে ঢুকবে। ল্যুভরেব জন্য বরাদ্দ বিয়াল্লিশ মিনিট, উফিৎজি গ্যালারির জন্য পঁচিশ মিনিট যথেষ্ট, বৃটিশ মিউজিয়াম চল্লিশ মিনিটে শেষ করতে হবে। ঘড়ি ধরে ঘোরা। যা দরকার সেটা তো হলো। ওরা ফিরে গিয়ে বলতে পারবে কোন কোন মিউজিয়মে গেল, কাব ছবি দেখলো—ছবিটা ভালো করে না দেখলেও চলে। কোচে উঠবার আগে গাইড ভালো করে গুণে নেন সবাইকে, তারপর গাড়ী ছাড়ে। গাইড যেন মেষপালক।

এই প্যাকেজ ট্যুবেব অবশ্য একটা ভালো দিক আছে। আগে বেড়ানোটা ছিল বড়লোকদের ব্যাপার—সমুদ্র সৈকত, পাহাড়ী বিউটি স্পট ছিল নির্জন। এখন শস্তায় শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, গ্রামের চাষীও ঘুরে আসে। বছরের একবার দু এক সপ্তাহের জন্য বেরিয়ে আসাটা শিল্পোন্নত সব দেশেই সংস্কৃতিব একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রচুর মানুষ যায়, গ্রীষ্মকালে সুন্দর জায়গাগুলো ছেয়ে যায় মানুষে। এতে বড়লোকদের রাগ হয়—ওরা নির্জনতা পায় না। কিন্তু প্রচুর মানুষ আনন্দ পায়। আমাদের দেশেও এই প্রবণতা বাড়ছে।

প্যাকেজ ট্যুর নিয়ে পাশ্চাত্যে রঙ্গ রসিকতা কম হয়না। প্রচুর গল্প, নাটক, সিনেমাতে ওটাই রসালো বিষয়। প্লেনে কোচে কোথাও পৌঁছে হয়তো দেখা গেল যে হোটেলে বুকিং সেই হোটেল এখনও পুরো তৈরী হয়নি। হলেও সব কিছুর গণ্ডগোল। টেলিফোন কানে দিলে জলের ফোয়ারা আসে, সাওয়ারের নল দিয়ে কেউ বলে 'হ্যালো', সেক্রেটারীকে বউ সাজিয়ে আনা স্বামীর পাশের ঘরেই বন্ধু আর তার আসল বউ। এই যে এত গল্প ঠাট্টা তার মানেই ঘোরাঘুরিটা খুব জনপ্রিয়।

এ সবই অবশ্য বিবাহিত বা মধ্যবয়সীদের কথা। আঠারো থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়েদের বেড়ানোটা ইউরোপে অন্যরকম। ওরা প্যাকেজ ট্যুরের ধার ধারে না, পিঠে বিরাট ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়ী থামায়—হিচ হাইক করে সমস্ত পৃথিবী ঘোরে। সঙ্গে থাকে ম্যাপ, ইউরোপের সবদেশের অসংখ্য ইউথ হস্টেলের ঠিকানার বই। এক শহর থেকে আরেক শহর এইভাবে ঘোরে। পয়সা ফুরিয়ে গেলে বাড়ীতে ফোন করে টাকা আনায় বা যেখানে আছে সেখানেই কিছুদিন কাজ করে টাকা জমায়। গ্রীষ্মকালে কাজের অভাব থাকে না, গ্রামেও নয় শহরেও নয়। গ্রামে অলিভ পিকিং থেকে শুরু করে কৃষিকাজের লোকের দরকার থাকে। শহরে আর কিছু না পেলেও রেস্টুরেণ্টে কাজ পাওয়া যায়। ছাত্রদের কোন শ্রেনী চেতনা নেই, ওরা যা পায় তাই করে।

ছাত্র অবস্থায় আমি আর আরতিও এইভাবে ইউরোপ চষেছি। হিচ-হাইকিংটা ঠিক রপ্ত হয়নি। টিকিট করে ট্রেনে, কোচে, প্লেনে বা জাহাজে গিয়েছি। যেখানেই যাই ইউথ হস্টেল খুঁজে বের করে সেখানে থেকেছি। থাকার ব্যবস্থাটায় ছেলে আর মেয়ে আলাদা। ঘরে দোতলা শয্যা, ট্রেনের মতো। কিন্তু ধবধবে চাদর-বালিশ-বিছানা, টয়লেট-বাথরুম সাধারণতঃ পরিষ্কার। ভাড়া খুবই শস্তা, গায়ে লাগে না। আর যেটা ভালো, ওখানে সবাই অল্পবয়স্ক, এবং বেড়াবার জন্যই এসেছে। কাজেই ভাব হতে সময় লাগে না। ওদের কাছেই জানা যায় দ্রষ্টব্য কি, সুন্দর জায়গা কোনটা, কিভাবে যাওয়া যাবে। কোথাও কোথাও হস্টেলের থাকবার পূর্বশর্ত পরদিন বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করতে হবে, কাটলারী ক্রকারী ধুয়ে রাখতে হবে—সকলে মিলে সেটা করাও কম আনন্দের নয়। কোথাও রান্নার আলাদা ব্যবস্থা আছে, বাজার থেকে জিনিষ কিনে ওখানকার প্যান, পট নিয়ে নিজের মতো রান্না করে খাও।

বেড়াতে বেরুলে এক বড় অসুবিধা মালপত্র। এখানে আপ্তবাক্য হলো, "ট্রাভেল লাইট", এমন কিছু নিও না যা নিজের হাতে বা কাঁধে বইতে পারবে না। রাস্তার মোড়ে গিয়ে তুড়ি দিয়ে ডাকলে কুলী ছুটে আসবে না। যা প্রথম দিকে শীসার মতো হাল্কা সেটাই দিনের শেষে লোহার মতো ভারী মনে হবে। ইউথ হস্টেলে সব কিছু রাখা যায় না। একটা উপায় রেল স্টেশনের 'লেফট্ লাগেজ' রুমে বা লকারে রাখা—তারপর দু একদিনের জন্য যা দরকার সেটুকু হাতে-কাঁধে নিয়ে বেরুনো। সেই সময় অনেকবারই রেলের স্টেশনের বাথরুমে জামাকাপড় পাল্টেছি, তারপর জমা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি।

ওই ধরনের বেড়ানোর একটা অন্য রকমের মজা আছে, যা ছাত্রত্ব শেষ করার পর বিশেষ পাইনি। বেড়ানোর একটা বড় অংশ ঠিক না করে যাওয়া, গিয়ে ঠিক করা, ম্যাপ দেখে ট্রাভেল লিটারেচার মিলিয়ে পেন্সিলে নোট করে বেড়ানোর অন্যরকম আনন্দ। কেউ গাড়ীতে লিফট দিলো তো সে যেখানে নিয়ে গেল সেই অবধি চলো, সেখান থেকে অন্য কোথাও। আমার মায়ের ভাষায় 'হারা-উদ্দেশ্যে' ঘোরা।

তখন টাকাটাও ছিল এক বড় সমস্যা। ঘোরার শখ আছে কিন্তু রেস্ত নেই। গুণে গুণে খরচ করো, ফ্রাঙ্ক, ক্রোনার, শিলিং, মার্ক, যাই হোক। ইটালীর রেস্টুরেন্টে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে খেলে একরকম পয়সা, বসে খেলে আরেক রকম—ওখানে তাই বসতাম-ই না। দূরপাল্লার যাত্রা হলে রাত্রের ট্রেন ধরো—হোটেল বা হস্টেলের খরচতো বাঁচবে। পয়সা ফুরিয়ে গেলে পাঁউরুটি দুধ দিয়ে চালাও। তবু ঘোরো, চরকির মতো ঘোরো। হাঁটো শুধু হাঁটো—পা চলে না তবু হাঁটো। কতো ঘুরেছি এইরকম। সেই কষ্টগুলো মনে নেই আর। বরং মনে আছে মজার ঘটনাগুলো, নানা অঘটন দুর্ঘটনার কথা, কতগুলো সুন্দর দৃশ্য, আরো সুন্দর মানুষের মুখ।

পরের পর্যায়ে, যখন চাকরী হলো, গাড়ী কিনলাম, তখন আর এক ধরনের ভ্রমণ। গাড়ী এক বিরাট স্বাচ্ছন্দ্য, বিরাটতর যন্ত্রণা। স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা এই যে সময়টা পুরোপুরি তোমার তাঁবে। কোথায় যাবে, কখন বেরুবে, এসব আগে না ঠিক করলেও চলবে। প্লেন বা ট্রেন চড়ার মতো নয়। অবশ্য দ্বীপে থাকার একটা বড় অসুবিধে আছে—সেটা হলো সমুদ্র পারাপারের ঝামেলা। ট্রেনে গেলে, কানেকটিং বোটে তুলে দেবে, তারপর এপাশে আবার সময় মেলানো ট্রেনে; কখনো কখনো ট্রেনই ঢুকে যাবে রেল-পাতা জাহাজের খোলে, সেক্ষেত্রে নামতেই হবে না। প্যারিসে যাবার জন্য ছিল 'সিলভার এ্যারো'—প্লেনে করে সমুদ্র পার হও, ওপাশ থেকে ট্রেনে একেবারে শহরের মাঝখানে, সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টায়। কিন্তু গাড়ী নিয়ে গেলে আগে থেকে বোট বুক করতে হবে, ফিরবার দিন ঠিক করতে হবে—না হলে, অন্ততঃ গ্রীষ্মকালে, যায়গা পাওয়া যাবে না। গাড়ী চালিয়ে জাহাজের খোলে ঢোকাও, হারউইচ বা ডোভারে বা অন্য কোন জাহাজ

খাটার, ওপরে গিয়ে লাউঞ্জে বসো, রেস্টুরেন্টে যাও, তারপর ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ওদিকে গেলে আবার গাড়ীতে গিয়ে বসো। কয়েক শো গাড়ী পেটে নিয়ে এইরকম বেশ কিছু বোট চ্যানেল পারাপার করে। বোটের সঙ্গে উড়ে চলে এক ঝাঁক সীগাল। ওরা মাঝে মাঝে জলে বিশ্রাম নেয়, আবার পাল্লা দিয়ে ওড়ে। কেন ? শুধু কি উড়বার জন্য, না জাহাজ থেকে ফেলে দেয়া মাংসের টুকরো আবর্জনাই আসল কথা ?

বোট বুক করবার ঝামেলা বাদ দিলে বাকি সময়টা পুরোপুরি তোমার নিয়ন্ত্রণে, যদি গাড়ীতে যাও। অটোমোবাইল এ্যাসোসিয়েশন বা এ-এর সভ্য হলে ওরা বেরুবার আগে কি কি কবতে হবে জানিয়ে দেবে। মানচিত্র তো পাঠাবেই, সঙ্গে থাকবে রুটের বিস্তারিত বিবরণ। প্রতিটি শহর-জনপদের নাম, দূরত্ব, কিছুটা পরিচিতি, কিভাবে যেতে হবে, কোথায় সমস্যা হলেও হতে পারে—সব কিছু। ইনসিওরেন্স, দেশের নামের প্লেট থেকে শুরু করে সবরকম বিস্তারিত বিবরণ—দারুণ অন্যমনস্ক আইনস্টাইনচিত প্রতিভা বা দারুণ মূর্খ ছাড়া ভুল হবার কোন উপায় নেই।

আরতির অবশ্য একটা বিশেষ রকম ভয় ট্রাফিকের নিয়ম নিয়ে। বৃটেনে ভারতে এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশগুলোতে নিয়ম রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে চালানো ; পৃথিবীর আর সব জায়গাতেই নিয়ম রাস্তার ডানদিক ঘেঁষে যাওয়া। তাই ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বোটের খোল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই এটা ঠিক রাখতে হয়। প্রথম আধঘণ্টা আরতি মন্ত্র পড়ার মতো বলবে, "ডাইনে ঘেঁষে ডাইনে ঘেঁষে ডাইনে ঘেঁষে।" ওর বোঝা উচিত যে এইভাবে এক সুরে এক কথা এতক্ষণ বললে আমি হিপনোটাইজড হয়ে স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারি—তবু ও বলবেই। পনেরো মিনিটের বেশী লাগে না ডানদিকে ধাতস্থ হতে। একটা সমস্যা—বৃটিশ গাড়ীতে ড্রাইভার বসে ডানদিকে, যার ফলে ওভারটেকিং একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আরতি বাঁ দিকে বসে ভালো দেখতে পায়, কিন্তু পরিস্কার ভাবে বলবে না ওভারটেক করা যাবে কিনা। ফলতঃ প্রায়ই সত্তর বছরের কোন বৃদ্ধের স্টেডি ফর্টি-মাইলস-এন-আওয়ারের গাড়ীর পিছনে আটকে যাই। ফেরার পথে, ইংলিশ চ্যানেল পার হবার পর নতুন মন্ত্র, "বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে চলো," যতক্ষণ না আমি ক্ষেপে গিয়ে বলবো, "এখন থামো, আর না।" আরতির আমার গাড়ী চালানো নিয়ে দারুন ভয়, অথচ কাল যে লোকটা ড্রাইভিং শিখেছে তার সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তে যাবে। গাড়ী চলার সঙ্গে ওর ধারা বিবরণী চলে, "একটু আস্তে চলো না প্লিজ, তাড়াহুড়ো কিসের ! ও পাশের গাড়ীটার মতিগতি ভালো না সাবধান। আঃ এখন আবার ওভারটেক করছো কেন ? বাঃ বাঃ তুমি আশিতে উঠে গেলে ? তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করি ! আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি কাল থেকে তোমার গাড়ীতে চড়বো না। আচ্ছা এই গাড়ীতে কি আমার কোন অধিকার নেই ? তুমি চালাচ্ছো বলে কি নিজের ইচ্ছে মতো চালাবে ? তোমার ওপরও কি আমার কোন অধিকার নেই ? তুমি কি আমার কোন কথা শুনবে না গো ?"

যতক্ষণ গাড়ী চলে ততক্ষণ আরতির চোখদুটো মাইলোমিটারে আঁটা থাকে। কাঁটা যতো ঘোরে ওর কথা ততো বাড়ে। পাশে বসে 'ব্যাকসিট ড্রাইভিং'। বৃটেনের কোন কোন দোকানে ব্যাকসিট ড্রাইভারদের 'লাইসেন্স' পাওয়া যায়—সুন্দর সরকারী কায়দায় ছাপানো, মনে হবে আসল জিনিস। ১৯৭২ সালে লণ্ডনে এসে কয়েক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে থাকবার এবং ঘুরবার সময় জ্যোতিবাবু আরতিকে ওর নাম লিখে নীচে নিজের নাম সই করে ওইরকম একটা ব্যাকসিট ড্রাইভিং লাইসেন্স উপহার দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে আরতির খেদোক্তি, "শেষ পর্যন্ত জ্যোতিবাবু আপনিও কিনা…।"

আমাকে অনেকে জিগ্যেস করেছেন, "আচ্ছা এই যে আরতি রানিং কমেন্টারি করে চলে,

আপনার চালাতে অসুবিধে হয় না ?"

আমি জনান্তিকে বলি "না। ওর একটা কথাও কানে ঢোকে না, শুধু একটা ভোঁ ভোঁ শব্দ। ওই শব্দটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, না হলেই বরং চালাতে পারবো না।"

বন্ধুরা বলেন, "ভাগ্যিস, না হলে··· ।" আরতি শুনে ফেলে বলে, "তোমাকে চালাবার সময় যে কতো সাহায্য করি ওটা ভেবে দ্যাখো না। অকৃতজ্ঞ, পৃথিবীটা এইরকমই।" শোধ তোলে বাড়ী পৌঁছে। রান্না চাপিয়ে আমাকে বলে "পেঁয়াজ কাটো।" শেষ হলে বলে "আরো কাটো", যতক্ষণ না চোখের জলে নাকের জলে হই।

মোটরওয়ে, অটোভান, অটোস্ট্রাডা। গাড়ী চালাবার সুন্দর ব্যবস্থা। সোজা রাস্তা, মানুষ নেই, গরু নেই, সাইকেল বা মোটর সাইকেল নেই। দু পাশে দুটো থেকে তিনটে করে লেন, তারপরেও খানিকটা জায়গা, যদি গাড়ী খারাপ হয় তখন রাখবার জন্য। কয়েক মাইল অন্তর ফোনের ব্যবস্থা, 'লে বাই', বিশ্রামের জায়গা, কখনো রেস্টুরেন্ট। সেখানে খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে আবার ছোটো। ওখান থেকে বেরুবার জন্য বা ওখানে ঢুকবার জন্য অতিরিক্ত রাস্তা। সহজেই স্পীড তোলা যায়, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম। কিন্তু দুর্ঘটনা হলে সেটা ছোট ব্যাপার হবে না। এ গাড়ীর সঙ্গে ও গাড়ী, ও গাড়ীর সঙ্গে সেই গাড়ী—অন্তত এক কিলোমিটার জুড়ে ওই দুর্ঘটনার ভগ্নস্তূপ ছড়িয়ে থাকবে। এতো গাড়ী এতো স্পীড সেইটাই ভয়। গাড়ী চালানো মানেই অন্যের হাতে জীবনটা সঁপে দেওয়া। তুমি যতো সাবধানেই চালাও, প্রশ্ন হলো অন্যরা কিভাবে চালাচ্ছে !

গাড়ী নিয়ে বড় শহরে এক ভীষণ যন্ত্রণা পার্কিং। জেনিভাতে আমাকে প্রায়ই রাত্রে আধ মাইল পৌনে এক মাইল দূরে গাড়ী রেখে হোটেলে ফিরতে হতো, কাছে জায়গা না পেয়ে। সেই রাখাটাও বেদনাদায়ক, কেন না দুই গাড়ীর মধ্যে কম জায়গায় ঢোকাতে অনেক কসরৎ করতে হয়। বড় শহরে তাই ছোট গাড়ী শ্রেয়। বৃষ্টি বা বরফ থাকলে সেই ফিরে আসাটা মনোরম হয় না। পরদিন সকালে আরো যন্ত্রণা, খুঁজে বের করা, গত রাত্রে গাড়ীটা কোথায় রেখেছি যদি ঠিকমত মনে না থাকে। প্যারিসেও একই ধরনের ঝামেলা বারবার হয়েছে। সকালে আরাম করে অনেকক্ষণ ঘুমুবার উপায় নেই। ট্রাফিক ওয়ার্ডেন ডিউটিতে আসবার আগেই ওই গাড়ী সরাতে হবে—না হলে ফাইন।

সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা যখন গাড়ীর কিছু হয়। বেশ কয়েকবার টায়ার ফেটেছে। একজস্ট পাইপও বোমার মতো শব্দ করে ফেটেছে দুবার। একবার সুইটজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী রাস্তায় এ্যাকসিলারেটর খারাপ হয়ে গিয়েছিল— সেটা অবশ্য ব্রেক খারাপ হবার থেকে ভালো। গাড়ী ঠেলবার অভিজ্ঞতা অগুনতি। একবার ফ্রান্সের আল্পসের এক বরফ ঢাকা নির্জন রাস্তায় টায়ার ফেটে পথ হারিয়ে কয়েক ঘণ্টা বসেছিলাম। এরকম অসংখ্য ধরনের দুর্ঘটনা সব সময়েই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। মোটরওয়েতে স্পীড ওঠে কিন্তু চালানো বড্ড একঘেয়ে- সত্যি সত্যি ঘুম পেয়ে যেতে পারে। সেই জন্য মাঝে মধ্যে স্পীড বাড়ানো কমানো উচিত। ওরা বলে, চালাতে গিয়ে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলো—সেটা দরকার। সঙ্গী ছাড়া দূর পাল্লার মোটরওয়েতে গাড়ী চালিও না, একটু খানি অন্যমনস্ক হলেই বিরাট খেসারৎ দিতে হবে। বৃষ্টির রাত্রে ভেজা উইণ্ডস্ক্রীনে তোমার লেনের সামনে রাশি রাশি অন্য গাড়ীর পিছনের লালআলো, ওদিকের লেনে উল্টো পথে রাশি রাশি হেড লাইটের সাদা আলো, মাঝেমধ্যে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয়। তার থেকে আঁকা বাঁকা পথে, বিশেষ করে পাহাড়ী পথে চালানো অনেক আনন্দের। পথের বাঁকে বাঁকে ল্যাণ্ডস্কেপ পাল্টায়।

গাড়ী সবসময় যে নিজের হতে হবে এমন নয়। ইউরোপ বা আমেরিকার প্রত্যেক শহরেই

সেলফ-ড্রাইভ গাড়ী ভাড়ার ব্যবস্থা আছে। হার্টস, এভিস, নানা কোম্পানি। ওরা তোমার ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করে ফর্ম সই করিয়ে গাড়ী দেবে। তারপর গাড়ীর কাজ শেষ হলে যেখানেই যাও সেখানে ওই ভাড়া-গাড়ীর কোম্পানীর অফিসে—সাধারণত রেলস্টেশন বা এয়ারপোর্টে—ফেরৎ দিলেই হবে। সেখানেই মাইল গুনে টাকার হিসেব করে ওরা আবার ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করিয়ে ফেরৎ দেবে। ইউরোপের সর্বত্রই এই ব্যবস্থা রয়েছে।

নিজের বা ভাড়ার যেরকম গাড়ীই হোক, শীতের দেশে, বিশেষ করে ঠাণ্ডার সময় বা বৃষ্টির পর, এক বড় সমস্যা হলো, ভোরবেলা উঠে গাড়ীর কি মেজাজ হবে না জানা। গ্যারেজে না রাখলেই ভয়, হয়তো স্টার্ট নিলো না। তখন নানারকম সাধ্যসাধনা করে গাড়ীব মান ভাঙ্গাতে হবে, না পারলে অন্য কোন গাড়ীর ব্যাটারীর লিড যোগ করে স্টার্ট করাতে হবে বা এ-এর মতো কোন সংগঠনকে ডাকতে হবে। এই কথাটা ভেবে অনেকেই রাত্রে পার্ক করবার সময় একটু উঁচু জায়গা দেখে রাখেন, যাতে সকালে ঢালু দিয়ে গড়িয়ে নামিয়ে স্টার্ট দেয়া যায়। তারপর আর এক ঝামেলা স্লিটে হয়তো গাড়ীর কাঁচ ঢেকে রয়েছে—তখন ওষুধ স্প্রে করে ওয়াইপার চালিয়ে সরান। আরও খারাপ যদি রাত্রে বরফ পড়ে গাড়ী ঢেকে যায়—তখন বরফ সরিয়ে সেই গাড়ী উদ্ধার বেশ সময় সাপেক্ষ। ভিজে রাস্তায়, বা জমাট বরফ ভর্তি রাস্তায়, জোরে ব্রেক চাপলে 'স্কিড' করবার সম্ভাবনা থাকে—গাড়ী তখন চোঁ করে ঘুরে যায়, করবার কিছু থাকে না। আমার অন্তত দুবার এইরকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে—তবে বহু রাত্রে বলে অন্য গাড়ীর সঙ্গে ঠোক্কর লাগেনি। মোট কথা, গাড়ী থাকলে স্বাচ্ছন্দ্য যেমন বাড়ে সেই সাথে ঝামেলাও কম বাড়ে না।

তবে এটাও ঠিক যে গাড়ী একবার চলতে শুরু করলে মনে হয় যেন কোন সচল নিজের বাড়ীতেই রয়েছি, গাড়ীটা যেন বাড়ীরই একটা বর্দ্ধিত অংশ। সেখানে খাবার, বই, গানের টেপ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নেয়া যায়, যা ট্রেনে বা প্লেনে নেয়ার ঝামেলা।

আমার ভ্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে নিজের গাড়ী নেই। ইউরোপের মধ্যে যেতে হলে ইংলিশ চ্যানেল গাড়ী নিয়ে পার হয়ে বহুবারই গিয়েছি। কিন্তু আফ্রিকা, এশিয়া বা দুই মার্কিনী মহাদেশে ওভাবে যাওয়া চলবে না। অতএব এয়ারপোর্টে যাও, প্লেনে ওঠো, এবং আশা রাখো যে ওপাশে, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কোন না কোন ব্যবস্থা কেউ না কেউ রাখবে। নাইজিরিয়ায় এনো, সেনেগালে জগদীশ—এরাই ভরসা। অবশ্যই ওদেরও অন্য কাজ আছে, তাই ওদের গাড়ী ছাড়াও বাস, ট্যাক্সি, ট্রেন ধরতে হবে। শহরের এক বড় অংশ পায়ে হেঁটে মেরে দিই—পায়ে না হাঁটলে ঠিক নতুন শহরে ঘোরার আমেজ থাকেনা। ট্রেন সবসময়ই আনন্দের—গাড়ীর থেকে বেশী আনন্দের। হাত পা ছড়িয়ে বসা যায়, জানলা দিয়ে বিনা চিন্তায় মানুষ প্রকৃতি দেখা যায়, টয়লেট আছে।

এসব তো হলো বেড়াবার পদ্ধতি, কিন্তু উদ্দেশ্য কি? বহু মানুষের কাছেই বেড়াবার এক বড় উদ্দেশ্য ধর্ম করা। মক্কা ভাটিকান জেরুজালেম বা বেনারসে তাই এতো ভীড়। দক্ষিণেশ্বর তারকেশ্বর বা কালীঘাটও কি কম যায়? আর একটা উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে উপভোগ করা, সে আল্পস হিমালয় আণ্ডিসই হোক আর দীঘা, নীস, কাসাব্লাঙ্কা হোক। প্রকৃতি প্রেমিকের সংখ্যা বাড়ছে, শহরের জীবন থেকে প্রকৃতি যত মুছে যাচ্ছে। আর একটা বড় উদ্দেশ্য, আর্ট বা সংস্কৃতি। এমন বেশ কিছু মানুষ জানি যারা সময়ের বড় অংশটাই কাটায় মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারী এই সব দেখে, বা নানা দেশের অপেরা কনসার্ট শুনে। চেঞ্জে যাবে, স্বাস্থ্য ভালো করতে এটাও আমাদের বাঙালীদের এক বড় উদ্দেশ্য। একসময় বাঙালীর দৌড় ছিল মধুপুর, দেওঘর, রাজগীর, পুরী অবধি। যাদের অবস্থা ভালো তারা বাগান বাড়ী ভাড়া করে কয়েক সপ্তাহ থাকতো, বাজারে যা দেখতো তাই মনে হতো 'ড্যাম চিপ'—ওদের তাই স্থানীয় লোকেরা নাম

দিলো 'ডাণ্ডিবাবু' । এখন বাঙালী অনেক ঘোরে, সুযোগ পেলেই ঘোরে । কুণ্ডু স্পেশাল থেকে শুরু করে বেড়াবার নানারকম প্যাকেজ ট্যুর ভারতেও এখন চালু । আমার ছোটবেলা পরিচিতদের মধ্যে কজন দার্জিলিং কাশ্মীর গিয়েছিলেন হাতে গোনা যেতো—এখন যায় লক্ষে লক্ষে । কেউ কেউ বাইরে যায় অধর্ম করতে । একদল বাঙালী নবীন অধ্যাপকের কথা জানি যারা একবার দুম করে দুমকা গেল, মদ খেতে ; কোলকাতায় ওদের খেতে দারুণ লজ্জা ।

কিন্তু মানুষ দেখতে কজন যায় ? কাশ্মীরে গিয়ে কজন খোঁজ নেন ওখানকার টাঙ্গাওলার যে ট্যুরিস্ট না এলে নিজের ভাগ্যকে গাল দেবে, আবার মনে মনে ট্যুরিস্টদের ওপর দারুণ চটা । বা দার্জিলিং-এর ওই ফুলের মতো গোলগাল মিষ্টিহাসি নেপালী মানুষগুলোর কথা, যারা কপালে বেল্ট লাগিয়ে পিঠে মাল রেখে মাথা সামনে দিয়ে হাঁটে ।পুরীর সমুদ্রের ওই নুলিয়ারা যে আদপেই ওখানকার মানুষ নয়, বাইরে থেকে এসেছে, একথা জানতে কারই বা আগ্রহ ? মহাবলীপুরমে শামুকের খোল দিয়ে তৈরী চাবির রিং যারা 'ক্রিং ক্রিং' বলে বিক্রী করে, সেই ছোট ছেলেমেয়েগুলোর দিন কিভাবে চলে তার কি খোঁজ রাখি ?

অথচ এই মানুষগুলো'র মধ্যেই এক মস্তোবড় জগত লুকিয়ে আছে । ওদের জীবন, সমাজ, আচার, সংস্কৃতি—এগুলো জানবাব বুঝবার মধ্যেও আনন্দ কম না । জানাটা হয়তো ওপর ওপর, বোঝাটা নিশ্চয়ই দারুণ অসম্পূর্ণ, তবু এক নতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতা যা মূল্যহীন । মরক্কোর ইবন বতুতা, চীনের হিউয়েন সাং, ইটালীর মার্কো পোলো—ওদের মূল লক্ষ্য ছিল ওইটাই । একটা নতুন দেশ দেখবো, তাব থেকে বড় ছিল একটা নতুন সমাজ জানবো ।

ঘানায় এসে ওদের সমাজটাকেই প্রথমে জানতে চাইলাম ।

॥ দুই ॥

এ্যাবির মতো স্মার্ট মানুষ—চেহারায় এবং পোশাকে—খুব কমই চোখে পড়ে। সবসময় ঝকঝকে স্যুট, হাতে কায়দা করে ধরা সিগ্রেট বা গ্লাস, মুখে প্রাণ জুড়োনো হাসি।

এ্যাবি ঘানার ডিরেক্টর অফ স্ট্যাটিসটিকস—সমস্ত রকম পরিসংখ্যানের অধিকর্তা। পরিসংখ্যান মানে একটা দেশের অঙ্ক দিয়ে আঁকা ছবি। ঘানা জানতে হলে জানতে হবে উৎপাদন কি হয় এবং কতোটা, মানুষ কতো কোথায় কিভাবে ছড়িয়ে, শহর কি হারে বাড়ছে, ওদের জীবিকা কি, জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধির 'ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস' কি বলে? এসব জানলেই তো বোঝা যাবে একটা দেশের কি চেহারা। একটা মানুষকে যেমন আমরা বর্ণনা করি কতোটা লম্বা, কেমন মোটা, চুল আছে কি নেই, গায়ের রঙ কি, নাকটা তীক্ষ্ণ না ভোঁতা এইসব বলে।

এ্যাবির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা বা গল্পর পর বুঝলাম ওই ধরনের বিশেষ কোন খবর এ্যাবি আমাকে দিতে পারবে না। পরিস॰ ,ানের অধিকর্তার সংখ্যার চেয়ে ব্যাখ্যায় আগ্রহ বেশী। সংখ্যার মধ্যে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসই পছন্দ—তবে সেই পরিসংখ্যান জন্ম-মৃত্যু বৃদ্ধির নয়।

এ্যাবিকে আমি দোষ দেবো না। কেননা ওর অফিস আলো করে বসে আছেন বেশ কয়েকজন ঘানা-সুন্দরী। সুন্দরীতমা মিস নিকোই এ্যাবির এক বিশিষ্ট সহকর্মী। এমন সুন্দরী খুব কমই চোখে পড়ে। আমাদের দেশের মানুষের ধারণা, কালো হলে সুন্দর হয় না; যার নাক তীক্ষ্ণ নয়, ঠোঁট পুরু, কোমর অবধি বিনুনি করা চুল নেই, সে আবার কেমন সুন্দরী! আমি তাদের বলবো, আক্রা আসুন, মিস নিকোইকে দেখে যান।

প্রথমেই চোখে পড়ে রঙের জেল্লা। আবলুস কাঠের ঝকঝকে রঙ—যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। ওর সুন্দর ত্বকের পাশে আমার দ্যুতিহীন, অবর্ণনীয় কালো বাদামী রঙ দারুণ বেমানান। নিকোই কোন সাবান মাখেন জানিনা, কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকাই তো পাম তেলের এক বড় উৎস। তারপর সৌন্দর্যের এক বড় দিক হলো, দেহের বিভিন্ন অংশ কতোটা সুসমঞ্জস। ওর চেহারায় পুরু ঠোঁট আর মোটা নাকই যেন মানানসই, যেমন সুন্দর লাগে অসংখ্য বিনুনিওয়ালা, সিঁথিতে সিঁথিতে ভাগ করা একরাশ ঘন চুল। মাথার এক অংশ স্কার্ফে ঢাকা, সেই স্কার্ফ আর গায়ের ঢোলা রঙীন জামা মেলানো। সৌন্দর্যের এক বড় দিক হলো চোখ। নিকোইর বড় বড় চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কথা বলে দেখলাম পরিসংখ্যানটা এ্যাবির থেকে ভালো বোঝে।

এ্যাবিকে বৃটেন থেকেই লিখে জানিয়েছি আমার আসবার উদ্দেশ্য। ব্রাইটনে ডাডলী সিয়ার্স আর আমি অনুন্নত দেশের পরিসংখ্যান নীতি নিয়ে একটা সম্মেলন ডেকেছি। সেখানে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের ডিরেক্টর অফ স্ট্যাটিসটিকস আসবেন। সম্মেলনের পর সেই নিয়ে একটা মনোগ্রাফও আমরা প্রকাশ করবো। এ্যাবি কি আসবে? ও কি পেপার দেবে? ঘানার পরিসংখ্যান সমস্যা কি? আমাদের নিজেদের ব্যাকগ্রাউণ্ড পেপার তৈরী করতে গিয়ে খানিকটা ধারণা পেতে চাই অন্তত কয়েকটা দেশ নিয়ে। এ্যাবি কি সাহায্য করবে?

"হা হা হা", এ্যাবি হাসে, "স্ট্যাটিসটিকস ? তুমি কি জানো না মিথ্যা তিন রকমের—লাই, ড্যাম লাই আর স্ট্যাটিসটিকস ! আমিও সেই নীতিতে বিশ্বাসী। তুমি বলো কি ধরনের তথ্য চাই—আমি তৈরী করে দিচ্ছি। তুমি বলো কোন তথ্য চেপে দিতে হবে—আমি এমন চাপবো যে কেউ কোনদিনও জানবে না। তুমি বলো কোন সংখ্যাটা অন্য দশটা সংখ্যার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লুকিয়ে রাখতে চাও—আমি করে দিচ্ছি। এটা একটা শিল্প। সবাই সুন্দর করে পারে না। আমি অনেক তপস্যা করে খেটে ব্যাপারটাকে একটা উচ্চ মার্গের আর্টফর্মে এনে ফেলেছি। তবে এসব করবার আগে আমি জানতে চাইবো—তুমি কে ? তোমাকে ঘানার প্রেসিডেন্ট হতে হবে। হতে চাও ? এক্ষুনি করে দিচ্ছি। তবে মনে রেখো, প্রেসিডেন্ট হওয়া যতখানি সহজ, ওখান থেকে হাড়গোড় ভেঙ্গে নীচে পড়ে যাওয়াটাও ততোখানি সহজ। আজকে রাজা কালকে ফকির—ফকির না শহীদ ? না দেশদ্রোহী ? বলো প্রেসিডেন্ট হবে ? হা হা হা।"

এ্যাবির কথার ভঙ্গিতে বোঝার উপায় নেই পুরোটাই রসিকতা কি না, না ওর মধ্যেও খানিকটা সত্য জড়ানো আছে।

নিকোই বলে, "এ্যাবি যাই বলুক, ও স্ট্যাটিসটিকস খুব মানে।"

"কেমন ?"

"যেমন ধরুন প্লেন বুক করবে ? ও খোঁজ করবে কোন এয়ারলাইনসে সম্প্রতি দুর্ঘটনা হয়েছে—এবং সেই কোম্পানীর প্লেনেই যাবে। ওর মতে, একবার দুর্ঘটনার ঠিক পরেই ওই কোম্পানীর আর একটা দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনা কম। ও ল অফ প্রবেবিলিটিতে দারুণ বিশ্বাসী।"

"তাই যদি বলেন, তাহলে তো ঘানায় আর একটা সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা এখন সবচেয়ে কম।" আমি বলি, "দু একটা তো পটপট হয়ে গেল। কি বলুন ?"

এ্যাবি মুখ গম্ভীর করে বললো, "নো পলিটিকস প্লিজ। আমরা সিভিল সার্ভেন্ট। তুমি বাইরে থেকে উটকো লোক এসে তো আমাদের দারুণ ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছ দেখছি।" তারপর হা হা করে হেসে বললো, "বুঝলে সবটাই হচ্ছে ব্যাখ্যার ব্যাপার। তুমি ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড পড়োনি ! গ্লাসে আদ্ধেক জল। কেউ বলবে আদ্ধেক শূন্য, মিঃ নিকোবর বলবেন, আদ্ধেক ভর্তি। দুটোই সত্যি, কিন্তু দুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি।"

"ব্যাখ্যার যখন কথা উঠলো", নিকোই বলে, "তখন ওই গল্পটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। স্কুলের মেয়েদের ওজন করা হলো। তারপর সেই ওজনের গড় করা হলো। হেডমিস্ট্রেসের মুখ ভার। তিনি বললেন, এতো মেয়ের ওজন কেন গড়ের থেকে কম। তিনি চান সকলের ওজন হোক গড়ের থেকে বেশী। ওকে বোঝানো গেলনা যে সেটা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গড়টাই বেড়ে যাবে। গড়ের এপাশে ওপাশে দুপাশে কিছু কিছু মেয়েকে থাকতেই হবে—সেটাই অঙ্কের নিয়ম।"

আমি নিকোইকে বলি, "আপনাকে তাহলে আর একটা গড়ের গল্প বলি। ইংলণ্ডের প্রিন্সেস এ্যানের তখনো বিয়ে হয়নি। একজন কারখানার শ্রমিক ঘোষণা করলো, প্রিন্সেসের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় স্থির। কতোটা স্থির ? শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। আমি পুরোটাই বিয়েতে রাজী, প্রিন্সেস একদম রাজী নয়—দুটো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে পঞ্চাশ ভাগ।"

এ্যাবি একটু সিরিয়াস হয়ে বলে, "সত্যি সত্যি পরিসংখ্যান যোগাড় করা দারুণ শক্ত। রাস্তাঘাটের অবস্থা তেমন ভালো নয়। বহু জায়গাতেই পৌঁছনো যায় না, বাজিয়ে দেখা যায়না তথ্য ঠিক না ভুল। দপ্তর থেকে যা পাঠায় সেটাই মেনে নিতে হয়। এক বছরের সংখ্যার সঙ্গে পরের বছরের সংখ্যার কোন মিল নেই। ওরা ভাবে যাহোক একটা কিছু পাঠালেই হলো।

সংখ্যাগুলো যেন সরকারী অর্ডার মানবার জন্যই তৈরী। ওদের যেন অন্য কোন অস্তিত্ব নেই। সবাই চায় ভালো ফিগার পাঠাতে। ভালো না হলেও ওরা ঠিকঠাক করে ভালো ফিগার পাঠাবে। ফিগার কি পাঠালেই হলো ? সব ফিগারই কি মিস নিকোইর মতো মানানসই হবে ?" বলে চোখ টিপে হাসে। এ্যাবি কখন সিরিয়াস কখন তরল বোঝা শক্ত—একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে যেতে ওর সময় লাগে না।

পরিসংখ্যানের সমস্যা নিশ্চয়ই বড়ো। আফ্রিকার কোন এক দেশে লোকগণনা করতে গিয়ে দেখা গেল সেটা প্রায় অসম্ভব—কেননা শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ যাযাবর, ওদের কোন বাড়ী নেই, এক জায়গায় থাকে না। আর এক দেশে লোকগণনার নানা ঝামেলা, কিন্তু ঔপনিবেশিক আমল থেকে কুঁড়েঘর ধরে করের ব্যবস্থা ছিল বলে বাড়ী গণনার হিসেবটা অনেক ভালো। তখন বাড়ীর হিসেবকে ভিত্তি করে মানুষের হিসেব তৈরী হলো। সেটা ধরুন ১৯৬১ সাল। ১৯৬৪ সালে যখন আবার বাড়ীর হিসাব হলো ততক্ষণে ওরা ভুলে গিয়েছে যে ওখানকার লোকসংখ্যার হিসেব বাড়ীর হিসেব থেকে তৈরী। তাই ১৯৬৪ সালেব বাড়ীর হিসাব তৈরী করলো ১৯৬১ সালের জনসংখ্যার হিসেব থেকে—এক বাড়ীতে কজন থাকতে পারে সেটা ধরে। ১৯৭১ সালের লোকগণনার সময় আবার ১৯৬৪ সালের বাডীর হিসেবকে ভিত্তি করা হলো। এইভাবে চললো, বাড়ী থেকে মানুষ, মানুষ থেকে বাড়ী, ভুলের পর ভুল যোগ হলো।

১৯৭৮ সালে যখন আফগানিস্তানে গেলাম আই-এল-ও মিশনের সদস্য হিসেবে—সেখানেও দেখি জনসংখ্যা এক বিতর্কমূলক ব্যাপার। তবে বিতর্কটা আফগানদের সঙ্গে বিদেশীদের। আফগানিস্তানের লোকগণনার দায়িত্বে যারা তারা বলছে, মানুষ দু কোটি কুড়ি লক্ষ ; রাষ্ট্রসংঘ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ওরা বলছে নব্বই লক্ষের বেশী নয়— লোক বেশী দেখিয়ে, দেশটাকে বেশী গরীব দেখিয়ে এটা হচ্ছে ওদের বেশী আন্তর্জাতিক সাহায্য পাবার মতলব। কিন্তু হিসেবটা হবে কি করে, যখন তিন ভাগের একভাগ মানুষই যাযাবর। প্রশ্ন উঠবে সেই হিসেবও কি ঠিক ? আমরা কি সত্যি সত্যি জানি কজন যাযাবর কজন স্থিতিশীল ? এবং সেটাই যদি ঠিক ঠিক জানি তাহলে লোক গণনা নিয়ে এতো বিতর্ক হবে কেন ? কেউ বলবে যাযাবর লোকসংখ্যার আদ্ধেক, কেউ বলে প্রতি পাঁচজনে এক জনের বেশী না। সবই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া, ইংরাজিতে যাকে ভালো করে বলে guessestimate বা গেস এষ্টিমেট। হিন্দুকুশ পাহাড আর বাদাকশানে গাধার পিঠে চড়ে কে ঘুরে ঘুরে হিসেব করবে ? একজন এক্সপার্ট বললেন, ভেড়ার হিসেবটা হয়তো ঠিক আছে, একটা মানুষ-ভেড়া অনুপাতের 'কো-এফিসিয়েন্ট' বের করলেই মানুষের হিসাব তৈরী হয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত হলো, "এক কোটি সত্তর লক্ষ"—সেই হিসাবই সরকারী কাজে চলবে। কেউ জিগ্যেস করলো না ওই সংখ্যাটা সরকার বাহাদুর পেলেন কোত্থেকে।

এই হলো পরিসংখ্যানের এক বড়ো সমস্যা। কিন্তু সেই সমস্যার কথা নিউইয়র্কে পৌঁছোয় না। ওখানকার রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান দপ্তর তৈরী করেছেন এস-এন-এ, সিস্টেম অফ ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টস। সেখানে অসংখ্য তথ্য এবং টেবিলের কথা, প্রতিটি বিষয়ের—'ভ্যারিয়েবলে'র—সূক্ষাতি সূক্ষ্ম সংজ্ঞা। এরা ফতোয়া দিয়েছেন প্রতিটি সরকারকে ওই ছক অনুযায়ী তথ্য দিতে হবে। কিন্তু সেই তথ্য ওরা কোথায় পাবে ? যদি পাঠায়ও সেটা কি গোঁজামিলের বেশী হবে ?

আমি এ্যাবিকে জিগ্যেস করি, এস-এন-এর কথা।

এস-এন-এ ? এ্যাবির মুখবিকৃতি দেখে মনে হতে পারে যেন কলেরা ট্রাইপানোসোমিয়াসিস অনকোকারসিয়াসিস বা এই ধরনের কোন দুরারোগ্য ব্যধির কথা বলছি।

এ্যাবি বলে, "ওই ধরনের অশ্লীল কোন কথার আলোচনা আমি করতে চাই না। এস-এন-এ ? তুমি কি পৃথিবীতে আর কোন আলোচনার জিনিস পেলে না ?"

বোঝা গেল "হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী" এই ধরনের একটা মনোভাব এ্যাবিকে চেপে ধরেছে। ওই আলোচনা বেশী দূর এগোবে না।

নিকোই সাহায্য করলো। এ্যাবিকে বললো, "তুমি বরং মিঃ ইণ্ডিয়াকে ডাকো। ও ডঃ দাশ গুপ্তকে বুঝিয়ে দিক।"

মিঃ ইণ্ডিয়া একটু পরে এসে ঢুকলেন। চুপচাপ এসে চেয়ারে বসলেন। একটু অপ্রস্তুত ভাব—বিশেষ করে আমাকে দেখে। এই সমাবেশে কোন ভারতীয়কে দেখবেন বলে উনি ভাবেননি। আসল নাম অন্য, কিন্তু একমাত্র ভারতীয় ওই অফিসের, তাই ওরা ওকে 'মিঃ ইণ্ডিয়া' বলে। দক্ষিণ ভারতীয়, মাদ্রাজের মানুষ, নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, ধরুন সুব্রহ্মনিয়ম।

সুব্রহ্মনিয়মের হাতে এক গোছা কাগজপত্র। বিরাট বড় বড কাগজের মধ্যে লেখা টেবিল--ছোট কলম, বড় কলম, হেডিং লাল, নীল, নানা রঙের, সাজানো নানা দাগে টেবিল ভাগ করা।

এ্যাবি বললো, "তুমি কি জানতে চাও বলো ? তোমার মুখ থেকে বেরুবার আগেই মিঃ ইণ্ডিয়া উত্তর বলে দেবে। ঘানার সব কিছু ওর মুখস্ত। বা বলতে পারো আঙুলের ডগায়। উনিই আমাদের ন্যাশনাল এ্যাকাউণ্টস তৈরী করেন।"

সত্যিই তাই। জনসংখ্যা ? পঁচাশি লক্ষ। বৃদ্ধির হার ? এক হাজারে চব্বিশ থেকে ত্রিশ প্রতি বছরে ? আয়তন ? ৯২১০০ বর্গ মাইল—পশ্চিমবঙ্গের তিনগুণ। রাজধানী আক্রার লোকসংখ্যা ? সাড়ে আট লক্ষ। কুমাসি সাড়ে তিন লক্ষ। সেকোণ্ডি- টাকোরাডি সোয়া দুই লক্ষ। পনেরো বছরের কম মানুষ ? একশো জনে চুয়াল্লিশ, প্রায় আদ্ধেক। পঁয়তাল্লিশের বেশী ? মাত্র একশো জনে বারো জন। মানুষ কতোদিন বাঁচে ? গড়ে ৪৮ বছর। মাথা পিছু বার্ষিক আয় ? টাকার অঙ্কে দু হাজারের বেশী। এই থেকে শুরু করে অর্থনীতির সংখ্যাগত যতো রকমের প্রশ্ন করলাম, সব কিছুরই চটপট জবাব, যেন ভাববারও দরকার নেই। এ্যাবি বা নিকোই না থাকলে ভাবতে পারতাম বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। এস-এন-এ ?

মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম আস্তে আস্তে বলেন, "আমাদের দারুণ মুশকিল হচ্ছে। এতো ইউরোপ বা আমেরিকা নয় যে সবরকম কাজকর্ম টাকার বিনিময়ে হবে ? ওই সব উন্নত দেশে মনে হতে পারে যেন ছেলে বৌও টাকা না পেলে কাজ করবে না। কিন্তু আমাদের এখানে তো তা নয়। উন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ কারখানায় বা অফিসে কাজ করে, বাড়ীতে এসে খায়। কাজের জায়গা একটা, খাবার-শোবার জায়গা আরেকটা, হিসেব ঠিক থাকে। কিন্তু এখানে তো পাঁচজনে তিনজন কৃষিতে কাজ করে। যারা কাজ করে তারাও তো শ্রমিক নয় বেশী। বাগিচাতে শ্রমিক আছে, কিন্তু খাবার তৈরী করে পরিবার। কাজের জায়গা, থাকা খাওয়ার জায়গা এক, পরিবার-জমি একসঙ্গে জড়ানো। আপনি ভাগ করে হিসেব করবেন কি করে ? বাবা, ছেলে, বৌ, মেয়ে এরা তো কাজের বদলে মজুরী নেয় না ! একটা হিসাব ধরে দেওয়া যায়, আমরা দিই—কিন্তু সেটা তো পুরো গোঁজামিল।"

এবার নিকোই বলে, "তারপর ধরুন, গ্রামের বহু কাজ আছে যেটা বহু মানুষ একসঙ্গে করে। যেমন রাস্তা করলো, বাঁধ দিলো, বা একজনে আর একজনের জমির কাজে সাহায্য করলো। এ সবের জন্যও তো কেউ মজুরী বা পারিশ্রমিক নেয় না। আজকে ও আমার কাজটা করে দিলো, কালকে আমি ওর কাজটা করে দেবো—এইভাবে চলে। কাজগুলোর অর্থনৈতিক মূল্য নিশ্চয়ই

আছে, ধরতেও হবে জাতীয় আয়ের হিসেবে। কিন্তু হিসাবটা হবে কি করে যখন টাকার লেনদেন হয় না ?"

সুব্রহ্মনিয়ম বলে, "সব কিছু যোগ করবার পর দাঁড়ায় একটা গড় হিসাব। মাথা পিছু জাতীয় আয়। যাদের এই সংখ্যাটা বড়ো তারা বড়োলোক। যাদের কম তারা গরীব। কিন্তু এই গড়টাই তো সব না। ঘানায় তো কত রকমের অঞ্চল আছে—সব জায়গায় কি সমান আয় ? উপকূল আর উত্তর সীমান্তের মানুষের আয় কি এক ? যারা শুধু খাবার তৈরী করে আর যারা কোকো বানায় তাদের অবস্থা কি আলাদা নয় ? স্থানীয় মানুষ আর অভিবাসী তারাও তো এক পাবে না। আক্রা আর গ্রামের মধ্যে কতো পার্থক্য ! ওই গড়ের হিসাবে এর একটাই ধরা পড়বে না। কিন্তু প্রবণতা হলো গড়টা ধরা। অঞ্চল ধরে ধরে ভালো হিসাব তৈরীর ব্যবস্থাও নেই।"

আমি চমৎকৃত হয়ে সুব্রহ্মনিয়মকে দেখছি। মতামত আমার সঙ্গে পুরো মিলছে। এ্যাবি সেটা লক্ষ্য করে বলে, "আমাদের মিঃ ইণ্ডিয়ান আসলে মিঃ এনসাইক্লোপিডিয়া। তোমরা ভারতীয়রা সত্যি দারুণ বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী। তোমাদের দেখে মনে মনে দারুন হিংসে করি।" আমি মনে মনে বললাম, ভেবো না সব ভারতীয় সুব্রহ্মনিয়ম—তাই যদি হতো তাহলে ভারত এইখানে পড়ে থাকতো না।

পরিসংখ্যানের ব্যাপারে অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই ভারত বেশ খানিকটা এগিয়ে। আমাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনে নানা দেশ থেকে যারা আসবে তাদের অনেকেই ভারতীয় বা তাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় ? মালয়েশিয়ার স্ট্যাটিসটিকসের ডিরেক্টর রমেশ চন্দ্র, কেনিয়ার ডিরেক্টর সুরজিৎ হেয়ার, এফ-এ-ওর ডিরেক্টরও ভারতীয়, আই এল-ওর ডিরেক্টর ভারতীয় না হলেও যিনি তাকে প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি ভারতীয়। যারা আসবে না অথচ তথ্য তৈরীতে সাহায্য করবে তাদের মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা সুব্রহ্মনিয়ম নানা দেশে ছড়িয়ে। ভালো সংখ্যাতত্ত্বের অপারেশন রিসার্চের আন্তর্জাতিক জার্নাল খুলে দেখো, কোন না কোন ভারতীয় নামের লেখা প্রতি সংখ্যায় বেরুবে।

অঙ্কটা ভারতীয়দের মাথায় ভালো খেলে। এই যে এখন কম্পিউটার নিয়ে এত হৈ চৈ—তারও ভিত্তি ভারতীয় চিন্তা। কম্পিউটার একটা গর্দভ, কোন অঙ্কই জানে না—শুধু জানে একটা জায়গা দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ গেলে এক, না গেলে শূন্য, এই দুটো মাত্র সংখ্যা নিয়ে কম্পিউটারের জটিল অংকশাস্ত্র, 'বায়নারি এ্যারিথমেটিক'—দশ না হয়ে যার ভিত্তি দুই। এই ভিত্তি তৈরীই হতো না যদি না 'শূন্য' বলে একটা চিন্তা আসতো। পৃথিবীর সভ্যতাকে ভারত এই 'শূন্য' উপহার দিয়েছে। সেই শূন্য দিয়ে কম্পিউটার চালিয়ে ওরা ওদের ভাণ্ডার পূর্ণ করছে—আমরা এখনও শূন্যতেই দাঁড়িয়ে।

নিকোই জিগ্যেস করে, "কাল আপনার কি প্রোগ্রাম ?"

"কিছু ঠিক নেই। ভাবছিলাম গ্রামের দিকে যাবো। কোথায় যাবো কি দেখবো একটু বলুন না ?"

"দরকার নেই। কাল আমার ছুটি, আমি আমার গ্রামে যাচ্ছি, সমুদ্রের কাছে। এখান থেকে এক ঘন্টার ড্রাইভ। রাত্রেই ফিরে আসবো। যাবেন আমার সঙ্গে !"

আমি খুশীতে প্রায় হাততালি দিয়ে উঠলাম। ঠিক হলো সকাল সাড়ে সাতটায় নিকোই আমাকে হোটেল থেকে তুলে নেবে।

এ্যাবি আমার দিকে চোখ টিপে বললো, "লাকি ইউ। এই যে এতদিন এক সঙ্গে কাজ করছি, আমাকে একদিনও নিয়ে গেল ?"

নিকোই আপত্তি করে, "বাঃ তোমাকে সেদিন নিয়ে খাওয়ালাম না। এর মধ্যে ভুলে গেলে !"

"দূর-সেতো তোমার আব্বার ফ্ল্যাটে। তুমি তো দাশগুপ্তর মতো আমাকে তোমার গ্রামে নিয়ে যাওনি।"

সুব্রহ্মনিয়ম আমার খুব কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, "আজ সন্ধ্যায় আসুন না আমার বাড়ী, দু চারটি খাবেন, একটু গল্প হবে!"

সুব্রহ্মনিয়মের বাড়ী শহরতলীতে। ওখানে উনি ট্রাউজার-সার্ট খুলে পাঞ্জাবী-ধুতি পরে ফেলেছেন। কপালে বড় চন্দনের ফোঁটা। দু হাত জোর করে অভ্যর্থনা জানালেন।

স্ত্রীও সেজেগুজে অতিথির জন্য তৈরী। মুখে হাসি লেগে আছে। চা মিষ্টি এলো, পরে খাবার এলো। আমি কিছু বললেই ঘাড়ের দুপাশে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলবেন—সব ব্যাপারেই একমত। তবে প্রথম প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ডানদিকে ঘুরে কন্টিনেন্টে গাড়ী চালাবার মতো, আমাদের বাঙালী 'না'কে মাদ্রাজী 'হ্যাঁ' বলে বুঝে নিতে ভুল হবার সম্ভাবনা।

জিগ্যেস করলাম, "এখানে কেমন লাগছে?"

"ভেরি গুড, অল রাইট।"

সব ব্যাপারেই 'ভেরি গুড' সঙ্গে 'অল রাইট'।

ওর তিনটি বাচ্চা—দুটি ছেলে একটি মেয়ে। তিনজনই ছোট, ওখানেই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ে। ওরাও অল রাইট। আর স্বামী? ওনার সব কিছু নিয়ম মত ঘড়ি মেপে চলে।

"উনি অফিস থেকে ফিরেই স্নান করবেন। তারপর পুজো করবেন। তারপর দু ঘণ্টা ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়াবেন। তারপর রাত্রের খাবার। তারপর ফাইল আর কাগজপত্র নিয়ে বসবেন। হাতে ক্যালকুলেটর নিয়ে। রাতে বেশীক্ষণ ঘুমোন না। সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে বেরুবেন। তারপর স্নান, পুজো আহ্নিক। তারপর চা-জলখাবার। সে সবের পর দেশ থেকে আসা সংবাদপত্র চিঠি পড়বেন। সময়মত অফিস যাবেন। ঠিক দুপুর একটায় অফিসের গাড়ী লাঞ্চের জন্য পৌঁছে দেবেন—ঠিক দুপুর দুটোয় আবার বেরিয়ে যাবেন। ওনার কাজই জীবন। সব সময়ই কাজ আর কাজ।" মহিলার কণ্ঠে একই সঙ্গে স্বামীগর্ব আর অভিমান।

আমি বললাম, "ভেরি গুড।"

এ হেন ঘড়ি-বাঁধা মানুষটির ঘরের দেয়ালের চারপাশে অসংখ্য দেবদেবী অতন্দ্র প্রহরী। সবাইকে চিনিও না ছাই। হিন্দুদের আবার তেত্রিশ কোটি দেবতা। সংখ্যাটা ঠিক আছে তো? ওটা ঠিক যে ওই সংখ্যাটা পাল্টাবে না। দেবতাদের মৃত্যু নেই, জন্ম নেই, কিন্তু অভিবাসন বা মাইগ্রেশন আছে, যখন তারা স্বর্গ ছেড়ে মর্তে আসেন নানা ছুতোয়। আমার ধারণা ওরা স্বর্গে থেকে থেকে 'বোরড' হয়ে যান। এই জন্য ওখানেও মাঝে মধ্যে দেবগণনা করে ব্যাপারটা পরখ করা দরকার। সঙ্গে আবার বাবারাও আছেন। এক বাবাকে অন্তত চিনলাম, আফ্রো-হেয়ার ছাইবাবা, যিনি মুঠো-মুঠো ছাই বেলান, যার ছবি থেকে নাকি রোজ ছাই পড়ে। ছাই দিয়ে কি হবে? সত্যি যদি এ্যাপ্রেনটিস দেবতা হন, খাবার দিন মশাই।

ঘরের চারপাশে স্তূপাকার সরকারী ফাইল কাগজ। আলমারীতে ভগবৎ গীতা, রামায়ণ, মোহনদাস গান্ধী এবং রামস্বামী নাইকারের জীবনী। বোঝা গেল, এখানকার বা ভারতের চাষীর মতো সুব্রহ্মনিয়মের ক্ষেত্রেও বাড়ী আর কাজের জায়গা আলাদা নয়। সত্যিই কাজপাগলা মানুষ।

খাবার সময় এলো শ্বেতশুভ্র স্বাদহীন ইডলী, হলদে মোড়কে আলু আর অন্যান্য নানা জিনিস মেশানো ধোসা, ঝোলা ঝোলা সম্বর, বাদাম-নারকেল দেয়া উপমা—এরকম আরো অনেক

কিছু। খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয়।

আমি জিগেস করি, "এখানের মানুষ কেমন?"

"অল রাইট। নিগ্রোদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই। দু বছর তো কেটে গেল। আর একটা বছর কোনমতে কাটাতে পারলেই হলো।"

"তারপর?"

"তারপর দেশের চাকরীতে ফিরবো। তবে চেষ্টা করছি রাষ্ট্রসংঘের এবং কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে অন্য কোথাও কাজ পেতে। জেনিভা বা আমেরিকায় যদি পাই খুব ভালো হয়। আমি ওদের বলেছি নিগ্রোদের দেশে আর দিও না—তিন বছর তো হয়ে যাবে এখানে।"

"নিগ্রো" কথাটা খট করে কানে লাগে।

"এখানে পড়াশুনো কাজ ছাড়া আর কিছু করেন না?"

"আর কি করবার আছে? ভারতীয় বন্ধুরা মাঝেমধ্যে আসেন, আমরাও ওদের বাড়ী যাই। এখানে ভারতীয় ব্যবসায়ী অনেক, তারপরে ডাক্তার বেশ কিছু ভারতীয়। কুমাসিতে এক ডাক্তার দাশগুপ্ত আছেন। তিনি কি আপনার আত্মীয়? এখানকার ভারতীয় হাই কমিশনের লোকজনও আছে। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা যাই। দেওয়ালীর সময় মোমবাতি দিয়ে বাড়ী সাজাই। ছেলেমেয়েবা আমাদের সমাজের মধ্যেই দল বেঁধে থাকে—খেলা করে।"

বৌ বলেন, "তারপর সিনেমা আছে, ভালো ভালো বোম্বের ফিল্ম আসে। নতুন কোন ফিল্ম এলেই দেখি।"

"কোলকাতার কোন ছবি আসে?"

"কোলকাতা? ওখানে ছবি হয় নাকি?"

"সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম আসে?"

"সত্যজিৎ রায়? নামটা শুনেছি মনে হয়। আমার তো ধারণা ছিল উনি কবি।"

"ঘানার লোকদের সঙ্গে কথা হয়?"

সুব্রহ্মনিয়ম বলেন, "অফিসে তো সবাই ঘানার লোক।"

"অফিসের বাইরে?"

"না। বিশেষ যোগাযোগ নেই।"

"এ্যাবি কেমন?"

"ভালো।"

"নিকোই?"

"বাঃ বাঃ। হাই সোসাইটির মহিলা পার্টি-নাচ নিয়ে আছেন।"

ওদের আরও নানা কথা জিগেস করি। নিশ্চয়ই এই দেশের মধ্যে অনেক ঘুরেছেন। এতো যখন জানেন সবকিছু।

"না। সে সব আর হলো কোথায়? সময়ই পাই না! আর আক্রার বাইরে কি আছে বলুন? এদের তাজমহলও নেই, মীনাক্ষী মন্দির বা মহাবলীপুরমের মতো মন্দিরও নেই। আক্রা বরং ভালো। এখানে আমাদের যা দেখার বা পাবার সব আছে। তারপর প্রতি শনি-রবিবারই হয় কোন ভারতীয় বন্ধুর বাড়ী যাই, নয় ওরা আমাদের এখানে আসে।"

এইভাবেই আলোচনা চলে। মিঃ এনসাইক্লোপিডিয়া, যাকে মিঃ ঘানাও বলা যায়, যিনি এতো জানেন, তাঁর সমস্ত বিদ্যাটাই পুঁথিগত। ঘানা ওর চাকরী, উনি বিশ্বস্ত চাকুরে। ঘানা না হয়ে অন্য যে কোন দেশ হলেও একইভাবে সমস্ত তথ্য আঙুলের ডগায় এনে ফেলতেন। সংখ্যার

বাইরে দেশটার বা এখানকার মানুষগুলোর কোন মূল্য ওর কাছে নেই।

১৯৪৭ সালে ভারতে একজন কাজের মানুষ এসেছিলেন—লর্ড র‍্যাডক্লিফ। তিনি কয়েক সপ্তাহ একটা জায়গায় ছিলেন, এবং সেই জায়গা ছেড়ে সোজা এয়ারপোর্ট হয়ে দেশে ফিরে যান। ভারতে তিনি বেড়াননি। বেড়িয়ে সময় নষ্ট করতে চাননি। ওর স্যুইট ভর্তি ছিল দুই ধরনের কাগজপত্র। গাদা গাদা মানচিত্র—যে মানচিত্রে সাত আট লক্ষ গ্রামের বিস্তারিত ছবি। গাদা গাদা সেন্সাসের বই—যেখানে প্রতি প্রদেশ, জেলা, মহকুমা, গ্রামের লোকসংখ্যা, ধর্ম, জাতি বলা আছে। ওই দুই তথ্য মিলিয়ে উনি ভারত ভাগ করলেন—দুটো দেশের সীমান্ত নির্ধারণ করলেন। সেই সীমান্ত প্রাকৃতিক কোন সীমানা ধরে হলো না। কাবো কারো বাড়ীর বৈঠকখানা আর রান্নাঘর দুই আলাদা দেশের মধ্যে পড়লো, কারো ঘর একপাশে জমি আরেক পাশে। লর্ড র‍্যাডক্লিফের কিছু এসে গেল না। উনি তো এসব দেখেননি, দেখতে চানওনি। কাজ শেষ করেই দেশে ফিরে গেলেন। যেমন মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম ফিরে যাবেন। ঘানাতে যাই ঘটুক,' 'অলরাইট', সবকিছুই 'ভেরি গুড'।

॥ তিন ॥

"তথ্যই কি সব ?" পরদিন গাড়ীতে যেতে যেতে আমি নিকোইকে বলি, "তথ্যর সঙ্গে জীবনকে না মেলালে সেই তথ্য কি সম্পূর্ণ হবে ?"

নিকোই বলে, "পিছনের সিটের ওপর ফ্লাস্কে কফি আছে। এখানকার খাঁটি কফি। ইচ্ছে করলে খাবেন।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলি, "আমাদের দেশে একটা রাজ্য আছে—কেরালা। প্রথম যখন রাজ্যে রাজ্যে আয়ের তুলনা করলাম, মনে হলো ওখানকাব মানুষ দারুণ গরীব। কিন্তু যখন ওখানে গিয়ে চোখে দেখলাম, খটকা লাগলো। জামাকাপড় চেহারায় তো তেমন গরীব নয়—শুধু জাতীয় আয় দেখে যা মনে হবে তার সঙ্গে মিল নেই। তারপর দেখলাম ওখানে মৃত্যুর হার ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কম, শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশী—এ দুটোর সঙ্গেও তো গরীবত্ব মেলে না ! পরে ভেবে দেখলাম ওই আয়ের হিসাবটা পুরো ভুল—কেননা ওই রাজ্যের লোক ভারতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে নানা কাজ করে, বাড়ীতে টাকা পাঠায়—যে হিসেবটা ধরা হয়নি।"

এই আলোচনার পর আরো দুটো তথ্য পেয়েছি। অধ্যাপক কে এন রাজ ও তার সহকর্মীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে বহু চাষী ওখানে ধান ছাড়াও প্রচুর টাপিওকা ফলায়। টাপিওকা কাসাভার মতোই একরকম খাবার—কিন্তু সরকারী হিসাবে যে কোন কারনেই হোক ওটা ধরা হয়নি। আজকাল আর একটা বড় আয়ের উৎস গালফের তেলের দেশগুলোতে চাকরী—সেখান থেকেও কম টাকা আসে না।

এর উল্টো উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি। জাতীয় আয়ের বিচারে মনে হবে ওখানকার লোকের অবস্থা খুব ভালো। কিন্তু ওখানে গেলে, ঘুরে দেখলে, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। আয় বড় বলে মনে হয়, যেহেতু চা-বাগানের উৎপাদনের মূল্য ধরা হয়—কিন্তু ওই টাকাটার সামান্যই ওই জেলায় খরচ হয়।

মোট কথা চোখে দেখতে হবে, ঘুরতে হবে, না হলে তথ্যের ফাঁকি ধরা পড়বে না। যাহা তথ্য তাহা সবসময় সত্য নয়। দুই আর দুই যোগ করলে সবসময় চার হয় না, সমাজের নিয়মে কখনো পাঁচ বা তিনও হয়ে যেতে পারে।

গাড়ী যাচ্ছে সমুদ্রের উপকূলের কাছ দিয়ে। নিকোই বললো, "আপনাকে আমি সাভানায় নিয়ে যাচ্ছি।"

সাভানা ? দারুণ অবাক হলাম। সাভানা তো হবে উত্তরে। পশ্চিম আফ্রিকার সর্বত্রই একটা ধরাবাঁধা ছক আছে। দক্ষিণে সমুদ্র এবং বালি। তার উত্তরে ঘন ট্রপিকাল রেইন ফরেস্ট। তার উত্তরে সাভানা। সাভানার আরো উত্তরে 'সাহেল' যেখানে ঘাস কম কাঁটাগাছ বেশী। যত উত্তরে যাবে ততো ঘাস কমবে আর ছোট হবে। তারপর সাহারা। দারুণ বৃষ্টি থেকে অনাবৃষ্টি, দক্ষিণ থেকে উত্তর—এটাই তো ছক।

নিকোই আমার অজ্ঞতা দেখে হাসে, "আমাদের এখানে তিন ধরনের সাভানা আছে। একেবারে উত্তরের সাভানাকে বলি 'সুদান সাভানা' যেখানে শুধু ঘাস। তার নীচে হলো 'গিনি সাভানা'—এখানে ঘাসের মধ্যে মধ্যে গাছ আর ঝোপ। ঘাসগুলো পাঁচ থেকে বারো ফিট অবধি হতে পারে। তারপর উপকূলের সাভানা, যেখানে আমরা যাচ্ছি। উপকূলে কেন 'সাভানা' হলো বলতে পারবো না। প্রকৃতির কতোরকম খেয়ালখুশী, সবকিছুতো ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে গিনি সাভানা আর উপকূল সাভানার মাঝখানটায় হলো জঙ্গল।"

ঘানার উপকূলের এই দিকটায় বৃষ্টি খুব কমই হয়— বছরে সাড়ে সাতশো থেকে নশো মিলিমিটারের মতো—আমাদের পশ্চিমবঙ্গের খরা অঞ্চল পুরুলিয়ার থেকেও তিনশো চারশো মিলিমিটার কম। অথচ এর ঠিক উত্তরের জঙ্গলে অনেক বৃষ্টি—এর প্রায় তিনগুন, বছরের এক বড় অংশ ধরে। জঙ্গলই অবশ্য ঘানার এক তৃতীয়াংশ। উপকূলের সাভানার আয়তন বড় না, মাত্র কুড়ি মাইল চওড়া—তবু ব্যাপারটা দারুণ অদ্ভুত। প্রকৃতির খেয়ালীপনা বা 'ফ্রিক'। তবে সেজন্য গরম বাড়ে না, যেহেতু সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। গাড়ীতে যেতে যেতে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এলো।

দুপাশে যেদিকে তাকাই ঘাস। ছোট ঘাস বড়ো ঘাস। সেই ঘাস পরিষ্কার করে, পুড়িয়ে গ্রামের পত্তন। গ্রামগুলো খুব বড় নয়। আক্রার কাছে ইটের বাড়ী, এ্যাসবেস্টাসের ছাদ, এই সব ডিজাইন চোখে পড়ে। যতদূরে যাওয়া যাবে মাটির বাড়ীর সংখ্যা বাড়বে। ওপরে ঘাসের ছাউনি, গোল বাড়ীর সমস্ত গোলটা যেন গম্বুজের মতো ওপরে উঠে একটা বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। ঘাসের ছাউনি দেবার ধরনটা আমাদের দেশেরই মতো। নীচ থেকে একজন ঘাসের আঁটিগুলো ওপরে ছুড়ে দিচ্ছে, ওপরে একজন বসে সেগুলোকে ঠিকমতো সাজিয়ে রাখছে।

নিকোইর গ্রামে ঢোকার মুখে এক দঙ্গল বাচ্চার অভিযান। ওরা একটা দারুণ চিৎকার তুলে পিছনে ছুটে এলো। অনেকেই চেষ্টা করলো গাড়ীর পিছনে উঠতে। যারা পারলো না তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো। নিকোই চালাচ্ছে আর চিৎকার করছে। ভাষা না বুঝলেও বুঝি বলছে, "এই বাচ্চা নাম। আসিস না এই রকম। চাপা পড়বি। এই ছোকরা ভাগ—মরলে আমায় দোষ দিস না।" পরে বুঝলাম ওরা কেন আঠার মতো এঁটে রয়েছে, যখন নিকোইর ঝোলা থেকে একগাদা চকোলেট বেরুলো ওদের জন্য। চকোলেট বিতরণপর্বে নিকোই কারো মাথা থাবড়ে দিচ্ছে কারো গাল টিপছে।

নিকোইর বাড়ীটা ইটের এবং কাঠের। অন্য বাড়ীর তুলনায় অবস্থাপন্ন। ওর মা ছুটে এলেন। সঙ্গে ভেঙে পড়লো বাড়ী ভর্তি পাড়া ভর্তি লোক—আমাকে দেখতে। সে এক দারুণ অস্বস্তি। সকলেই চোখ বড়ো করে দেখে, কলকল করে কি বলে। কোথাকার ? ভারত ? সেটা আবার কোথায় ? একজন ছেলে বললো, সে জানে ভারতের কথা। ওখানে দুটো ট্রাইব আছে—মুসলমান আর হিন্দু—যারা প্রায়ই ঝগড়া করে। ওদের জন্য দুটো আলাদা অঞ্চল—হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান।

মা. টুল দিলেন বসতে। পরে জানলাম এখানে চেয়ারের থেকে টুলের মাহাত্ম্য বেশী। চীফেরা সিংহাসনে বসে না, বসে সুন্দর করে তৈরী ও চামড়া দিয়ে মোড়া সাজানো টুলে। আমাকে যে টুলটায় বসতে দিলেন সেটা দেখে সিংহাসন বলেও মনে হতে পারে—এমন তার জাঁকজমক।

ওরা হলো ইউয়ে জাতি। ঘানার লোকসংখ্যার সবচেয়ে বেশী হলো আকানরা, তারপর ইউয়েরা—কিন্তু দুটো জাতির মধ্যে ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক অনেক মিল। একটা বড় তফাৎ

অবশ্য এই যে আকানরা মাতৃতান্ত্রিক, ইউয়েরা পিতৃতান্ত্রিক। ব্যাপারটা আগে শুনেছি, কিন্তু, ভালো বুঝিনা, তাই নিকোইকে জিগেস করি।

নিকোই বলে, "তফাৎটা হচ্ছে জমি বা সম্পত্তি কে পাবে তার বিচারে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, যেমন আপনাদের দেশে এবং আমাদের মধ্যেও, বাবা মরলে তার ছেলেরা মেয়েরা সম্পত্তি পাবে। আমাদের মধ্যে অবশ্য ছেলে মেয়ে সমান পায় না। মেয়েরা কম পায়। ছেলে মেয়েরা যদি বড় না হয়, মা-ই তখন ওদের হয়ে সম্পত্তি দেখে। কিন্তু আকানদের মধ্যে আলাদা—ওদের সম্পত্তি পাবে ওদের ভাগনেরা, ছেলেরা নয়। সম্পত্তি পাওয়াটা নির্ভর করবে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। অনেক সময়ই দেখবেন ছেলে বড় হয়ে মামার কাছে গিয়ে থাকছে, তারপর মামার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি পাচ্ছে।"

"এই রকম একটা ব্যবস্থা হলো কেন ? কেন ছেলে পাবে না ? সে কি দোষ করলো ?" আমি প্রশ্ন করি।

নিকোই বলে, "এইসব নিয়ম কিভাবে এলো বলা শক্ত। তবে এক সময় তো বিয়ে যাকে বলে ঠিক সেই রকম ছিল না। তখন একই মহিলার হয়তো অনেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সেই অবস্থায পিতৃত্ব ঠিক করাটা সহজ ছিল না, কিন্তু বোনের ছেলে যে আমারই সম্পর্কের সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আকানদের মধ্যে এই রকম নিযমের হয়তো সেটাও একটা কারণ।"

তারপর বলে, "এটা দেখে ভাববেন না যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদেরই শাসন চলে। দুটো জায়গাতেই পুরুষের কর্তৃত্ব, তফাৎটা শুধু মরে গেলে কে সম্পত্তি পাবে তাই নিয়ে। অবশ্য এটা ঠিক যে এর ফলে মেয়েদের দিকটা প্রাধান্য পায়, এবং অধিকারও বাড়ে। আমাদের এখানে অনেক মাতৃতান্ত্রিক জাতের চীফেদের বোনকে বলে 'রানী', বৌকে না, কেন না সে মারা গেলে বোনের ছেলেই চীফ হবে। রাজপুত্রের মা হলো রানী, রাজার বউ না। ব্যাপারটা খুব মজার তাই না ?"

আমি হাসি আর শুনি।

"এখানে দেখবেন কাজের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে তফাৎ খুব বড় না। বরং মেয়েরা অনেক বেশী খাটে। পরিবার এক হলেও; স্বামী-স্ত্রী-ছেলে সকলের আলাদা আলাদা জমি। প্রত্যেকে আলাদা করে চাষ করবে। মেয়েরা সাধারণত খাবার বানায়, ছেলেরা তৈরী করে বিক্রী করবার জন্য শস্য। মেয়েদের দাযিত্ব হলো সংসারকে খাওযানো। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু তৈরী হলে বিক্রী করে টাকাটা রাখবে মেয়েরাই। পুরুষরা অনেকেই আবার যায় খনিতে বা বাগিচায় কাজ করতে। সেক্ষেত্রে এরা বৌকে নিজের জমিটা দিযে যায়—উৎপাদনের আদ্ধেক আদ্ধেক ভাগ হয়।"

শুনে আমার সবকিছু গুলিয়ে যায়। আমাদের দেশের ছক হচ্ছে, বাবার কর্তৃত্ব, জমি একটাই, উৎপাদন এক জায়গায় আসবে। বৌয়ের আলাদা জমি ছেলের আলাদা জমি এ কেমন ?

নিকোই বলে, "কারণটা হয়তো বহুবিবাহ। একজন মানুষের তিন চারটে বৌ থাকলেও প্রত্যেকের আলাদা কুঁড়েঘর বা নিদেনপক্ষে আলাদা আলাদা ঘর। প্রত্যেক বৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা থাকবে, নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার তৈরী করবে। হয়তো কোন বৌয়ের ওপর যাতে অবিচার না হয় সেটা দেখবার জন্যই এই ব্যবস্থা। আগে বেশী বউ থাকা ছিল সম্মানের ব্যাপার। সংসার বড় হলে লোকবলও বড়। আজকাল অবশ্য সে সব বিশেষ হয় না—একটা বিয়ে করেই মানুষ হিমসিম খায়। সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকাতেই বৌ পেতে হলে মূল্য দিতে হয়—আপনাদের দেশে শুনেছি উল্টো। ভালো অবস্থা না হলে কজন পুরুষ বৌয়ের জন্য এতো টাকা দেবে বলুন ? বৌয়ের সম্পত্তি, বিষয় ও জমি আলাদা। যদি আপনার জমিতে বাড়তি

লোক লাগে, শ্রমিক লাগাতে হবে। বৌ ছেলে, সাধারণতঃ কাজ করবে না। তবে গ্রামে গ্রামে এখন দলবাঁধা শ্রমিকের দল আছে—মেয়েদের ছেলেদের আলাদা দল। কিন্তু মজুরী এক—পুরুষরা বেশী পায় না। মেয়েরা মাথায় বালি বয়, সালোটের জমি তৈরী করে। সালোট মানে পেঁয়াজ-রসুনের মতো একটা জিনিস। এখানকার জমিতে খুব ভালো হয়।"

"সমস্ত ঘানাতেই কি এক রকম?"

"না। তবে অনেকগুলো মিল আছে, আবার তফাৎও আছে। উত্তরের গিনি সাভানায় গা বলে একটা জাতি আছে। ওরা আমাদের ইউয়েদের মতোই পিতৃতান্ত্রিক। কিন্তু স্বামী আর স্ত্রী একসঙ্গে থাকে না। স্বামী থাকে নিজের বাবা-দাদা-ভাইদের সঙ্গে একটা কম্পাউণ্ডে। স্ত্রীও থাকে তার নিজের বাবা-কাকার সঙ্গে। ছেলেরা থাকে স্ত্রীর সঙ্গে। বড় হলে বাবার কাছে চলে যায়। বৌ খাবার তৈরী করে স্বামীকে পাঠায়—বাচ্চারা দিয়ে আসে। পুরুষরা অনেক সময় তাদের আলাদা আলাদা বৌয়ের তৈরী খাবার একসঙ্গে মিলে খায়। স্বামী না ডাকলে বৌ তার বাড়ী যায় না। আকানদের মধ্যেও স্বামী আর স্ত্রী তাদের নিজেদের আত্মীয়দের সঙ্গে আলাদা থাকে। দুই বাড়ীর আলাদা কর্তা, আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। তেরো বছর বয়সে ছেলেরা মাকে ছেড়ে বাবা বা মামার কাছে গিয়ে থাকে। আকানরা মায়ের দিকটাকে বলে আবুসুয়া। এইরকম নানা ব্যবস্থা আছে। এশিয়া বা ইউরোপের মতো নয়। বেশ জটিল। কিন্তু সমাজের সবাই নিয়মগুলো ছোটোবেলা থেকেই জানে। ওদের ভুল হয় না।"

আমরা গ্রামের পথে হাঁটতে বেরোই। পিছনে একদঙ্গল বাচ্চা, যেন এক মিছিল। নিকোই বলে, "এখানে বৃষ্টি এক বড় সমস্যা। কখনো হলো কখনো হলো না। এমনি খুব কম বৃষ্টি, কিন্তু হঠাৎ হয়তো দারুণ বৃষ্টি হয়ে জল জমে গেল। জমি দেখছেন একেবারে সমান, জল গড়িয়ে যাবার উপায় নেই।"

এখানে ঘাসের বন পরিষ্কার করে সালোটের চাষ হচ্ছে। মাঝে মধ্যে নারকেল। আগে নাকি নারকেলই বেশী ছিলো।

পথে একজন বয়স্ক মানুষকে দেখে নিকোই হাত নাড়লো। ঢোলা জোব্বা পরা মানুষটাকে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হলো। ওদের মধ্যে আমাকে নিয়ে কি সব ওদের ভাষায় কথা হলো। ভদ্রলোক হাসলেন। ঘানার মানুষের মুখে হাসি লেগেই থাকে। নিকোই বললো, উনি এখানকার ওয়াটাটো—মানে ওদের বৃহত্তর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক এবং প্রধান। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে সুশোভিত টুল এর জন্য বরাদ্দ। নারকেল গাছ কাটতে হলে ওয়াটাটোর অনুমতি নিতে হবে। আরো দশটা কাজে উনিই মূল পুরোহিত। কেউ বড় হয়ে বিয়ে করে জমি চাইলে আবেদন করতে হবে ওয়াটাটোর কাছে। উনি দেখবেন ওর কতটা জমি দরকার, এবং সেই অনুযায়ী জমি বরাদ্দ হবে।

নিকোই ব্যাখ্যা করে বলে, "জমিতে কারো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। যে জমিতে আপনি চাষ করছেন সেটা সমাজ আপনাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে মাত্র। সমাজ মানে প্রধান বা চীফ। একসময় প্রতি বছর চীফ নতুন করে জমি বণ্টন করতেন। এখন অবশ্য আর সেটা হয় না। এখন প্রত্যেকে একই জমি বছরের পর বছর ভোগ করেন। কিন্তু তিনি মারা গেলে আবার নতুন করে বৌ বা ছেলেকে অনুমতি নিতে হবে ওই জমি চাষ করবার জন্য। আজকাল অবশ্য অনুমতিটা আনুষ্ঠানিক, চীফকে একটা কিছু উপহার দিলেই চলবে। নারকেল, কোলানাট এই সবই হচ্ছে উপহার। তবে এখনও চীফের অধিকার আছে আপনাকে সমাজচ্যুত করবার, আপনার অধিকার কেড়ে নেবার। সেই সিদ্ধান্তের ওপর কোন আপিল নেই।"

"জমি কি বিক্রী করা যায় না?"

নিকোই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজনকে দেখে হাত নাড়তে নড়তে বলে, "না। একদম না। এই অঞ্চলে হয়ই না বলা যায়। কিন্তু অন্য কোন কোন অঞ্চলে বেআইনীভাবে হয়। জঙ্গলের জমিতেই বেশী, যেখানে কোকোর চাষ হয়। এর জন্য চীফকে ঘুষ দিতে হয়। বলা হয়, জমিটা যারা সার্ভে করছে তাদের মদ খাওয়ার জন্য টাকা দিলাম। এটা ঘুষ ছাড়া কি বলুন? দামটাও দেয় লুকিয়ে। বলে না জমির জন্য দিলাম। জমির সঙ্গে হয়তো সামান্য কিছু সার কিনলো—প্রচুর দাম দিয়ে, বলা হলো সারের জন্যই পয়সা দিচ্ছে জমির জন্য নয়। অমুক অল্প কদিনের জন্য দখল নিচ্ছে মাত্র, পাকাপাকি নয়। আসলে কিন্তু বিক্রী। কিন্তু এই ছলনাটা দরকার।"

তারপর আর একজনকে হাত নেড়ে, একটা বাচ্চাকে সামনে থেকে সরিয়ে বলে, "তবে জমি বিক্রীর থেকেও অন্য আরো দশরকমের জিনিস বেশী হচ্ছে। আপনি ধার নিযে জমি বন্ধক রাখলেন—যার নাম 'ওবা'—তারপর ধার না শোধ করতে পেরে ওই জমিটা সত্যি সত্যি যে ধার দিলো তার হয়ে গেল। তারপর প্রজাস্বত্ব দেয়া, বর্গাদারী দেয়া তো আখছার হচ্ছে। এই অঞ্চলে অবশ্য খুব একটা হয় না। কিন্তু যে সব অঞ্চলের থেকে বাইরে বেশী লোক যায় সেখানে প্রবণতা হচ্ছে জমিটা প্রজাকে দিয়ে যাওয়া। এ সবই কিন্তু আমাদের সনাতনী জমির নীতির বিরুদ্ধে। যে বছরের পর বছর গ্রামে না থেকে শহরে তারও জমিতে অধিকার আছে—কিন্তু জমিটা অন্যকে দিয়ে বেআইনীভাবে ভাগে চাষ করাচ্ছে। আগে এসব ছিল না, কিন্তু গ্রামে যতো টাকা ঢুকছে, যতো গ্রামের লোক বাইরে কাজের জন্য, যাচ্ছে, বাইরের লোক যতো গ্রামে আসছে কাজের জন্য, যতো কফি কোকো চাষ হচ্ছে, বাজারে বিক্রীর জন্য চাষ হচ্ছে, ততো সামাজিক মালিকানা আর সামাজিক থাকছে না—জমিটা বাস্তবে ব্যক্তির মালিকানায় চলে যাচ্ছে। সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকায় এখন এই জিনিস ঘটছে।"

একজন মহিলা এসে নিকোইকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তারপর আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। নিকোইর দীর্ঘ ব্যাখ্যা। বুঝলাম, এখানে প্রাইভেসি বলে কিছু নেই। সবাই সবকিছু জানে এবং জানতে চায়। ভারতেও এটাই নিয়ম—কিন্তু বৃটেনে এইভাবে জানতে চাওয়াটা অশালীনতা। বৃটেন থেকে ভারতে ফিরে ট্রেনে উঠে তাই খুব অস্বস্তি লাগে যখন স্বল্পচেনা মানুষও জানতে চায় চাকরী কি? মাইনা কত? প্রোমোশন হবে কিনা? এ্যালাওয়েন্স দেয় কতো? এখানকার সমাজটা ওই একই ধাঁচের।

আমি জিগেস করি? "কোন বাইরের লোক কি সনাতনী নিয়ম মেনে জমি কিনতে পারবে না?"

"কিনতে পারবে না, তবে এমনি জমি পেতে পারে। এক সময় নিয়ম ছিল, কেউ যদি ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে কয়েকবছর কোন জমিতে চাষ করে, তাহলে বাইরের লোক হলেও সমাজ তাকে নিজের লোক বলে মেনে নেবে। বিশেষ করে জঙ্গলে এটা হতো, যেখানে বাইরে থেকে লোক কোকোচাষের জন্য আসতো। তখন অবশ্য জমি অনেক ছিল। এখন সে সব হবার যো নেই। এখন, আগে যেটা বললাম, সনাতনী নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চীফকে ঘুষ দিয়ে কিনতে হবে। এখন অবশ্য সরকারও আর ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে পারছেন না। খাজনা ইত্যাদি নিয়ে আইন হয়েছে, মামলাও খুব হয়। জমি নিয়ে মামলা হবার কোন উপায় সনাতনী নিয়মে ছিল না। সবই পাল্টাচ্ছে।"

একজনের বাড়ীতে ঢুকলাম। তারা বেশ হৈ চৈ করে নিকোইকে সম্বর্দ্ধনা জানালো। বুঝলাম নিকোইও একজন বেশ গণ্যমান্য মানুষ। আবার টুল এল। ডাবের জল দিলো। প্লেটে করে কোলানাট দিলো। বড় বড় বাদাম। খেলে বেশ নেশা হয়। এই বাদাম সবচেয়ে বেশী তৈরী হয়

ঘানায়, যেখানে মুসলমান মাত্র শতকরা বারোভাগ, কিন্তু বিক্রী হয় মূলত মুসলিম দেশে। ওই বাদাম বেশী খেলে নেশা হয়—কিন্তু পানীয় নয় বলে ইসলামের আইনে খেতে বাধা নেই। সম্প্রতি অবশ্য সৌদি আর'বিরা এই বাদাম খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমি একটু খেয়ে দেখলাম মাথা ঝিমঝিম করছে। আর খেলাম না।

ওই বাড়ীর দেয়ালে মানুষের মাথার খুলি। ছোট বেলাকার কুসংস্কারগুলো যখন ফিরে আসার উপক্রম করছে তখন নিকোই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো, "এটা ওদের ঠাকুর্দার মাথার খুলি। আমাদের কাছে পূর্বপুরুষ এক বিরাট কিছু। আমরা ধরে নিই ওরা মরেন নি এখনও বেঁচে আছেন। আমাদের জমি সম্পত্তি সব ওদের—আমরা শুধু পূর্বপুরুষের হয়ে দেখাশোনা করছি। ওরা আসেপাশেই আছেন—আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছেন। আমাদের মুখোস পরে নাচা মানে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আমরা ধরে নিই ওই মুখোসের মধ্যে ওদের আত্মা লুকিয়ে। জমি না বিক্রী করাব সেটাও একটা কারণ। আমরা ধরে নিই জমিটা পূর্বপুরুষের—ওই জমি হস্তান্তরের কোন অধিকার আমাদের নেই। অনেকে তাই মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের মাথার খুলিটা রেখে দেয়। উৎসবে, আনন্দে ওই খুলিতে মদ ভরে খায়—যেন পূর্বপুরুষের সঙ্গে ভাগ করে পান করছি। আপনাস হয়তো এটা একটু বীভৎস মনে হতে পারে। এই গ্রামে আর হয়তো একটা দুটো বাড়ীতে এরকম মাথার খুলি দেখবেন—কিন্তু বাকিরা আজকাল আর রাখে না। জমিই যখন বিক্রী হচ্ছে হস্তান্তর হচ্ছে তখন পূর্বপুরুষকে কে মানে বলুন?"

সনাতনী পশ্চিম আফ্রিকার সমাজের বিশ্বাস ইত্যাদি অনেকখানি হিন্দুদের মতোই। একগাদা দেবতা, দেবতার মধ্যে আবাব শ্রেণী ভেদ। কেউ বড় দেবতা কেউ ছোট দেবতা। বাতাস, জল, আকাশ, ঝড়, জঙ্গল সবই দেবতা—যেমন হিন্দুদের মধ্যেও। যা দেখে ভয় পায় অবাক হয় তাকেই দেবতা বানায়। হিন্দুদের মতোই ভূতপ্রেত দত্যি-দানবের ছড়াছড়ি, রোজায় ওঝায় হাতুড়ে ডাক্তারে বিশ্বাস।

সনাতনী ধর্মে বয়স্কদের খুব সম্মান। কাবণটা দু তিন রকমের। একটা জন্মগত—ওই মানুষগুলোই আমাদের পৃথিবীতে এনেছে। আর একটা জ্ঞানগত—বয়স্ক মানেই অনেক বেশী জানে। বলতে পারবে চাষ কি করে করতে হয়, পোকা কেমনভাবে তাড়াবে, অসুখের চিকিৎসো কি, অন্য গ্রামের সঙ্গে বিনিময় কি করে হবে, যুদ্ধের নিয়ম কৌশল কি? আজকাল আর বড়দের সেই সম্মান নেই। এখন জ্ঞান-আহরণের মাধ্যম স্কুল, বই। এখানে শতকরা ষাটভাগ মানুষ সাক্ষর। বড়োদের টুলের কাছে বসে ইতিহাস জানবার জ্ঞান পাবার আগ্রহ তাই কমেছে। যেমন নাইজিরিয়ায় তেমনি এখানেও, বড়দের ভয় ছোটরা ওদের আর মানছে না।

বয়সটা তবু গুরুত্বপূর্ণ। বয়স ধরে ধরে বন্ধুত্ব হয়, এবং সেই বন্ধুত্ব সারা জীবন থাকে। এক বয়সের সমস্ত ছেলে যেন একটা গ্রুপ—ওরা একসঙ্গে ঘোরে, গল্প করে, পরস্পরকে সাহায্য করে। সনাতনী সমাজে দু-তিন পরিবার এক হয়ে পরস্পরকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করতো, সেই ব্যবস্থার নাম ছিল—ফিডোডো। সেই ফিডোডো আর এখন নেই, কিন্তু বয়স ভিত্তিক পারস্পরিক সাহায্য এখনও আছে। আমাদের দেশের আই-এ-এসদের ভাষায়, এরা যেন 'ব্যাচ-মেট'।

বয়স ধরে বন্ধুত্বের একটা কারণ হলো বয়ঃসন্ধির উৎসব। পৃথিবীর সব সমাজেই বলা যায় ছোট থেকে বড় হওয়ার ঘটনাকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। এখন যেসব দেশে ভোট আছে সেখানে একুশ বছর বা আঠার বছর বয়সে ভোটার তালিকায় নাম ওঠা যেন বড় হবার স্বীকৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা বা চাকরী শুরুও আধুনিক সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সূচক। আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে উপনয়নের উৎসবই ছিল সেইরকম একটা কিছু। পৈতে পরা মানেই বড় হওয়া।

দুটো সুখদুঃখের কথা আছে। ওরাও বাজায় শ্রোতারাও চিৎকার করে কথা বলে। ওরা গল্পটা জানে। সেটাও আর এক 'ডায়ালগ'। সব মিলে দারুণ জমে গেল।

ফেরার পথে গাড়ীতে নিকোই বলে, "ছুটিছাটা হলেই আমি এখানে আসি, আর কোথাও যাই না।"

সমুদ্রে যাওনা ? ভোল্টা হ্রদ দেখতে যাওনা ? অন্য দেশে যাওনা ? বেড়াও না ? সব কিছুর উত্তর "না।" কিন্তু কেন ? তোমার তো গাড়ী আছে, তুমি উচ্চশিক্ষিত, বিদ্যাবতী—তোমার কি ইচ্ছে করে না বেড়াতে ?

নিকোই বলে, "বেড়াইনি একদম তা নয়। সমুদ্র, হ্রদ এসব কয়েকবার গেছি। বিদেশেও গিয়েছি। কিন্তু মনের স্বাদ মেটে না। সবটা কেমন কৃত্রিম মনে হয়। যেন সবাই যায় বলে গিয়েছি—যেমন ফ্যাশন করতে হয় বলে কিছু কিছু করি। কিন্তু এখানে এলে মনের ব্যাটারীটা যেন রিচার্জড হয়ে যায়। সমস্ত বকম ক্লান্তি অবসাদ চলে যায়। সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকি গ্রামের দিকে—শনিবার এলেই তৈরী। এখানে আমার মায়ের জমি সুযোগ পেলে চাষ করি। আব কিছু না হোক মাটিটা হো দিয়ে একটু খুঁটিয়ে দিই বা আগাছা তুলি। তুমি করে দেখো তোমারও ভালো লাগবে। তারপর এই যে নাচ হলো, তুমি না থাকলে আমিও ওদের সঙ্গে ভীড়ে যেতাম। আজকে কেমন আমি একটু লজ্জা হলো, তুমি কি ভাববে ?"

কথাগুলো শুনে প্রথমে অবাক হলেও পরে দেখলাম অবাক হবার কিছু নেই। আফ্রিকার শিক্ষিত প্রথম দুই পুরুষের এলিট বহু জায়গাতেই এইরকম। ওরা বিশেষ সমুদ্রে যায় না, পাহাড় দেখে না, বা প্রদর্শনী দেখার জন্য বিরাট সময় দেয় না। শহরে যতো দিনই থাকুক, পদ যতো বড়ই হোক, মনটা গ্রামে পড়ে থাকে। শহরবাসটা যেন ফালতু, টাকা রোজগারের জন্য। দেহটা শহরে থাকলেও মনটার বাস গ্রামে। এবং শুধু কি আফ্রিকায় ? দেশভাগের আগে পূর্ব বাঙলার কোলকাতায় চাকুরে মধ্যবিত্ত কি একইভাবে ভাবতো না ? এখনও কোলকাতার বাসিন্দা বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার মানুষগুলো পারলেই কি গ্রামের দিকে ছোটে না ?

তফাৎটা মূলত সংস্কৃতির সমাজের এবং অভ্যাসের। এই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন আগের থেকে অনেক বেশী বেড়াতে বেরোয়, তার বোধহয় দুটা বড় কারণ আছে। এক, যারা বেড়োয় তাদের সিংহভাগ শহরের মানুষ, বিশেষ করে কোলকাতার—যাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দুই, এদের ক্ষেত্রে যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধনও দুর্বল। বেড়ানো মানে একটা ঝামেলা, যতো বেশী মানুষ ততো বেশী ঝামেলা। থাকবে কোথায়, খাবে কি, কিভাবে ভীড়ের মধ্যে বাসে বা ট্রেনে উঠবে, হারিয়ে যাবে না তো—এইসব চিন্তা তো রয়েছেই। সেই সমস্যা অনেকখানি কমে যায় যখন পরিবার মানে স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের বেশী নয়—সঙ্গে হয়তো শালী, বা বন্ধু বাস। পরিবার যতো আনবিক রূপ নিচ্ছে, ততো বেড়ানোর ঝোঁক এবং সম্ভাবনা বাড়ছে। তাছাড়া খরচপত্রের ব্যাপারটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—বরং, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে সেটাই মূল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেক সময় অফিস থেকে বেড়াবার টাকা পাওয়া যায়—কিন্তু তার দাবিদার একেবারে নিজস্ব পরিবারের বাইরে কেউ নয়। এগুলোও বেড়াতে বেরোবার পিছনে কম বড় কারণ নয়। সবাই একমত হবেন যে বেড়ানোটা খুব ভালো জিনিস।

নিকোই শিক্ষিত মেয়ে—কিন্তু বেড়াতে চায়না। গ্রামে আসাটাই ওর বেড়ানো। ওর সমাজ এখনও গ্রামভিত্তিক। আক্রার প্রতিটি মানুষের পরিচয় তার গ্রাম ধরে জাত ধরে। তাছাড়া সমস্তরকম দুর্যোগ সত্ত্বেও যৌথ পরিবার, বা অনেকগুলো পরিবার নিয়ে একটা বড় পরিবার এখনও ওখানে রয়েছে। দুই ভায়ের ছেলেরা একসঙ্গে খেলে—ওদের কাছে বাবা-খুড়ো-জ্যাঠা তফাৎটা

বড় নয়।

অথচ আক্রার নিকোই আর গ্রামের নিকোইর জীবন এক নয়। একটা হলো 'হাই লাইফ', আর একটা নিতান্ত গ্রামীণ। মিলবার কথা নয়। মেলে কি ? না মিললেও পাশাপাশি চালাতে অসুবিধা হয় না কি ?

নিকোই বলে, "না হয় না। শহরের ইউরোপীয় ধাঁচের ক্লাবের স্টিল ব্যাণ্ড, ইলেকট্রিক গিটার আর বল ডান্সের সঙ্গে ওখানকার ওই গাছের ফাঁপা গুঁড়ি দিয়ে তৈরী পার্চমেণ্টে ঢাকা ড্রামের বাজনা নিশ্চয়ই মিলবে না। কিন্তু গ্রামে যাবার পথে গাড়ীতে যেতে যেতে মাঝ রাস্তাতে আপনা-আপনি মনের টিউনিং পাল্টে যায়। তারপর যখন ফিরি, আক্রার আলো চোখে পড়লেই আবার অন্যরকম হয়ে যাই। আমরা হচ্ছি সত্যি সত্যি ডাঃ জেকিল আর মিস্টার হাইড। তবে কোনটা জেকিল কোনটা হাইড বলতে পারবো না।"

"তোমার গ্রাম তো এইরকম থাকবে না ?"

"সেটা জানি। আমার ছোটবেলার গ্রাম আর এখনকার গ্রাম এক নেই, প্রচুর পাল্টেছে। এখন শহর, ব্যবসা, টাকাই বড়ো। সামাজিক মালিকানা চলে যাচ্ছে। পরে আইন করে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বসবে।শহরে এখনই ব্যক্তিগত মালিকানা আছে—গ্রামেও হবে। লোকে এখন শস্য তৈরী করে নিজের জন্য নয়,বাজারের জন্য। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে অনৈক্য দারুণ বাড়ছে। আগে আমাদের সমাজে যে সমতাটুকু ছিল সেটা আর নেই। এখন রেষারেষিটাই বড় হয়ে উঠছে।"

"শুনেছি আফ্রিকার কোন কোন দেশে ওরা এই সামাজিক মালিকানা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আইন করছে। এখানে সেরকম করা যায় না ?"

"করা যায়, তবে লাভ নেই। আইন কবে কোন সনাতনী নিয়ম বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আগেকার চীফেরা একভাবে চলতো—গত একশো বছরে, বৃটিশ প্রভাবে, ওরাও দারুণ পাল্টে গিয়েছে। সামাজিক মালিকানা মানে এখন ওদের খবরদারী—সেটা হয়তো আরো খারাপ। আগে নিয়ম ছিল চীফ অন্য দশজন গ্রামের বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত করবে—এখন আর হয় না। এর ফলে সনাতনী আধুনিক দুটো ব্যবস্থারই খারাপ দিকটাই পাচ্ছি। জমি বিক্রী হচ্ছে, প্রজা বসছে অথচ দলিল নেই। কৃষি আধুনিক করা যাচ্ছে না, ব্যাঙ্ক ধার দেবে না—কেননা দলিল নেই। কেউ জমিতে টাকা ঢালবে না, যেহেতু জমির মালিকানার ব্যাপারটা অস্পষ্ট—যদি ওই জমি হাতছাড়া হয়ে যায়! সমস্ত সমাজটি যখন ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে চলছে, সেখানে শুধু গ্রামের জমিতে সামাজিক মালিকানা চালিয়ে রাখা যাবে না। শহরে ব্যক্তিগত মাইনা, গ্রামের চাষে বাজারের প্রাধান্য—এর সঙ্গে সনাতনী সমাজ মেলে না। এখন মানুষ বড় স্বার্থপর। ভবিষ্যতে যদি সমবায় বাড়ে বা অন্য কোন ব্যবস্থা আসে সেটা অন্য ব্যাপার—কিন্তু এখন যে সামাজিক মালিকানা এখানে দেখছো তার অনেকখানিই জোর করে রেখে দেয়া।"

সামাজিক মালিকানা, ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক, গ্রামীণ সত্তা, অথচ এর মধ্যেই স্বামী-স্ত্রী-ছেলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চাষের অধিকার। জটিল সন্দেহ নেই। সামাজিক মালিকানা হয়তো এভাবে চলবে না, ব্যক্তিবাদী বন্যার প্রচণ্ড তোড় কতোদিন ঠেকিয়ে রাখবে ? কিন্তু একটা ভালো দিক এখনও রয়েছে, সেটা নিকোইকে বলি।

"তোমাদের এখানে অনৈক্য অনেক কম। সমস্ত সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকাতেই অনেক কম। তুমি হয়তো বলবে অনৈক্য বাড়ছে, বা বলবে শহরভিত্তিক অনৈক্যের কথা, কিন্তু গ্রাম যদি ধরি এবং এশিয়ার কথা ভাবি বা ল্যাটিন আমেরিকার কথা ভাবি, তুলনাই হয় না। এখনও যে

অনেকখানি সমতা তোমাদের গ্রামীণ সমাজে রয়েছে তার এক বড় কারণ ওই সামাজিক মালিকানা। জমির মালিকানা ব্যক্তিগত হলে, দলিল পেলে, বিক্রী বাড়বে। এবং বিক্রী বাড়া মানেই অল্প লোকের হাতে বেশী জমি চলে যাওয়া। হয়তো সেইটাই এখন লুকিয়ে-চুরিয়ে হচ্ছে—কিন্তু পরে বড়ভাবে খোলাখুলি হবে। সেটাই হয়তো ভবিষ্যৎ, কিন্তু ভাবতে খারাপ লাগে যে এই সমতা রাখা যাবে না।"

এখানে ভূমিহীনতা নেই—যেটুকু আছে সেটা বাইরে থেকে আসা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। মজুর খুবই কম, এশিয়ার তুলনায়, কিন্তু ওদের সংখ্যাটা একটু একটু করে বাড়ছে। অবশ্য কোকো, কফি বা অন্যান্য পন্য চাষের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বাইরের অঞ্চল থেকে আনা মজুর ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের মতো সাধারণ খাবার তৈরী বা অন্যান্য চাষের কাজে মজুর এখনও ব্যাপকভাবে লাগানো হয় না।

তবু আফ্রিকা পাল্টাচ্ছে। ভীষণভাবে পাল্টাচ্ছে। প্রবণতা এশিয়ার দিকে যাবার। ব্যক্তিগত মালিকানা, মজুর দিয়ে চাষ, বিক্রীর জন্য চাষ, ভূমিহীনতা, শ্রেণীভেদ, অনৈক্য—ওই দিকে। এখনও এখানে জোতদার আসেনি, কিন্তু আসবে। চীফেরাই প্রথম জোতদার হবে। এখন ওরা সমাজের নেতা—সমাজের হয়ে মাতব্বরি করে। তখন মাতব্বরিটাই শুধু থাকবে, এবং সেটা হবে সমাজের খরচায়। ওরা বড় বড় জমির মালিক হবে, পায়ের ওপর পা তুলে অন্যদের দিয়ে চাষ করাবে। এই প্রক্রিয়া কেনিয়াতে দেখেছি। উত্তর আফ্রিকায় একশো বছর হলো এটা হয়েছে—ভারতের দুশো বছর আগে। ঘানা ব্যতিক্রম হবে না।

'দাও ফিরে সে অরণ্য' বললেও অরণ্য ফিরে আসে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে জঙ্গল তৈরী করলেও সেটা অন্য জঙ্গল—ইউক্যালিপটাস, সুবাবুল বা অন্য কিছুর, বাইরে থেকে আনা। জঙ্গল তবু পরিকল্পনা করে খাড়া করা যায় আবার, কিন্তু যে সমাজ পাল্টায় সেটা আর ফিরে আসে না। সেইটাই সত্য—হাহুতাশ করাটাই ভুল, বরং নতুন পথের অনেক অনেক দূরে হয়তো কখনো আর একটা বড় বাঁক আসবে।

নিকোই বাঁ হাত দিয়ে আমার সামনের কম্পার্টমেন্টটা খুলে একটা গানের টেপ স্টিরিওতে ঢোকালো। সুরটা আফ্রিকান এবং ইউরোপীয় মেশানো—'অনমিয়া-য়া-য়া-য়া', এইরকমই একটা কিছু। খানিকটা একঘেঁয়ে। গাড়ী ছুটছে, চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। হেড লাইটের আলোয় শুধু সামনের রাস্তা চোখে পড়ে। ওপাশ দিয়ে আসা গাড়ীও দু একটা মাত্র।

ইতিমধ্যে আমরা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছি। এই অধঃপতনের চেয়ে মিষ্টি কিছু হতে পারে না। ইংরাজীতে অবশ্য দুটোই 'ইউ'। তাই মনে হতে পারে এই নেমে আসাটা পুরোপুরি আমার মনের ব্যাপার। কিন্তু না—একটা তফাৎ আছে। আনুষ্ঠানিক আলাপ পদবী ধরে উপাধি ধরে—মিস নিকোই, ডঃ দাশগুপ্ত। পরবর্তী পর্যায়ে মিস বা ডঃ বাদ দিয়ে শুধু নিকোই বা দাশগুপ্ত। তার পরের পর্যায়ে প্রথম নাম ধরে ডাকা। নিকোই এখন আমাকে 'বিপ্লব' বলছে, আমি অবশ্য 'নিকোই' বলছি, ওর প্রথম নামটা মনে পড়ছে না বলে। যতদূর মনে পড়ছে প্রথম নামটা বিচ্ছিরি, দাঁত ভেঙে যাবার মতো, ওই সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে একদম মানায় না। নিকোই অনেক ভালো শোনায় কানে। ওর প্রথম নামটা যে মনে করতে পারছি না সেটা হয়তো অনেকে বলবেন, 'ফ্রয়েডিয়ান স্লিপ'।

নিকোই বলে, "এই যে জাতীয় আয়ের আলোচনা। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই এর পেছনেও একটা দর্শন বা মূল্যবোধ আছে। ব্যাপারটা শুধু যোগ-বিয়োগের নয়। আমরা সবাই আমাদের মাথাপিছু আয় তুলনা করি আমেরিকা বা সুইডেনের সঙ্গে। হিসেব করে দেখি ওদের কতো কাছে বা দূরে—কে আগে ওদের দিকে ছুটছে, কারা আমাদের হারিয়ে দিল। আমরা

হিসেব করে দেখি, যে হারে আমাদের আয় বাড়ছে এই হার বজায় থাকলে কতো দশক পরে মার্কিনী জীবনমান স্পর্শ করতে পারবো ? যেন মার্কিনী সমাজটাই আমাদের ধ্রুবতারা—ওদিকেই যেতে হবে। এ ছাড়া যেন কোন যাবার জায়গা নেই। কিন্তু মনে প্রশ্ন আসবে—ওটাই কি ঠিক পথ ? ওখানে হয়তো টাকা অনেক, স্বাচ্ছন্দ্য অনেক, বাড়ী, গাড়ী, খাওয়া, প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা। কিন্তু আরো অনেকগুলো জিনিস চোখে পড়ে না। আমাদের সমাজে একসময় চুরি-ডাকাতি-খুন—এসব ছিলই না বলা যায়। এখন অবশ্য আসছে। কিন্তু মার্কিনী বা বৃটিশ সমাজে ক্রাইম যেভাবে বাড়ছে সেটা তো আমরা ভাবতেও পারবো না। তারপর দেখো, পাগল হওয়া, মানসিক বৈকল্য এসব বিশেষ চোখেই পড়বে না আমাদের গ্রামে। কারো মন খারাপ হলে সে হাউ হাউ করে কাঁদবে, সবাই মিলে সান্ত্বনা দেবে অথবা তারাও হাউ হাউ করে কাঁদবে। কিন্তু মনের মধ্যে কেউ কিছু চেপে রাখবে না। আমাদের গোটা সমাজটাই যেন থেরাপিস্টের কাজ করে। কেউ ভাববেও না যে মনের ডাক্তারের কাছে যাও। কিন্তু আমেরিকায় ? দেশটা যে প্রায় পাগলের দেশ হয়ে দাঁড়ালো ! সকলেরই টেনশন, নার্ভাস ব্রেকডাউন, প্রতি হপ্তায় সাকায়াট্রিস্টের কাছে ছোটো। এখন অবশ্য আক্রার উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যে কিছু কিছু ওরকম তুমি দেখবে। অপরাধ প্রবণতা, মানসিক বৈকল্য, আত্মহত্যা, ব্যাপক অনৈক্য—এগুলোর তুলনা তো আমরা করি না। আমরা শুধু দেখি মাথাপিছু আয়, আর সেইটা ধরে মার্কিনী হবার জন্য অন্য দেশগুলোর সঙ্গে র‍্যাটরেসে নেমেছি।"

আমি বলি, "এখন সেই আলোচনাটাও শুরু হয়েছে। জাতীয় আয় একটা অঙ্ক, পরিমাণ। কিন্তু এর সঙ্গে জীবনের বা সমাজের গুণগত দিকটারও একটা হিসেব চাই। প্রতি হাজার মানুষের কজন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যায়, কজন জেল খেটেছে, কজন সুইসাইড করলো, এটাও যোগ করতে হবে। আরও ভাবতে হবে পবিবেশের কথা প্রকৃতির কথা। সমস্ত কিছু শহরের ছাঁচে ঢাললে সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা চিড়িয়াখানা—ডেসমণ্ড মরিসের ভাষায়, 'হিউমান জু'। এসবই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের বা অবনয়নের সূচক বলে ধরতে হবে।"

আমার মনে পড়লো ইংল্যাণ্ডে এক বন্ধুর কথা। ওর বাচ্চাটা মারা যাবার পর পাগল হয়ে হাসপাতালে গেল। ট্রিটমেণ্টের শেষে ডাক্তার ওর বন্ধুদের সঙ্গে একটা আলোচনা করলেন। বললেন, ওই মৃত্যুটা যেন একটা ট্রিগারের কাজ করেছে। সমস্ত জীবন ধরে যত কিছু চুপ করে সয়ে গিয়েছে, যত ক্ষোভ দুঃখ এতদিন চাপা ছিল সব এখন মনের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে। বাবা, মা, ভাই, স্ত্রী—সবাই এখন ওর শত্রু। এখন তাই দরকার বন্ধুদের। বন্ধুদের বিশেষ কিছু করার নেই, শুধু সঙ্গ দিতে হবে, ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে, ওর কথা শুনতে হবে। কিছুদিন এভাবে শুনলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। কোনমতে খানিকটা সারিয়ে আবার কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই ব্যস। কাজের মতো ভালো থেরাপি নেই। আমাদেরই আর এক বন্ধু, মেরীলু, দায়িত্ব নিলো ব্যাপারটা সংগঠিত করবার—তুমি সোমবার বিকেলে, তুমি বুধবার সকালে। সপ্তাহ দুয়েক ঠিকমতো চললো—কিন্তু পরে ঠিকমত বন্ধুরাও আসতে পারলো না। কার এতো সময় ! মেরীলু চিৎকার করে ফোনে সবাইকে গালাগাল করে বলে, "তোমরা কি বন্ধুর জন্য এই সামান্য কর্তব্যটাও করবে না ?" কিন্তু সময় কোথায় ? শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এমন দাঁড়ালো যে আমরা কেউ কেউ ভয় পেলাম হয়তো মেরীলুকেই এবার হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

দূরে আক্রার আলো। নিকোইর মনের টিউনিং পাল্টাবার সময় হয়েছে। এখন ঘাসের ছাউনি দেয়া গোল বাড়ীগুলো ভুলে যেতে হবে। কথা বলার ঢাক 'আটুমপানে'র দ্বৈত আওয়াজ ওর কানে আর আসবে না। চকোলেট-লোভী ঝুলে পরা ছেলেগুলোর প্রসারিত হাতের কথা আরও এক সপ্তাহ না ভাবলেও চলবে। এখন ভাবতে হবে কালকের কাজের কথা। কটা টেবিল তৈরী

হলো, কটা বাকি। কোন তথ্যটা ছাপাবার আগে প্রেসিডেন্টের অফিসকে একবার দেখিয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যেবেলার পার্টিতে স্টিলব্যাণ্ড বাজবে, ইলেকট্রিক গিটার সহযোগে নাচ হবে। সেই নাচের আলাদা সমুদ্র পারের ঘরানা। সেই গানের সঙ্গে মাটির সঙ্গে দেহ সমান্তরাল করে ঝুঁকে পড়ে ছন্দ মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচা যায় না।

ইংলিশ চ্যানেল পার হলে আরতি বলে চলে 'ডাইনে ঘেঁষে ডাইনে ঘেঁষে'। ফেরার পথে সেই একই সমুদ্র পার হয়ে স্টিয়ারিং ধরলে বলে, 'বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে চলো।" আমি তিনবছর ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে যখন প্রথম বার ১৯৬৬ সালে ভারতের ফিরলাম, তখনও টিউনিং পাল্টাবার কায়দাটা শিখিনি। যা দেখি তাতেই মন দারুণ খারাপ হয়ে যায়। এই কি আমার দেশ! এই কি আমার কোলকাতা! এতো ভিখিরি! এতো মানুষ ফুটপাতে ঘুমোয়! বাড়ী ঘরের একি অবস্থা! মানুষগুলোর মুখে কেন অপুষ্টির ছাপ? বাচ্চাগুলো কেন ফুটফুটে গোলগাল সুন্দর নয়? রাস্তার মোড়ে কেন স্তূপকরা জঞ্জাল? কেন মানুষগুলো সকলের সামনে বিনা সংকোচে কাপড় সরিয়ে প্রাকৃতিক কাজ করে? এ যেন অন্য কোন দেশ, নতুন দেখছি। তারপর থেকে বহুবার এসেছি-গিয়েছি। এখন আর মন খারাপ হয় না। টিউনিং পাল্টাবার কৌশলটা শিখে গিয়েছি। নিকোই জানে, আক্রার আলো দেখলেই ও পাল্টে যাবে। আমি হয়তো দিল্লীর কাছাকাছি এলে পাল্টাই—মনটা নতুন করে তৈরী করে নিই। এখন ভিখিরি দেখে মন খারাপ হয় না। জঞ্জাল, পেচ্ছাপ ধরে নিই থাকবেই, এটাই নিয়ম। ফুটপাতের মানুষগুলোকে স্বাভাবিকই মনে হয়। ইংল্যাণ্ড মন থেকে মুছে ফেলতে কয়েক ঘণ্টাও সময় লাগে না।একজন মনস্তাত্ত্বিক বন্ধু বলেন, "এটা তোমার সারভাইভাল স্ট্রাটেজি, না হলে পাগল হয়ে যাবে। অপরাধ বোধে সমস্ত মন ঢেকে যাবে—কোন কাজ করতে পারবে না।" হয়তো তাই। ইংল্যাণ্ডে যাবার পথে ভোরবেলা প্লেনের জানলা দিয়ে যখন জমাট মেঘ আকাশের ফাঁক দিয়ে আলপসের তুষারে ঢাকা শৃঙ্গগুলো চোখে পড়ে তখন মনটাকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাই।

ওপারে গাড়ীর হেড লাইটের আলোতে নিকোইর সুন্দর মুখ যেন আরো সুন্দর লাগে। ওই সৌন্দর্য বুদ্ধিদীপ্ত, সৎ, সমাজ-সচেতন, মন মজাবার ছলা-কলায় ঢাকা নয়। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর বেশ ক্লান্তি। টেপের ওই 'অনমিয়া-য়া-য়া' গান আরও ক্লান্তিকর, কিন্তু মনে হয় নিকোইর খুব ভালো লাগছে, কেন না একই গান বেশ কয়েকবার বাজালো। আমরা আক্রা এসে গিয়েছি। হোটেলে গাড়ী ঢুকছে।

"কাল তোমার প্রোগ্রাম কি?" নিকোই জিগ্যেস করে।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো। ওখানে প্রফেসার টোয়াম বারুমার সঙ্গে দেখা করবার কথা। পরশু ভাবছি জঙ্গলের দিকে যাবো। কোথায় যাওয়া যায় বলতো?"

"তুমি কি দেখতে চাও? কোকোর চাষ? না সত্যি সত্যি জঙ্গল? না কোন গ্রাম?"

"জানি না স্পষ্ট করে। সবটা মিলে একটা ধারণা করতে চাই।"

নিকোই মনে মনে ভাবে, তারপর বলে, "দেখি, সময় করতে পারলে, এ্যাবি ছুটি দিলে তোমাকে নিয়ে যাবো।কথা দিচ্ছি না। না পারলে কাল তোমাকে বলে যাবো কোথায় গেলে কি দেখবে।"

"কফি খাবে?"

"না ফ্ল্যাটে ফিরে ভালো করে সাওয়ার নিয়ে, সামান্য কিছু মুখে গুঁজেই বিছানায় যাবো।কাল আবার অনেকগুলো কাজ জমে আছে।"

॥ চার ॥

প্রফেসর টোয়াম বারুমা আক্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ-সামাজিক এবং পরিসংখ্যানগত বিষয়ের ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ।শীর্ণ, দাড়ী-গোঁফ, মাথায় ঈষৎ টাক।দেখে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির কথা মনে পড়ে। কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিটা সম্রাটজনোচিত নয়—স্বল্পভাষী কিন্তু সহজ। উনি জিগ্যেস করলেন, পরিসংখ্যান নীতি নিয়ে ওই সম্মেলন থেকে আমরা কি পেতে চাই ? আমি বললাম, আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো এস-এন-এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং দেখা অন্য কোনভাবে একটা দেশের সামগ্রিক অবস্থার একটা ছবি তৈরী করা যায় কিনা।

ব্যাখ্যা করে বললাম, "আমরা চাই একটা দেশের জীবনমানের সূচক। কিন্তু বুঝেছি শুধু জাতীয় আয়ের হিসাব দিয়ে সেটা হবে না। ওই হিসাবটাও দরকার, কিন্তু শুধু ওইটা দিয়ে হবে না। থার্মোমিটার দিলে জ্বর ধরা পড়বে, কিন্তু ব্লাড প্রেসার হলো কিনা, ব্রেনের ড্যামেজ হয়েছে কিনা, এসব জানতে অন্য যন্ত্র চাই। তারপর আর একটা মুশকিল হয় যখন একটা দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে অন্য একটা দেশের জাতীয় আয়ের তুলনা করি। তুলনা তো সোজাসুজি হবে না—কোথাও ডলার, কোথাও রুবল, কোথাও টাকা। কাজেই সব টাকাগুলোকে কোন একটা টাকার বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সেখানে সমস্যা হলো ঠিক করা—বিনিময় মূল্য কি হবে ? ধরুন ঘানার সিডিকে ডলারে রূপান্তরিত করবো, কিন্তু কোন ভিত্তিতে ? সরকারী বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে ? না আন্তর্জাতিক বাজারে সিডির বদলে যা ডলার পাওয়া যায় সেই হিসেবে ?"

আমি বলি, প্রফেসার বারুমা মন দিয়ে শোনেন। এতো ভালো শ্রোতা পেলে বলার আগ্রহও বাড়ে। তাই বলে চলি, "মাথা পিছু জাতীয় আয় একটা গড় হিসাব। কিন্তু গড় ছাড়াও আরও দশরকমের সংখ্যা চাই। পরিসংখ্যানের ভাষায়, 'মোমেন্টসে'র সংখ্যা অসংখ্য। মোমেন্টস হলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, থেকে শুরু করে সব রকমের হিসাব। গড়ও মোমেন্টসগুলোর একটা—কিন্তু শুধু গড় দেখে তো একটা তথ্যমালার সবকিছু বলে দেয়া যাবে না। অন্য মোমেন্টসগুলোও দেখতে হবে।"

"আপনারা অন্য কি ধরনের সূচকের কথা ভাবছেন ?' প্রফেসার বারুমার প্রশ্ন।

"এটা নিয়ে অনেকে ভাবছেন। ইউনেস্কো থেকে ওরা বলছে অর্থ-সামাজিক সূচকের কথা—একটা নয় অনেকগুলো। ন্যান্সি ব্যাস্টার, হানস সিংগার, আরমা এ্যাডেল মান, বিলফ্রেড বেকারম্যান, জেনিভার 'আনরিসড', পোলাণ্ডের 'রকলো' স্কুল—নানাজন নানারকম সূচকের কথা বলছেন। আমরা সেগুলোও পরখ করে দেখতে চাই।"

"কি ধরনের সূচক এই আলোচনায় আসছে ?"

"যেমন ধরুন, শিশু মৃত্যুর হার বা প্রত্যাশিত আয়ু। এই একটা বা দুটো হিসেবই বলে দেবে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য কতটা, পরিবেশ কেমন, চেতনা কতোটা। সমাজ উন্নত হলে শিশু মৃত্যুর হার কমবেই। বা ধরুন, সাক্ষরের হার। অর্থনীতি পুষ্ট হলে সাক্ষরতাও বাড়বে—সাধারণ মানুষকে

নিরক্ষর করে একবিংশ শতাব্দীতে কোন দেশ যাবে না, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা কম্পিউটার কিছুই ব্যাপকভাবে ছড়ানো যাবে না। বা ধরুন অর্থনৈতিক সমতা বা বৈষম্য—গড় আয়ের সঙ্গে সেটাও ধরতে হবে, না হলে সামান্য কিছু মানুষের হাতে বেশী টাকা জমলে গড় ভালো দেখানো যাবে, কিন্তু সেই উন্নতি সমস্ত দেশের মানুষের কাছে পৌঁছবে না। বেশী চাই না—এইরকম কয়েকটা সূচক হলেই হবে। আমাদের আলোচনার এটাই এক বড় দিক।"

"আপনারা কি দেখবেন না রাস্তা কতো হলো, বিদ্যুৎ কতো গ্রামে গেল, পানীয় জল গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে কি না?" উনি জিগ্যেস করেন।

"না, সেগুলো দেখার দরকার নেই। এগুলো হচ্ছে, যাকে বলে 'উপকরণ' বা 'ইনপুটস'। উপকরণ ঠিক মতো প্রয়োগ হলে ফলটা পাওয়া যাবে। আমরা চাই ফলটা মাপতে। যেমন কটা হাসপাতাল হলো, কজন ডাক্তার নার্স চাকরী পেলো, তার থেকে বড় জিনিস হলো—এর ফলে মৃত্যুহার কমলো কিনা! মৃত্যুহারটা দেখলেই ওগুলো দেখা হবে। মাষ্টার কতো রাখলাম, কটা স্কুল বসলো, তার থেকে বড় কথা সাক্ষরতা কতোটা বাড়লো বা কজন বৈজ্ঞানিক গাণিতিক বা ঐতিহাসিক একেবোর শেষের পর্যায়ে গিয়ে তৈরী হলো। এগুলো উদাহরণ মাত্র, কিন্তু এইভাবেই এখন অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন। রাজনীতিবিদরা হয়তো জোর দেবেন কতো টাকা খরচ করলেন এবং কিভাবে তার ওপর। আমরা চাই শুধু জনতে—এসব করে শেষ অবধি কি দাঁড়ালো?"

"আর কোনোভাবে দেখা যায় না ব্যাপারটাকে?"

"হ্যা যায়। অনেকে হয়তো বলবেন, দেখতে হবে আমাদের মোটা মোটা প্রয়োজনগুলো কতোটা মিটছে? যেমন, মাথা পিছু খাদ্য মানুষ কতটা পায়, বাড়ীতে মাথা পিছু কতো বর্গফিট জায়গা, বছরে কতো বর্গগজ মাথাপিছু কাপড় কেনে, কতো গ্যালন পরিশুদ্ধ জল প্রতিদিন পায়, কতোজনের চাকরি বা পাকা আয়ের সংস্থান আছে। এছাড়া শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ব্যাপরটা তো আছেই। এই সব মিলিয়ে একটা ছবি ফুটে উঠবে যেটা হলো প্রামাণ্য এবং সামগ্রিক, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের মতো অসম্পূর্ণ নয়।"

প্রফেসর বারুমা কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমাদের এখানে একজনই আছেন যিনি এইসব নিয়ে বেশ খানিকটা চিন্তাভাবনা করেছেন। ডঃ কজো ইউসি। আমি তাকে ডাকছি।"

ডঃ ইউসিকে দেখে দারুণ নিরাশ হলাম। আমার ছোটবেলার 'কাফ্রি'কে দেখার পর থেকে একটা জিনিস ধরেই নিয়েছি—আফ্রিকান হলেই আমার থেকে কয়েক ইঞ্চি বেশী লম্বা হবে। ডঃ ইউসি আমার কাঁধের থেকে একটু উঁচুতে। সমস্ত চেহারাটা তালগোল পাকানো ফুটবল বিশেষ। 'পিগমী হিপো' এই অঞ্চলের জলায় ডোবায় ছড়িয়ে। মনে হতে পারে সেইরকমেরই কেউ জলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে এসেছে।

কিন্তু আলোচনা শুরু হবার পর চেহারাটার থেকে অনেক বড় হয়ে উঠলো ওর উজ্জ্বল, চঞ্চল চোখ, এবং হাসি—যদিও ঘানায় হাসিটা এতো সর্বজনীন যে ওটা না উল্লেখ করলেও চলে। একটু আলোচনার পর দেখলাম ওই বিষয়ে আমি যা জানি তার পুরোটাই ওর জানা—এবং বেশ খানিকটা বেশী। শুধু তাই না, ইতিমধ্যেই ঘানার সবরকম তথ্য যোগাড় করে, কতোগুলো সূচকের ভিত্তিতে অঞ্চলগুলোকে সাজিয়েছেন, এবং সেই আলাদা আলাদা সূচক এক করে এক 'মহাসূচক'ও তৈরী করেছেন। এই মহাসূচক ধরে ঘানার প্রতিটি অঞ্চল ক্রমপর্যায়ে সাজানোও হয়ে গিয়েছে। ওইটা দেখলেই বোঝা যাবে কোনা অঞ্চল কতোটা এগিয়ে না পিছিয়ে।

আরও দেখলাম, মহাসূচক তৈরী করতে গিয়ে এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক দরবারে

যতোরকমের সমাধান প্রস্তাবিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করেছেন। কি নেই সেখানে ? তখন পর্যন্ত মাত্র দু একটা দেশ নিয়েই এতো বিস্তারিত কাজ হয়েছে। ডঃ ইউসি ঘানার কাজটা করেই রেখেছেন।

আরও দেখলাম ঘানা সম্বন্ধে তথ্য উনি সুব্রম্মনিয়মের থেকে কম জানেন না। কিন্তু যেখানে সুব্রম্মনিয়মের সঙ্গে পার্থক্য, এটা ওর দেশ। প্রতিটি তথ্যের একটা অন্য মূল্য ওর কাছে। ওর রাগ, অনুরাগ, ঘৃনা, অনুকম্পা, সবরকম আবেগ আর অনুভূতি প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে জড়িয়ে। এবং শুধু সংখ্যা যোগাড় করে সন্তুষ্ট নয়, ওর বিচারে সমাজটাকে বুঝতে চান।

কাজেই ভাব হতে দেরী হলো না। মাত্র দু ঘন্টার পরিসরে পদবী ছেড়ে প্রথম নামে চলে গেলাম। কজো বলে, আমি শুনি, বারুমা ঝিমোয়। ও বলে আর ওর চোখগুলো বনবন করে ঘোরে, মাঝে মাঝে দপ করে জ্বলে ওঠে, আবার হাসিতে গলে যায়। কজো এক রঙ্গীন ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতি ওকে চেহারায় মেরে রেখেছে, কিন্তু বাকি সবই ওর আছে।

পরিসংখ্যানের বাঁধন ভেঙে আমরা অন্য আলোচনাতেও ঢুকি। কজো বলে, "তুমি যদি কোকোর চাষ দেখতে চাও নিয়ে যাবো। কতোদিন আছো ওখানে ?"

আমি বললাম, এক মহিলার আমাকে নিয়ে যাবার কথা। তবে শেষপর্যন্ত তিনি ডোবাতে পারেন। কিন্তু কথা যখন একটা হয়েছে, মহিলা পাকা 'না' বলা পর্যন্ত কি করি ! কিন্তু নিকোই যদি গাড়ী নিয়ে আসেও, কজোর কি সঙ্গে যেতে আপত্তি ? যদি না আসে—কজো কি তড়িঘড়ি অন্য ব্যবস্থা করতে পারবে ? ঠিক হলো রাত্রে কজো আমাকে ফোন করবে।

ইতিমধ্যে আবার কফি এসেছে। প্রফেসর বারুমা ঝিমুনো বন্ধ করে নড়েচড়ে বসেছেন। এবার জিগ্যেস করলেন, "আপনি ভারতের কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন ?"

এই প্রশ্ন সাধারণত আফ্রিকায় কেউ করে না। ওদের কাছে সমস্ত ভারতটাই এক। যেমন ভারতের লোকদের কাছে সবটাই আফ্রিকা।

আমার উত্তর শুনে বললেন, "আমাদের এখানে একজন বাঙালি ডিরেক্টর ছিলেন আমার আগে—ডঃ সেন।"

ডঃ সেন ? ঘানার ডঃ সেন ? মনের এক কোণে কোথায় যেন নামটা লুকিয়ে। মনে পড়লো। আমি তখন লণ্ডনে পি-এইচ-ডি শেষ করছি। ভাবলাম, পড়ার শেষে নতুন নতুন দেশে ঘুরবো, চাকরী করবো, প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরবো। পশ্চিম আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে বেশ কিছু আবেদন পাঠালাম তালিকা দেখে। প্রায় সবাই 'না' বললো, ডঃ সেনও উত্তর দিলেন 'না'—পরে আবার তিনিই চিঠি দিলেন, এখানে আসতে রাজী কিনা জানতে চেয়ে। ততোদিনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেয়ে গিয়েছি—তাই আর যাওয়া হয়নি। তারপর যথারীতি আর দশটা জিনিসের মতো এটাও ভুলে গিয়েছি।

বলতে লজ্জা নেই, দারুণ আনন্দ হলো ডঃ সেনের কথা শুনে। চিন্তার দিক থেকে যতোই আন্তর্জাতিক হতে চাইনা কেন, ভারত আমার দেশ, আমি বাঙালি—এটা তো ভুলতে পারবো না। ভারতীয়ত্ব বা বাঙালিত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলেই হলো। ডঃ সেনও আমার আবেদন পেয়ে কি ভেবেছিলেন জানি না, হয়তো মনের কোনে খানিকটা স্নেহ জেগেছিল। এখন উনি কোথায়, অবসর নিয়ে কোথায় গেলেন এসবও অজানা। ওই পরিবেশে নামটা এতো অপ্রত্যাশিত, তাই এতো আনন্দের। কুমাসিতে কোন এক ডাঃ দাশগুপ্ত আছেন—খোঁজ করতে হবে। কিন্তু সময় কোথায় ?

এই ইনষ্টিটিউটে এসে আমার প্রচণ্ড লাভ হলো। কজোকে পরে সাসেক্সে নিয়ে গেলাম। শুধু সম্মেলনের সপ্তাহে নয়, তার আগের পাঁচ সপ্তাহের একটা সেমিনারেও। ওর কতোটা সেই

যাওয়ায় লাভ হলো জানি না, আমি অনেক কিছু জানলাম।

সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ফোনে এ্যাবির দারুণ চোটপাট।

"তুমি পেয়েছোটা কি বলতো ? তুমি এই তো এলে। ভালো করে জানিও না তোমাকে। জাতে ভারতীয়, কাজ করো ইংল্যাণ্ডে। সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক। তারপর আসতে না আসতেই একজন মহিলাকে নিয়ে সারাদিন কোথায় কাটিয়ে এলে তুমিই জানো। এখন সেই মহিলা বায়না ধরেছেন আবার তোমার সঙ্গে যাবেন, আমাকে ছুটি দিতে হবে। তোমাকে তো দেখে মনে হয় না ওইরকম। কিন্তু এখন জিগ্যেস না করে পারছি না—তোমার হারেম আর কতো বাড়াবে ? তুমি..."

আমি ওকে থামিয়ে বললাম, "তোমার তথ্য খুবই খারাপ, এমনকি তোমার ঘানার পরিসংখ্যানের থেকেও খারাপ।"

এ্যাবি বলে, "দ্যাখো ওসব বলতে এসো না। তুমি তো কালই লেকচার দিচ্ছিলে কোয়ালিটি অফ লাইফ নিয়ে। শুধু সংখ্যাগত দিকটা নয়, গুণগত দিকটাও নাকি দেখতে হবে। আমার ডিপার্টমেণ্টে মিস নিকোই হচ্ছে কোয়ালিটি অফ লাইফ। ওকে বাদ দিলে শুধু সংখ্যা আর সুব্রহ্মনিয়ম। তুমি বরং সুব্রহ্মনিয়মকে নিয়ে যাও, আমি ওকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। নিকোই—নেভার। ওভার মাই ডেড বডি। কাল ছুটি পেলে হয়তো আবার পরশু চাইবে। তারপর শুনবো দিল্লী বা কাঠমাণ্ডু চলে গিয়েছে। হবে না। বলে দিলাম, হবে না। নিকোই আমার ডিপার্টমেণ্টের আলো—সেই আলো নিভতে আমি দেবো না।"

কাঠমাণ্ডু যে নেপালে, নেপাল যে ভারতের অংশ নয়, একথা বোঝাবার সময় ছিল না। আমি শুধু বললাম, "এ্যাবি, তুমি শুধু নিকোইর ওপরটা দেখেছো। ওর মনের মধ্যের সোনার খনিটা তোমার নজরে আসেনি। জানো, ইংরাজিতে একটা ভালো কথা আছে, 'পেইন ইন দি নেক'। ঘাড়ের যন্ত্রণা। এখন বুঝছি কথাটা তোমাকে দেখে তৈরী হয়েছে। তুমি আমার পেইন ইন দি নেক—এখন ফোন ছাড়ো, ঘাড় থেকে নামো।"

এ্যাবি উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমাকে সোনার খনি বলতে এসো না। আমরা এখানে দু হাজার বছর ধরে সোনার খনি চালাচ্ছি, সেই সোনা গলিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে পাঠিয়েছি। তুমি জানো না এই দেশটার নাম আগে ছিল 'গোল্ডকোষ্ট' ? তোমার কাছ থেকে আমি সোনার খনি শিখবো ? আর আমাকে কি তুমি খনি শ্রমিক পেয়েছো, যে খনিতে কতো সোনা সেটা খুঁজে বেড়াবো ? কোন মেয়ের মনের খনিতে ঢোকবার আমার কি দরকার ! বাইরেটাই যথেষ্ট। মোট কথা আমার উত্তর 'নো'। নিকোই তোমার সঙ্গে যাবে না। তুমি কেটে পড়। আমার কাছে সুব্রহ্মনিয়মই ভালো। ভারতীয় মানে হবে বুদ্ধিমান, কর্মঠ, ঝামেলা এড়িয়ে চলবে, অফিসে সবচেয়ে আগে আসবে, সবচেয়ে পরে অফিস থেকে যাবে, বাড়ীতে গিয়েও কাজ করবে, পার্টিতে যাবে না, সিনেমায় যাবে না, মুখ বুজে কাজ করবে—এই হলো আমার ভারতীয়। তুমি তো দেখছি মহা গণ্ডগোলের লোক। সুব্রহ্মনিয়মের কাছে শুনলাম তুমি আবার 'রেড ইণ্ডিয়ান'। যাও, মাথায় পালক পরে অন্য জায়গায় গিয়ে নাচো। এখানে আর একদিনও নয়। হা হা হা হা।"

এ্যাবির রসিকতাটা মাঝে মধ্যে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

ও ফোন নামাবার আগে বললো, "শোন। কাল জঙ্গল যাবার আগে 'সুরামিন' বা 'ডায়ামাইড কম্পাউণ্ড' খেয়ে যেও। অবশ্য কিছু হবে না, তবু সাবধানের মার নেই। সেটসী বড়ো খারাপ জিনিস। আমি অবশ্য নিকোইকে বলে রেখেছি, ও তোমাকে ঠিক খাইয়ে দেবে।"

॥ পাঁচ ॥

গাড়ীতে নিকোই, কজো আর আমি। নিকোইর পাশে আমি, পিছনের সিটে কজো। নিকোই আর কজো। দুজনই ঘানার। মেয়ে ও পুরুষ। ইংরাজিতে একটা কথা আছে 'বিউটি এ্যাণ্ড দি বিষ্ট'। পাশাপাশি দুজনকে দেখলে সেইরকমই মনে হবে। কিন্তু কথা শুরু হলে দেখবে দুজন কতো কাছাকাছি। কথা কজোর আর ফুরোয় না। সারাক্ষণ কজো প্রায় একাই কথা বলে গেল। গাড়ীর স্টিরিওতে 'অনমিয়া-য়া-য়া'। নিকোইর ওই গানটা কেন এতো পছন্দ বুঝি না। একবার তো কজো বলেই বসলো, "তোমার কি আর কোন টেপ নেই?" নিকোই অন্য গান ঢোকালো, কিন্তু মনে হলো একটু ক্ষুণ্ণ হলো। কজো পরে ফিসফিস করে আমাকে বললো, "নিশ্চয়ই এই কান ঝালাপালা করা গানটার সঙ্গে নিকোইর কোন সেন্টিমেন্টাল যোগসূত্র আছে।"

কজোর কাছে জানলাম, এখানকার অধিকাংশ মানুষের নাম, বিশেষ করে আকানদের মধ্যে, দিন ধরে। রোববারে জন্মালে কোয়ামি, সোমবার কুয়সি, তারপর কুয়াডিও, কোনেন, কুয়াকোন, ইয়াও, কোফি। কজো নামটাও ওই কু-কথার ধাঁচে, ও একটা বার বলেওছিল যেটা এখন লেখার সময় মনে পড়ছে না। মেয়েদের নাম, রবি থেকে শুরু করে—আমুইন, আকিসি, আজুয়া-আজো, আমলাম, আউ, ইয়া, আফোনে। আমার সাসেক্সের সহকর্মী রবীন লাকহ্যামের স্ত্রী ঘানার, নাম ইয়া—এখন জানি ওর জন্ম শুক্রবার। আরও বলতে পারি ঘানার প্রথম রাষ্ট্রপতির জন্ম রোববার। নামের আর একটা অংশ জন্মের ক্রমপর্যায় ধরে। প্রথম হলে, একটা, দ্বিতীয় হলে আর একটা, এইরকম। সব ঠিক করা রয়েছে।

শেক্সপীয়রের ভাষায় "নামে কি এসে যায়?" সত্যি সত্যি অনেকখানি এসে যায়। নাম মানে একজন মানুষের পরিচয়। নামটা বললেই মানুষটা, তার মুখ-চোখ চরিত্র ব্যবহার সব মনে পড়ে যাবে। আমাদের ছোটবেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের এক বড়ো নামকরা লেফট আউট ছিলেন—সালে। পুরো নাম, পি বি এ সালে। আরও পুরো নাম—পুথেমপরমম্ভিল বাবা খান রন্দার আবদুল সালে। ডঃ ভি-কে-আর-ভি রাও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ—অনেকে ওকে ডাকেন 'বর্ণলিপি রাও' বলে। এই নামের মধ্যে অনেকখানি পরিচয় ঢোকানো—বাবার নাম, গ্রামের নাম, কখনো জেলার বা অঞ্চলের নাম। তার সঙ্গে নিজের একেবারে নিজস্ব নাম। অন্য পরিচয়ের ভীড়ে অনেক সময় হয়তো সেই নামটাই চাপা পড়ে যায়। আমরা যে মানুষটাকে সবাই ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ বলে জানি তার মধ্যে শংকরণই ওর নাম, বাকিটা অঞ্চলগত জাতগত পরিচয়।

অনেক সময় মানুষকে নামের ব্যাপারে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। বিশ্বনাথ হয়ে যায় 'বিশে'। শিবেন্দ্রনারায়ণ হয় 'শিবা'। ছোট বা বিকৃত না করলে কি চলতো না। কেউ কেউ ইচ্ছে করে নিজের নাম বিকৃত করে, সাহেব সাজবার জন্য—লাহা হয় 'ল', দাঁ হয় 'ড', নিবারণ হয় 'এন ব্যারণ', আশুতোষ হয় 'এ টশ', জনার্দন 'জন' হয়ে দাঁড়ায়। নামের দুটো অংশের মধ্যে মানুষ সাধারণত খারাপ অংশটাকে ধরেই ডাকে। আমাদের দুই পরিচিত—একজন ধরুন, বীরেন্দ্র কিশোর চম্পটি, আরেকজন রজত নারায়ণ ঢোল—লোকে এদের জমকালো প্রথম নাম ছেড়ে

ডাকে 'ঢোল' বা 'চম্পটি', এদের ভয়ানক আপত্তি সত্ত্বেও। এটাই স্বাভাবিক—নাম মানে ঠিক বুঝবো কার কথা বলা হচ্ছে, তাই সেই অংশটাই পছন্দ যা নিয়ে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। আমাদের ছেলে হবার আগেই রোজ রাত্রে স্বামী-স্ত্রী দারুণ ঝগড়া—কি নাম দেবো? রাম হবার আগে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, আমার ছেলে বা মেয়ে জন্মাবার আগে নামটা অন্তত ঠিক থাক—ছেলে হলে অমুক, মেয়ে হলে তমুক। এতো ঝগড়ার মধ্যেও দুজন দুটো ব্যাপারে একমত। এক, নামটা এমন ছোট্ট করবো যাতে কারো সাধ্যি না থাকে আরো ছোট বা বিকৃত করবার। দুই, আদর করে এমন কিছু বলে ডাকবো না, যার জন্য পরে আমাদের সন্তান লজ্জায় মুখ ঢেকে আমাদের গালাগাল করবে। ছেলের নাম হলো সাম্য—এতো ছোট যে নিশ্চিন্ত। আট বছর পর স্কুল থেকে ইংরাজি চিঠি আসে 'সামিয়া, অবাঙালী বন্ধুরা বলে,'শ্যাম,' ইংরেজরা বলে 'স্যাম'। আমি বড় হলে ওকে বলবো, আমাদের যতটুকু করণীয় আমরা করেছি। তারপর যদি নিজের নাম লড়াই করে বাঁচাতে না পারো, সেটা তোমার ব্যাপার।

ঘানার মানুষ যে নাম রাখবার ব্যাপারটা এতো সহজ করে ফেলেছে সেটা জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন যারা ছেলে বা মেয়ের নামকরণের জন্য প্রস্তাব চাইবে, তাদের বলবো: "বার বলো, মাস বলো, বলো কতো নম্বর—এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।" নম্বরের ব্যাপারটায় অবশ্য এককালে একটা নিয়ম ছিল। যখন মেয়ের পর মেয়ে হচ্ছে, ছেলে আর হয় না, তখন নতুন মেয়ের নাম হতো 'আন্না' বা 'আর না'। আমাদের পাড়ার এক পরিবারের তার পরেও একটি মেয়ে হলো। ওরা চোখের জল ফেলে নাম দিলেন 'অশ্রু'। তখন অবশ্য মেয়েরা ছিল ফ্যালনা—এখন ধরে নিচ্ছি অবস্থাটা পাল্টেছে। যদি না পাল্টে থাকে, ঘানায় আসুন, এখানকার মেয়েরা ফ্যালনা নয়।

নিকোইর পাশে বসে কথা বলে সেটা প্রতিমুহূর্তে বুঝি। ওর মধ্যে কোন উগ্রতা নেই। ও ঝগড়া করে না, চেঁচায় না, চোখ পাকিয়ে অধিকার সাব্যস্ত করে না। প্রয়োজন নেই। ও জানে মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশী বুদ্ধি ধরে, ওদের যোগ্যতা ঢের বেশী। কথাটা এতো সত্য, যেন সূর্য পূর্বদিকে উঠবার মতোই, বিতর্কের অবকাশ নেই। সেই আত্মপ্রত্যয়ের একটা বড়ো ছাপ ঘানার বহু মেয়ের মধ্যেই দেখেছি।

গাড়ী কুমাসির ধার দিয়ে যাচ্ছে। কুমাসি ঘানার দ্বিতীয় বড় শহর। কজো জিগেস করে, "দেখবে নাকি?"

আমি বলি, "না, আজ কোকোটা বুঝতে চাই।"

আমরা কুমাসিকে পাশে রেখে কোকোর বাগিচার দিকে গেলাম।

জঙ্গল আর জঙ্গল। জঙ্গলের যেটা বড় সমস্যা, বাইরে থেকে ভালো করে দেখবার উপায় নেই। দেখতে হলে ভিতরে ঢুকতে হবে। সেখানেও দেখা শক্ত—চারপাশের ভারী ভারী গাছের পাশে নানা দৈর্ঘ্যের, আকারের, রঙের এতো রকমের গাছ। বোটানিস্ট হলে বুঝতাম কোনটা কি। প্রচুর গাছ সবকিছু আচ্ছন্ন করে ঘিরে রেখেছে। মাঝে বৃষ্টি হলো। এখন গরম আর ঘাম। নানারকম পোকা আর মাছি ভনভন করছে। কোন কোনটা বেশ বড়ো, কানের চারপাশে আমাকে বিরক্ত করবার মতলব নিয়ে ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরী ওই কোকোর বাগান। মালিক ছুটতে ছুটতে এলেন। গাড়ীর দরজা খুলে ধরলেন। ওকে আগে থেকেই ফোনে নিকোই বলে রেখেছিল। কফি এলো, কিন্তু কোকো নয়। ময়রা কি নিজের মিষ্টি খায়!

কোকো চা বাগানের মতো নয়। চা গাছ ছোটছোট, বাড়তে দেয়া হয় না। মেয়েরা পিঠে ঝুড়ি বেঁধে চায়ের পাতা বেছে বেছে তোলে—এ দৃশ্য দার্জিলিং বা জলপাইগুড়িতে গেলেই

চোখে পড়ে। আমার মনের কোথাও সেই ছবিটাই ছিল। কোকো রীতিমত গাছ, কুড়ি থেকে চল্লিশ ফিট উঁচু।

মালিক বলে, "কোকো সব জায়গায় হয় না। উচ্চতা এক হাজার ফুটের বেশী হলে না হবারই কথা। ঘানার জমি মোটামুটি সমতল, যেটা একটা বড় সুবিধা। পাহাড়ী অঞ্চলে একদম হবে না। তারপর রোদ্দুর চাই প্রচুর—৬৫ থেকে ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত। এর কম হলে চলবে না। তারপর দরকার প্রচুর জল। বৃষ্টি অনেক চাই, নিয়মিত চাই। তারপর আরো ঝামেলা—জল পড়বে কিন্তু দাঁড়াবে না, দাঁড়ালেই গণ্ডগোল। এখানে তিন হাজার বা তারও বেশী মিলিমিটার বৃষ্টি হয়—জমিও এমন যে জল মাটিতে ঢুকে যায়, দাঁড়ায় না। এইসব একসঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছে বলেই না কোকোর উৎপাদনে ঘানা পৃথিবীর মধ্যে পয়লা নম্বর!"

কোকো গাছে ছোট ছোট নানা রঙের ফুল—সাদা, গোলাপী, হলুদ, লাল। কিন্তু ফুল বা পাতা একটাও কাজে লাগে না। আসল হচ্ছে ফল—দেখতে পেঁপের মতোই প্রায়। ফলটা সাত আট ইঞ্চি বড়ো, চওড়ায় তিন চার ইঞ্চি। সেই ফল কাটলে দেখা যাবে দুপাশে সাড়ি করে সাজানো প্রচুর বাদাম। বিশ থেকে চল্লিশটা। ওই বাদামই হলো কোকো।

মালিক বলে, "গাছটা তৈবী করাই ঝামেলা। এই গাছ তৈরী করতে সময় লাগে বেশ। তিন বছরের মাথায় ফল আসে, আট বছর অবধি বাড়ে। কিন্তু একবার তৈরী হয়ে গেলে আর বিশেষ ঝামেলা থাকে না। তখন মাঝে মাঝে ছেঁটে দাও, বর্ষায় নষ্ট হলে সামাল দাও, আর বাদামগুলো ঠিক সময়ে তোলো। বছরে দুবার আমরা শস্য তুলি।"

তারপর মাটিতে হাত দিয়ে একটু ধুলো তুলে দেখায়। বলে, "এতো দামী মাটি ঘানায় আর পাবেন না। উত্তরে যান—সেখানকার মাটিতে প্রাণ নেই। এই মাটি অনেক নীচে অবধি রয়েছে। তবে মুশকিল কি জানেন, প্রতি বছর প্রচুব মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। এটা বন্ধ না হলে মাটির উর্বরতা কমতেই থাকবে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা।"

কোকো এখানে এলো কি করে?

কজো বলে, "কোকো ল্যাটিন আমেরিকা থেকে এসেছে। ওখানে মেক্সিকোর এ্যাজটেক আর মায়া সভ্যতার তৈবী এই গাছ। ওদেব একটা নাম ছিল যা খানিকটা কোকোর মতোই শোনায়, যার মানে হলো, "তেতো জল"। ওদের বলা উচিত ছিল 'তিক্ত মধুর জল।' ওখানে এটাই ছিল বড় পানীয়। আমরা ইউরোপীয় হাত ঘুরে এটা পেয়েছি। আগে প্রায় সবটাই তৈরী হতো ওখানে। এখন, পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা সত্তর ভাগ তৈরী হয় পশ্চিম আফ্রিকায়—মূলত এখানে আর আইভরী কোষ্টে।"

"কেন শুধু তোমরা আর ল্যাটিন আমেরিকা?"

"কারণ লক্ষ লক্ষ বছর আগে পশ্চিম আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকা একসঙ্গে জোড়া ছিল। এই যে আটলান্টিক পূর্বদিকে ঢুকে গালফ অফ গিনি তৈরী করেছে, এই ফাঁকটায় ছিল দক্ষিণ আমেরিকা। মেক্সিকো, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, গিয়ানা—সবই ছিল আক্রার ঠিক দক্ষিণে। এখনও দেখবে গাছপালা, পশুপাখী, পাথর-মাটিতে দারুণ মিল। ওদের ওখানে, আমাজানের অববাহিকায় আমাদের দক্ষিণের কঙ্গোর থেকেও অনেক বেশী বৃষ্টি। এখানে যেমন কফিও হয়, ওখানে কফিই হলো এক নম্বর। ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অনেক মিল—কিন্তু কোন যোগাযোগ নেই বললেই হয়। অথচ আটলান্টিকের ওপারেই ওরা।"

কজোর মুখে আরও জানলাম, একসময় কোকোর বাদাম ছিলো ল্যাটিন আমেরিকার 'টাকা'—যখনো কলম্বাসের অনুগামীরা সেখানে যায়নি। জামা কাপড় জন্তু জানোয়ার

অস্ত্র—সবকিছু বিক্রী হতো ওই টাকার বিনিময়ে।

কোকো দেখি আর ভাবি চকোলেটের কথা, চকোলেট আইসক্রিমের কথা, পানীয় কোকোর কথা। তিক্ত মধুর কথাটা খুবই খাঁটি। গাছের বাদাম থেকে রাংতামোড়া প্যাক করা সুদৃশ্য চকোলেটের বাক্স অনেক দূর পথ। এই পথের মধ্যে বহু চিনি আর মিষ্টি মেলে, বহু গায়ের ঘাম ঝরে। ওরা গুঁড়ো করে আগুনে ফোটায়, জ্বাল দেয়, ছাঁচে ফেলে, আরও অনেক কিছু করে।

সেসব তো 'ইনপুটস', 'উপকরণ'—আমরা চাই ফলটা। চকোলেট কি 'কোয়ালিটি অফ লাইফ' বাড়ায়? আমার ছেলে হাত তুলে বলবে 'হ্যাঁ'। ইউরোপের মেয়েরা টাইপ করতে করতে, কার্ড পাঞ্চ করতে করতে চকোলেট মুখে গুঁজে বলবে 'হ্যাঁ'। ডেন্টিস্ট বলবে, "হাঁ করো, দাঁত দেখি"। তারপর মুখ ভার করে বলবে, "একদম চকোলেট খেও না"।

চকোলেট না খেয়ে উপায় নেই। বড়ো বড়ো কোম্পানীরা খাওয়াবেই। আমাদের দেশের মানুষ একশো বছর আগেও চা-কফি খেতে জানতো না, কোম্পানীরা মানুষকে রাস্তায় পার্কে বিনা পয়সায় খাওয়াতো—এখন চা-ই সব, পান সুপারী গৌণ হয়ে এসেছে। কোকো অবশ্য ভারতে জনপ্রিয় নয়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের কল্যাণে চকোলেট দারুণভাবে ছড়িয়েছে। বিদেশে আরও বেশী জনপ্রিয় কোকাকোলা—কোকাকোলাই যেন একটা কালচার।

কজো বললো, "কোকাকোলার মধ্যে কোকো তো আছেই, আর আছে কোলা বাদাম। এই দুটোই খুব কাছাকাছি। কোলানাট অনেকদিন ধরেই এখানে তৈরী হয়—এখনও ঘানা উৎপাদনে এক নম্বর।" ওই বাদামের মাদকতা কোকাকোলায় মিশেছে। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আরও অনেক কিছু, যা কোম্পানী কখনও জানাবে না। আমাদের দেশে কোকাকোলা এখন আসতে দেয়া হয় না—এবং বদলে যা আমরা পাই সেগুলো কোকাকোলার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু পানীয় হিসেবে কোকাকোলার বাজার পৃথিবীতে বিরাট।

কজো বলে, কোকো সত্যি সত্যিই ঘানার 'পেইন ইন দি নেক'। কোকো প্রচুর টাকা আনে, বিদেশী মুদ্রা আনে। কিন্তু কোকোই একমাত্র। সমস্ত অর্থনীতিটাই যেন কোকোর ওপর দাঁড়িয়ে। এখন বহু ছোট ছোট মালিক কোকোর চাষ করে, এবং সরকার থেকে ব্যবস্থাও রয়েছে কোকো কিনে নেবার—ওদের মার্কেটিং বোর্ডের মাধ্যমে। কিন্তু সেই কোকো শেষপর্যন্ত বিক্রী হবে ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিনবে মুষ্টিমেয় কয়েকটা বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানী—যেমন নেশলস। ওরাই ঠিক করবে কোকোর চাষী কতো দাম পাবে। যে দামে শেষপর্যন্ত কোকো ওই কোম্পানীরা বিক্রী করে পাকা মাল হিসেবে তার খুদ কুঁড়োটাও ঘানার চাষী পায় না।

কজো আরও বলে, "সবচেয়ে খারাপ হলো অনিশ্চয়তা। তুমি জানোই না পরের বছর কোকোর দাম কি দাঁড়াবে। সবটাই নির্ভর করবে ওই বড় কোম্পানীগুলোর ওপর। ওরা কখনও তোমায় গাছের ডগায় তুলে দেবে, কখনও কাদায়-পাঁকে তোমার মুখ ঘষে দেবে। তুমি বলতে পারবে না পরের বছর তোমার কোথায় স্থান—স্বর্গে না নরকে। এর থেকে বড় যন্ত্রণার কিছু নেই। দাম যেবার ভালো সেবার সবকিছু ভালো। দাম যখন পড়লো তখন সমস্ত অর্থনীতিটাই ধসে পড়লো। শুধু কি অর্থনীতি? ষাটের দশকে পাশ্চাত্য শক্তি চাইলো না নক্রুমা ঘানার রাষ্ট্রপতি থাক। ওরা কোকোর দাম কয়েক বছর হঠাৎ এমন কমিয়ে দিলো যে ঘানার অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো, নক্রুমার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হলো, এবং এক সামরিক অভ্যুত্থান করে নক্রুমাকে সরিয়ে দেয়া হলো। কোকোই এখানে রাজা। কোকো না চাইলে তোমার এখানে কোন জায়গা নেই।"

বহুজাতিক কোম্পানী নেশলস। আলোচনা শুরু হতে আর শুধু কোকোর মধ্যে ঠেকিয়ে

রাখা গেল না। নিকোই একটা ভালো উদাহরণ দিলো।

নিকোই বললো, "তুমি দেখবে আজকালকার ঘানার আধুনিক মেয়েরা মা হলে বুকের দুধ না খাইয়ে পাউডারের দুধ বোতলে মিশিয়ে খাওয়াবে। ওরা মনে করে ইউরোপীয়দের মতো হতে গেলে ওটাই করতে হবে। নেশল্স কোম্পানী এবং অন্যরাও এই নিয়ে প্রচুর বিজ্ঞাপন দেয়, আর বিজ্ঞাপন দেখে দেখে মায়েরাও মনে করে ওটাই ঠিক। কিন্তু এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। এখন বেশ কিছু বিজ্ঞানী বলছেন, ওটাতো শিশুর দুধ নয়, শিশুর মৃত্যুদূত। ইউরোপের মায়েরা দুধের বোতল ব্রাশ দিয়ে গরম জলে দিয়ে ভালো করে ধুয়ে তারপরে ব্যবহার করে। ওদের ওখানে জল আছে, সবসময় দুধ গরম রাখবার ব্যবস্থা আছে। এখানে না আছে ট্যাপে গরম জল বা সেইরকম ব্রাশ, না সেই বোতল গরম রাখবার ব্যবস্থা, না মায়েদের জন্য ট্রেনিং— অথচ ফ্যাশনটা এসেছে। জলই বা কোথায় ? বোতল ধুলেও আনাচে কানাচে ময়লা জমে থাকে। তারপর তুমি প্রায়ই দেখবে বোতলটা ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওই বোতলের দুধ খেয়ে যে কতো বাচ্চা মরছে তার হিসেব নেই।"

কোকোর স্বাদ তিক্তমধুর। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে ঘানার সবকিছুই মধুর। তিক্ততার দিকটা এখন জানতে শুরু করেছি। মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিচারে ঘানা ভারতের চেয়ে তিন চার গুণ এগিয়ে। এখানে অনৈক্য বা বৈষম্য ভাবতের মতো এতো চোখে পড়ে না, বিশেষ করে গ্রামে। শীর্ণ প্রসারিত হাত ভিক্ষুক প্রায় নেই বলা চলে। মানুষগুলোর চেহারা এবং পোষাক একজন গড় ভারতীয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শিক্ষার হারে ভারতের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে। সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ ভারতীয়ের চেয়ে একজন সাধারণ ঘানার মানুষ অনেক ভালো অবস্থায় রয়েছে। শুধু একটা জায়গায় অবস্থাটা একই মাত্রায়—সেটা হলো শিশু মৃত্যুর হারে। প্রতি হাজারে ১৬০ জন শিশু জন্মের এক বছরের মধ্যে মারা যায়। বড্ড বেশী।

নিকোই বলে চলে, "অথচ বেবি ফুড খাওয়ানোর কোন দরকার নেই। প্রকৃতি মায়ের দুধের মধ্যে শিশুর যা যা দরকার তাব সবকিছু সুন্দর ভাবে মিশিয়ে দিয়ে রেখেছে। এতো সুসমঞ্জস খাদ্য হতে পারে না—পয়সা দিয়ে কেনা কোন বহুজাতিক কোম্পানীর বেবিফুড এর ধারে কাছে আসবে না। অথচ আধুনিকতার নামে আমরা পয়সা খরচ করছি, বিষ শিশুর মুখে তুলে দিচ্ছি। এর থেকে বড় কোন পাগলামি কি হতে পারে ?"

খাদ্য ছাড়াও মায়ের বুকের দুধের একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। মায়ের কোলে শিশু, মায়ের অনাবৃত স্তন্য শিশুর মুখে, সেই মুখে পরিতৃপ্তি নির্ভরতা নিরাপত্তার অনুভূতি—এই ছবি এমন কোন দেশ নেই যার শিল্পীরা আঁকেনি। এর থেকে সুন্দর ছবি হতে পারে না, ভাবা যায় না। মায়ের দুধ শুধু খাদ্য নয়। এর মধ্য দিয়ে মায়ের সঙ্গে শিশুর এক নিবিড় দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। শিশু যেমন খাদ্য চায় তেমনই চায় মায়ের দেহের উষ্ণতা আর সান্নিধ্য। শুধু কি মনুষ্যশিশু ? মুরগীর মায়ের কচি কচি বাচ্চাগুলো দেখেননি ! অন্য পাখী বা পশুর বাচ্চারাও কি এইভাবে মাকে ঘেঁষে দাঁড়ায় না। কোম্পানীগুলো ব্যবসার স্বার্থে তাই শুধু বিষ ছড়াচ্ছে না, শিশুকে এই উষ্ণ নিরাপত্তাবোধ থেকে বঞ্চিত করছে।

পাশ্চাত্যের মায়েরা বরং দেখি এখন পুরোনো পন্থায় ফিরে যাচ্ছে। আমার ইউরোপীয় মহিলা বন্ধুরা বা বন্ধুদের স্ত্রীরা এখন যতোটা সম্ভব বুকের দুধই খাওয়ান—বোতলের দুধ শুধু সেই অবস্থায়, যেমন পার্টিতে বা বাসে-ট্রেনে, যেখানে অনাবৃত হওয়া যাবে না। শুধু পশ্চিম আফ্রিকার মেয়েরা নয়,আমাদের দেশের আধুনিকাদেরও ভাবতে হবে বিজ্ঞাপন ছেড়ে বিজ্ঞানের কথা। প্রকৃতির কথা।

কোকো তিক্তমধুর। এখানকার জঙ্গল সাফ করে তৈরী কোকোর বাগানে বসে মনে হতে

পারে প্রকৃতি এখানে অকৃপণ, উদার, দু হাত উজাড় করে সব কিছু দিয়েছে। কতো গাছ, বিরাট বিরাট গাছ। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে ওপরে উঠে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। কতো রকমের গাছ। প্রকৃতি ওদের একটা নিয়মমতো সাজিয়েছে। কোন বড় গাছের পাশে কোন ছোট গাছ গড়ে উঠবে, বা কোন গাছকে পাকিয়ে পাকিয়ে কোন ধরনের লতা জড়িয়ে থাকবে, এসবই যেন কয়েকটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম ধরে চলছে। কারো রোদ চাই, কারো ছায়া চাই—কতোটা রোদ বা ছায়া সেটা এই সাজানোর এক বড় কথা। কার কতোটা চারপাশে জায়গা চাই সেটাও খুব দরকারী জিনিস—কেননা মাটির জল আর সার শিকড়ের স্নায়ুপথে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়বে। কোন গাছ বেশী জল বা সার টানলে অন্য গাছ সেখানে হবে না, বা এমন গাছ হবে যার জল বা সারের প্রয়োজন কম।

জঙ্গল যখন এতো বড়, ঘন এবং গভীর—এখানকার মাটি নিশ্চয়ই ভালো।

কঙ্গো বলে, "এখানকার মাটি অবশ্য তেমন খারাপ না। কিন্তু সাধারণভাবে ট্রপিকাল রেইন ফরেস্টের মাটি মোটেই ভালো না। সার, জৈবিক পদার্থ খুব কম, যেটুকু আছে তাও বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে চলে যায়। বহু জায়গাতে মাটিতে লোহার ভাগটাই বেশী। তুমি এতো সবুজ দেখে ভেবো না মাটি খুব ভালো, বরং উল্টো—এতো সবুজ বলেই মাটির দৈন্যটা ঢেকে রাখে।"

মাটি অনুর্বর, ল্যাটেরাইট--রক্তিম--, তবু এতো বড় জঙ্গল! মেনে নেওয়া শক্ত কিন্তু সত্যি। কঙ্গো, মালয়েশিয়া আমাজনের জঙ্গল থেকে শুরু করে ভারতের বহু জঙ্গলের মাটিই খারাপ। তবু বিরাট ভারী অসংখ্য গাছের ক্যানোপি গড়ে উঠেছে। কিভাবে?

এখানেও প্রকৃতি রহস্যময়ী। উত্তরটা মাটির গুণাগুণে নয়, পরিবেশের ভারসাম্যে। জঙ্গল একটা গোটা পরিবেশ ব্যবস্থা—একো সিস্টেম। এখানে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে অন্য উপাদানের সুসমঞ্জস পরস্পর নির্ভর সম্পর্ক—যে সম্পর্ক হাজার হাজার বছর ধরে তৈরী হয়েছে। প্রকৃতি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। হাওয়ায় উড়ে নানা গাছের বীজ এসেছে, গাছ তৈরী হয়েছে—কেউ বেঁচেছে কেউ বাঁচেনি। ওই পরিবেশ কারোকে মেনে নিয়েছে কারোকে নেয় নি। প্রকৃতির ইন্টারভিউতে যারা পাশ করেছে তাদের নিয়েই জঙ্গলব্যবস্থা—এই ব্যবস্থা কালোত্তীর্ণ। জঙ্গলেরও একটা মস্তো বড় ইতিহাস আছে। জঙ্গল কাটতে সময় লাগে না—কিন্তু শত শত বছর লাগে একটা জঙ্গল ওইভাবে সাজিয়ে তৈরী হতে। একইভাবে, ওপরের মাটিটা কেটে ফেলতে সময় লাগে না, লোক লাগালেই হলো—কিন্তু সেই টপ সয়েলও তৈরী হয়েছে শত শত বছর ধরে।

মাটি, গাছ, প্রাণী—সব মিলেই জঙ্গল। একটা আরেকটার ওপর নির্ভরশীল। একা একা এরা কেউ বাঁচবে না। জঙ্গল যেন একটা মস্তো বড় পাম্পিং ষ্টেশন। বৃষ্টির জল জমে থাকে গাছের প্রতিটি অঙ্গে—পাতায়, ডালে, কাণ্ডে, মাটির তলায় শিকড়ে। গাছের ছায়ায় ঢাকা জল সহজে বাষ্প হয়ে আকাশে উবে যায় না। সেই জল সারা বছর ধরে একটু একটু করে জঙ্গল ছাড়ে। জঙ্গল না থাকলে এই জল বর্ষার সময় দারুণ স্রোত হয়ে ওপরের মাটি তুলে নিয়ে ছুটবে। জঙ্গল আছে বলে জলের স্রোত ঠেকায়, মাটি সবসময় সরস থাকে। জঙ্গলের-সিংহ, এ্যান্টিলোপ, বুনো মোষ, গণ্ডার, উভচর হিপোর গোবর কৃষির উর্বরতা বাড়ায়। পাখীদের মলও সার যোগ করে। মৃত্যুর পরে ওদের দেহের একটা অংশ মাটিতে মেশে—জৈবিক পদার্থ বাড়ে। এইসব নিয়ে মাটি এতো বড় জঙ্গল বুকেব ওপর ধরে রাখে।

সেই জঙ্গল সাফ করে যখন মানুষ চাষ করে তখন প্রথম প্রথম ভালো ফসল পায়। কুমারী মাটি সবসময় ভালো। কিন্তু দু এক বছর পর সেই জমির ফসল দারুণ কমে যায়। গোবর, মল পায়না, পাখী-পতঙ্গ-জন্তুর দেহ মেশে না। এখন ঝড় এলে ঠেকাবার কেউ নেই—মাটি

উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। এখন বৃষ্টি এলে আটকাবার কিছু নেই—ওপরের মাটি ভাঙ্গে। তারপরে অন্য সময় জলও থাকে না, মাটি শুকিয়ে যায়—জঙ্গলের পাম্পিং ষ্টেশন যখন অচল। তারপর মাটি আর মাটি থাকে না, এক সময় অনেক নীচের পাথরও বেরিয়ে পড়ে। এই সমস্যা অবশ্য সাভানায় বিশেষ করে চোখে পড়ে। এখানকার জঙ্গলের মাটি অবশ্য খারাপ নয়, কিন্তু অনেক জায়গায়, যেমন পূর্ব নাইজিরিয়ার ইবোদের অঞ্চলে, প্রথা হলো একবার জঙ্গল চাষ করে দশ থেকে কুড়ি বছর ফেলে রাখা—যাতে মাটির পুষ্টি ফিরে আসে। পুষ্টি ফিরলেও সেই জঙ্গল এতো অল্প সময়ে ফিরে আসে না। যে গাছ বা উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলো আলাদা, অন্য জাতের। আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। প্রকৃতির ইণ্টারভিউ শেষ হতে চায় না, শত শত বছর ধরে চলছে। তারপর হয়তো আবার এক সাজানো, সুসমঞ্জস অরণ্য ব্যবস্থা রূপ নেয় যদি না ইতিমধ্যে মাটি দারুণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে।

ঘানার এই জঙ্গলে অবশ্য রোদ্দুর আছে জল আছে—দুটোই পর্যাপ্ত বা প্রয়োজনের চেয়েও ঢের বেশী। বিষুবরেখার পাশেই, বৃষ্টির অভাব নেই। সেটা এক বড় সুবিধা। কিন্তু এর থেকেই আবার দুটো অসুবিধে তৈরী হয়। এক, জঙ্গল সাফ করে যতোই চাষ করো বা বাগান করো, জঙ্গল বারবার ফিরে আসে। জঙ্গল কাটা সহজ নয়—কিন্তু বারবার কাটতে হবে, ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এ এক মস্ত পরিশ্রম আর সময়ের কাজ।

আর একটা অসুবিধা ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার এক বড়ো অংশে—উত্তরের সাহারা বা সাহেল-সংলগ্ন সাভানা বাদ দিয়ে—গরু চোখে পড়ে না। গরুর দুধ তাই নেই, হালের কাজে গরু নেই। মেয়েরা 'হো' নিয়ে মাটি খুড়ে চাষ করে। কিন্তু গরু নেই কেন ? উত্তরের ফলানি যদি গরু নিয়ে ঘোরে, দক্ষিণে এই সংস্কৃতি বা আচার কেন এলো না!

কারণ একটি ছোট্ট প্রাণী। খুবই ছোট। রঙ বাদামী, ছোট ছোট ডানা আছে। আসলে মাছি—নাম সেটসি। দেখে মনে হবে না এই ছোট্ট পতঙ্গ এতো ভয়ংকর। তবু ঘানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, মোট এক-তৃতীয়াংশ জায়গায়, ওরাই সন্ত্রাসের কারণ। শুধু ঘানা কেন, আফ্রিকার কুড়ি লক্ষ বর্গমাইল অঞ্চল জুড়ে ওদের রাজত্ব—প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ডে। ওদের ভয় করে না এমন কেউ নেই। সিংহ, চিতা, হায়েনাকে নিয়ে ঘর করা যায়—কিন্তু এরা অনেক বড় বিভীষিকা।

এই রক্তচোষা মাছি থাকে ঝোপে জঙ্গলে। পশু দেখলেই ওরা ছেঁকে ধরে—রক্ত শুষে নেয়। ওদের হুলের ডগায় থাকে জীবাণু—ট্রাইপানোসোমিয়াসিস—গরু বাঁচে না। মানুষকেও কামড়ায়, গায়ের চামড়া ফুটো করে রক্ত খায়, রোগের জীবাণু ঢোকায়। কিন্তু মানুষের সহ্য শক্তি বেশী। গরু যেভাবে মরে সেভাবে মানুষ মরে না—মানুষ দুর্বল হয় কিন্তু বেঁচে থাকে। কিন্তু মরতে পারে। সেটসী থেকে হয় 'ঘুমের অসুখ', দেহ অবশ হয়, মাথা কাজ করে না, মানুষটা পরে পরে ঝিমোয়, চিকিৎসা ঠিক সময়ে না হলে কেউ কেউ মরে।

সেটসির সমাধান কি ? কজো বলে, "অনেক সমাধান পরখ করে দেখা হয়েছে—কিন্তু কাজ করেনি। নানা ওষুধ দিয়েও ওদের তাড়ানো যায়নি। ডিডিটি দিলে যেমন মশা মরে সেভাবে সেটসি মারা যাবে না। উপায় একটাই। জঙ্গল আর ঝোপ কাটো—মানুষ বসাও। কিন্তু সেখানেও সমস্যা।"

পশ্চিম এবং পূর্ব আফ্রিকার বহু দেশে চেষ্টা হয়েছে এই ভাবে জঙ্গল কেটে বসতি তৈরীর—অনেকখানি জায়গা নিয়ে। কিন্তু তারপরও জঙ্গল বা ঝোপ আবার ফিরে এসেছে—সেটসি সঙ্গে নিয়ে। গরু নিয়ে মানুষ ওখান থেকে পালিয়েছে—সেটসির সঙ্গে পেরে

ওঠেনি। সেটসি ছোট হতে পারে, কিন্তু ওই জঙ্গল আর ঝোপ ওদেরই। গরু রাখবার ভিসা ওরা দেবে না।

শুধু কি সেটসি! বাতাসে প্রচুর জল, প্রচুর আলো চারপাশে। সমস্ত রকমের প্রণের প্রাচুর্যই তাই এখানে চোখে পড়ে। মশা ও নানারকম মাছি, হাজারো রকমের পোকা-মাকড়—অগুন্তি। চারপাশে সবসময় ভনভন করছে, ছুটছে, উড়ছে। এখানকার জঙ্গলে হাতী, সিংহ, চিতা, বড় বড় জন্তুও কম না—নদীতে কুমীর, হিপো, ম্যানাটি। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে চোখে পড়ে ওরা মানুষের মতো ওরাও বাঁচতে চায় বাড়তে চায়। ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে মানুষের বেঁচে থাকাটা সহজ না।

কজো বলে, "এখানে নানারকমের জীবাণু আছে—জঙ্গল এদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু মানুষেরও ইমিউনিটি বেড়েছে। এমন অনেক অসুখ আছে, য়া নিয়ে হয়তো সারা বছর ধরে আমরা ভুগবো কিন্তু মরবো না—ইউরোপীয়রা সেই অসুখে বাঁচবে না। অসুখবিসুখই এক বড় সমস্যা এখানে।"

এই নিয়ে প্রাণীতত্ত্ববিদরা অনেক ভাবছেন। একটা ঝোঁক হলো—ঝোপ জঙ্গল কাটো, বন্যজন্তু ধ্বংস করো, সেটসি তাড়াও, তারপর সেখানে গরু নিয়ে বসে পড়ো। আর একটা ঝোঁক হলো—না, এই সমাধান কাজ করবে না। সেটসিকে মেনে নাও। বন্যজন্তু, ইলান্ড,আরো দশ রকমের এ্যান্টিলোপ, ওদের কামড়ে মরবে না, ওদের বাড়তে দাও। মাঝেমধ্যে জঙ্গলে শিকার করে ওদের মাংস জোগাড় কবো। এর থেকে শস্তায় মাংস তৈরী করা যাবে না। ওই জন্তুরা জঙ্গলেই খাবে—কোন খরচ লাগবে না ওদের খাওয়াতে বা বড় করতে। এই সমাধানের ওপরই জোর এখন বেশী করে পড়ছে। সেটসি যেন জঙ্গলের প্রহরী—ওরা যতক্ষণ রয়েছে বন্যজন্তুরাও নিশ্চিন্ত।

মানুষ, পোকা, পাখী, প্রাণী—সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ কিন্তু জটিল। অনেক পতঙ্গ বা পোকাই মানুষের পক্ষে ভালো—যেমন মৌমাছি বা গুটিপোকা। কিন্তু যারা ভালো নয়, চাইলেই তাদের তাড়ানো যায় না। একটা পথ হলো রাসায়নিক বিষ দিয়ে ওদের মারা, যেমন ডিডিটি—কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে ওরা ডিডিটিতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন বেশ কিছু ধরণের মশা আছে ডিডিটি যাদের কিছু করতে পারবে না—কেউ কেউ আবার এখন ডিডিটি খেতে ভালোবাসে। অন্য যে কোন রাসায়নিক ওষুধই দিন, সময়ের অপেক্ষা, তারপর নতুন জাতের পোকা আসবে যারা ওই ওষুধ হজম করে ফেলবে।

তারপর এক ধরনের জঙ্গলের পোকা ধ্বংস করলেই হবে না। সেই পোকা হয়তো আরো দশ রকমের পোকাকে চেপে রেখেছিল, যারা মানুষের পক্ষে আরও খারাপ। এখন ওই পোকারা গেল তো তারা বড় হলো, আরও ক্ষতি করলো। শুধু কি পোকা? চড়ুই ধান খায়—তাই চীনের এক প্রদেশে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় সমস্ত চড়ুই মেরে ফেলা হলো। পরে দেখা গেল চড়ুই যে পোকাদের খেতো তারা সংখ্যায় বেড়ে ধানের আরো বেশী ক্ষতি করলো। চড়ুই ধানও খায়, পোকাও খায়—ধান যতো খায় তার চেয়ে পোকা খায় বেশী। চীনের কর্তৃপক্ষ আবার চড়ুইদের আদর করে ডেকে আনলো।

রাসায়নিক সমাধান না জৈবিক সমাধান? এই প্রশ্নও উঠেছে। রাসায়নিক সমাধান মানেই এক নতুন সমস্যা। মশা যদি ডিডিটিতে মরেও, মানুষের দেহতেও সেই বিষ ঢুকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও কোথাও মায়ের দুধে ডিডিটির পরিমাণ বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। শব্জীর সঙ্গে কীটনাশক খেয়ে শরীর খারাপের ঘটনা প্রায়ই কানে আসে। সমুদ্রে তেলের জাহাজ ভেঙ্গে তেলের সর কয়েক বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ভাসলো—সেই সর ডিটারজেণ্টে নষ্ট হলো, কিন্তু

পাখী আর মাছও মরলো। এ্যান্টিবায়োটিকস খেলে মানুষের শরীরের জীবাণু মরে, কিন্তু শরীরটাও কখনও কখনও দুর্বল বিধ্বস্ত করে দেয়। রাসায়নিক পথের কি কোন বিকল্প নেই?

ল্যাটিন আমেরিকার কোথাও কোথাও ভ্যাম্পায়ার বাদুড় এক বিভীষিকা। এই ছোট্ট বাদুড় রাত হলে গোয়াল ঘরে ঢোকে, গরুর গলা কামড়ে রক্ত খায়—গরু মারা যায়। যখন বিষ দিয়ে, জাল দিয়ে ঢেকে, অন্য কোনভাবে এই বাদুড়কে ঠেকানো গেল না তখন বিজ্ঞানীরা অন্য এক পথ নিলেন। ওরা গবেষণা করে তৈরী করলেন এক ধরনের শক্তিশালী বড়ো নির্বীজ পুরুষ ভ্যাম্পায়ার, ছেড়ে দিলেন ওই অঞ্চলে। এর ফলে বাদুড় নির্মূল হলো না, কিন্তু ওদের সংখ্যা দারুণভাবে কমে গেল। সেটসি বা মশার ক্ষেত্রেও হয়তো এই সমাধানই কাজ করবে সবচেয়ে ভালো। ভবিষ্যতই বলবে সেকথা। আপাতত সেটসি এখানকার মানুষের দুঃস্বপ্ন।

কঙ্গো বলে, "আমাদের মেনে নিতেই হবে ওরা আছে। ওদের পুরোপুরি তাড়ানো যাবে না। তবু যতোটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ততোটাই ভালো। মাছি, পোকা, পিঁপড়ে, সবাইকে নিয়েই আমাদের সংসার।"

জঙ্গলের আনাচে কানাচে ওরা ছড়িয়ে। হয়তো গাছের ওই ছোট্ট পাতাটা হাত দিয়ে সরালে ওপাশে চোখে পড়বে শুঁয়াপোকা বা পিঁপড়ে। গাছের ফাটল দিয়ে পিলপিল করে কালো, হলুদ, ধূসর নানারকম পোকার মিছিল। ঝোপের মধ্যে একটু হাঁটলেই চোখে পড়ে মাকড়শার জাল—হয়তো সকলের অলক্ষ্যে কোথাও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় রেখে ওই প্রাণীটা ওৎ পেতে বসে রয়েছে। ভনভন করে গুবরে পোকা, নানা রঙের প্রজাপতি, আর মাছি। মাছি দেখলেই ভয় হয়—সেটসি না তো?"

॥ ছয় ॥

কজো বলে, "মৌসুমী আর হারমাটান এই দুয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে আমরা বেঁচে রয়েছি।" মৌসুমী আসে দক্ষিণ পশ্চিমের সমুদ্রের আর্দ্রতা নিয়ে। হারমাটানের ঠিকানা উত্তর পূর্বের সাহারা—তাই শুষ্ক, আর গরম। সমস্ত ঘানা জুড়ে এই দুই হাওয়ার খটাখটি। হারমাটান তো হাড় মাতানো নয়ই, এমনকি হাড় কাঁপানোও নয়—বরং হাড় জ্বালানো কথাটাই হয়তো সঙ্গত। উত্তর পূর্বের ওই দমকা গরম হাওয়ায় সাভানার ঘাসে যেন ফোস্কা পড়ে, মাটি ফেটে চৌচির হয়। যে বছর হারমাটান এই দ্বন্দ্বে জেতে সে বছর উত্তরের এক বড় অংশ জুড়ে খরার অবস্থা হয়। আবার মৌসুমীর দাপট যে বছর উত্তরের ওই জ্বলন্ত বাতাসকে ঠেলে সাহারাতে নিয়ে গিয়ে অন্তরীণ করে সেবার সাভানার ঘাস ফুলে ফুলে ভরে যায়, মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটে।

জঙ্গলের পর গিনী সাভানা। কোকোর চাষ দেখে জঙ্গল ঘুরে আমি যে এখন উত্তরের সাভানায় যেতে চাইবো সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি না বললেও কজো আর নিকোই সেটা বোঝে। ওরা আমাকে বুঝে গিয়েছে। তবু ওরা আমার পিছনে লাগতে ছাড়লো না।

"সাভানায় কি দেখবে মরা ঘাস ছাড়া বরং দেখতে চাও তো কুমাসি যাও, আসান্তি রাজাদের রাজধানী আক্রা ভালো করে দেখো। বা চল ভোল্টা লেক দেখে আসি। ঘাসের বনে তো আর বিশেষ কিছু দেখবে না! তোমার যে কি অদ্ভুত পছন্দ বুঝি না। চলো আকোশোম্বো যাই।"

শেষে একটা বোঝাপড়া হলো। আমি আর কজো আকোশোম্বো যাবো, ভোল্টা লেক দেখবো। কিন্তু সেখান থেকে যাবো সাভানায়—গিনি সাভানায়, যেখানে ঘাসের বনের ফাঁকে ফাঁকে গাছ আর ঝোপ। কজোর কাছে জানি, 'গিনি' কথাটার বার্বার ভাষায় মানে, 'সুদানে'র মতোই—'কালো মানুষ'।

ভোল্টা হ্রদ যে কতো বড় সেই ধারণা আগে ছিল না। আকোশোম্বো এক ছোট্ট জনপদ—যার একমাত্র দেখার জিনিষ নদীর ওপর ওই তিনশো ফিট উঁচু বাঁধ। জল উত্তরে জমে তৈরী হয়েছে তিন হাজার বর্গ মাইলের এক বিরাট জলাশয়—যেটা এক কিম্ভুত সরীসৃপের চেহারা নিয়ে নানা মাপের হাত পা ছড়িয়ে উত্তরের এক বড় অংশকে জড়িয়ে রয়েছে। এই হ্রদ প্রকৃতি তৈরী করেনি, পুরোপুরি মানুষের বানানো। কিন্তু এখানে গেলে, দেখলে, মনে হয় না এ ব্যাপারে মানুষের কোন হাত আছে। বাঁধের কাছে জলোচ্ছ্বাস অবশ্য দেখবার মতো—জলাশয় থেকে বাঁধন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা মুক্ত ভোল্টার জল অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঢেউ তুলে আর ফেনা জলে ছিটিয়ে ঝড়ের মতো নামছে। দু পাশে নানা সাইজের টিলা আর পাহাড় কেটে গভীর খাত তৈরী করেছে নদী। এতোবড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু কিছুটা উত্তরে গেলেই এই বাঁধ আর তেমন চোখে পড়বে না। তখন যে দিকে দু চোখ যায় ছড়ানো বিস্তীর্ণ জলরাশিই বড় হয়ে উঠবে। বাঁধের কাছ থেকে অনেকক্ষণ জলের স্রোত দেখলাম—তার পরিমাণ সেকেণ্ডে আটত্রিশ হাজার কিউবিক ফিট, আমাদের ফারাক্কার কাছে গঙ্গার মতোই, একটু হয়তো বেশী। চওড়ায় ভোল্টা নদী গঙ্গার ধারে কাছে আসে না।

১৯৬৫ সালে এই বাঁধ তৈরী, তার দু বছরের মধ্যেই জল জমে জমে হ্রদ তার আজকের রূপ নিয়েছে। কজোর কাছে জানি এই বাঁধের তৈরী প্রায় আটশো মেগাওয়াট বিদ্যুতে ঘানার খুব ভালোই চলে, খানিকটা বিক্রীও করে বাইরে। বাঁধ তৈরী কখনোই অবিমিশ্র আনন্দের ব্যাপার নয়, বিশেষ করে যাদের জমি এর ফলে জলে ঢেকে যায়। ভোল্টা হ্রদ এখন পৃথিবীর চতুর্থ বড় মানুষের তৈরী হ্রদ, বারো কোটি একর ফিট জল সেখানে জমে রয়েছে—কিন্তু এর জন্য আশি হাজার মানুষকে তাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে বাহান্নটা নতুন তৈরী করা শহরে বা জনপদে বসানো হয়েছে। যারা জমি হারিয়েছে তারা টাকা পেয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসাবে—কিন্তু সেই টাকা জমি না কিনে অন্যভাবে খরচ হয়ে গিয়েছে—ওরা এখন ভূমিহীনের দলে।

ভোল্টা পশ্চিম আফ্রিকার এক বড় নদী—এক হাজার মাইল লম্বা। উত্তরে আপার ভোল্টায় জন্ম—দুটো বড় শাখা, সাদা আর কালো ভোল্টা, উপকূল থেকে প্রায় তিনশো মাইল দূরে ঘানায় এসে মিশেছে। যেখানে প্রায় এক মাইল চওড়া চেহারা নিয়ে সমুদ্রে নেমেছে তার খুব কাছেই নিকোইর গ্রাম, যেখানে আমি গিয়েছি। পূর্বে টোগোল্যাণ্ড সীমান্তে দুই থেকে তিন হাজার ফিট উঁচু পাহাড়, যেটা আকোশোম্বো থেকে চোখে পড়ে। আক্রার সমতলের তুলনায় এখানে বেশ খানিকটা উঁচু নীচু ভাব।

সাভানা ঘানার প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ অঞ্চল—আকোশোম্বোর ঠিক উত্তরে। পুরো সাভানার চাষ নির্ভর করে বৃষ্টি আর এই নদী ও হ্রদের জলের ওপর। বৃষ্টি কখনো দারুণ কম, কখনো দারুণ বৃষ্টি—কখনই ঠিক ঠিক নয়। কোন বছরে হয়তো প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ কিউবিক ফিটও মেলে না ; কখনো আবার পাঁচ লক্ষ কিউসেকের বিরাট জলের ধারায় বন্যার মতো হলো। এই বাঁধ হয়ে সেই সমস্যা অনেকখানি কেটেছে—এখন খরার সময়ও জল পাওয়া যায়, বন্যা ঠেকায়, বিদ্যুৎ তৈরী হয়। কিন্তু এই জলের ব্যবস্থা কৃষিতে যতোটা হওয়া উচিত ছিল ততোটা হয়নি।

বাঁধ আর হ্রদ অঞ্চল বাদ দিলে ভোল্টা খুবই শীর্ণ নদী। আকোশোম্বোর কাছে নদী কয়েক ধাপে পাহাড়ী পথে নেমে এসেছে বলে জলের তোড় খুব চোখে পড়ে, কিন্তু তার নীচের একশো মাইলের মতো সমতলভূমিতে এই নদী না চওড়া না গতিশীল। নাইজার বা গঙ্গা বা নীল নদী দেখে যেরকম মন ভরে যায়, সেভাবে এই নদী দেখে উচ্ছ্বাস আসে না। তবু ঘানার মানুষের কাছে এই নদী গঙ্গা নীল বা নাইজারের মতোই।

আকোশোম্বো আক্রার উত্তর-পূর্বে, প্রায় চার ঘণ্টার মতো লাগলো পৌঁছতে। ওখানে সামান্য কিছুক্ষণ থামলাম। তারপর আমরা গেলাম পশ্চিমে, আরও প্রায় চার ঘণ্টা, সাভানার এক গ্রামে, ভোল্টা হ্রদের কাছেই। আক্রার চারপাশ সমতলভূমি। এখানে আমরা মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে। এই মালভূমি খুব উঁচু নয়, দেড় হাজার দু হাজার ফিটের মতো। কিন্তু এর মধ্যেই উপকূলের ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গে এক বড় পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। উপকূলের সাভানায় জঙ্গল না থাকলেও সমুদ্র কাছেই, বাতাস আছে, চড়াই উৎরাই নেই। এখানকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে দৃশ্য পাল্টাচ্ছে। রাস্তা ভালো নয়। ঝাঁকুনি মাঝে মাঝে অসহ্য। মাইলের পর মাইল বড়ো বড়ো ঘাসের বন—কোনটা পনেরো ষোল ফিট উঁচু কি আরও বেশী। আরও যেটা চোখে পড়ে, এখানকার ঘাসের বনের মধ্যেই এখানে ওখানে ছড়ানো নানারকমের গাছ আর ঝোপ। সমস্ত কিছু মিলে পরিবেশের মধ্যে একটা রুক্ষতা। গরম তো আছেই—তবে দক্ষিণের উপকূলের ভ্যাপসা ভাবটা নেই।

যে গ্রামে কজো আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললো সেটা খুবই ছোট। হয়তো গোটা পঁচিশ ত্রিশ কুঁড়েঘর হবে। গ্রাম না বলে হ্যামলেট বলাই হয়তো সংগত। দেখে বোঝা শক্ত নয়, যে

এখানকার মানুষের অবস্থা উপকূলের তুলনায় খারাপ। তবে একটা বড় মিল—শিশুরা, যেখানে চোখ পড়ে সেখানেই ওরা। বিরাট বড়ো বড়ো কৌতূহলী চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে, চোখে চোখ পড়লে হাসছে, একেবারে ছোটগুলো ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ছোটদের পরনে পোষাক সামান্যই—অধিকাংশই উলঙ্গ। অন্য মানুষগুলোও চেষ্টা করছে যতো কম সম্ভব পোষাক পরে চালাতে। আমারও ইচ্ছে হলো জামাটা খুলি। গরমটা অসহ্য—নেহাৎই লজ্জা লাগলো বলে অস্বস্তি উপেক্ষা করে ওই পোষাকে থাকলাম।

কজো জানায়, ওরা আকান, ঘানার সবচেয়ে বড় জাতি। আইভরী কোস্টেও এরা আছে। এদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, কিন্তু উপকূলের ইউয়েদের মতো পূর্বপুরুষদের মানে, ওদের পুজো করে। ওদের আত্মার নাম করে সামাজিক সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান হয়। ওই গ্রামের সকলেরই পূর্বপুরুষ এক। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মীয়। সেই আত্মীয়তার বন্ধন বাড়ে কারণ বিয়ের সময় মামাতো বা পিসতুতো বোনই পছন্দ। এরা কেউই খৃষ্টান বা মুসলমান নয়—আদি ধর্ম বা আচারের অনুগামী। ঘানার প্রায় আদ্ধেক মানুষই এইরকম। দশজনে একজন মুসলমান, বাকিরা খৃষ্টান।

যে মানুষটা সমাদর করে আমাদের বসালেন তিনিই এই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। বয়স কতো ? বোঝা বড় শক্ত। মাথার চুলে পাক ধরেছে, চুল পাতলা, এক বড় অংশ নিয়ে টাক, মুখের চামড়ায় অসংখ্য কুঞ্চন, কোথাও ঝুলে পড়েছে। গায়ে সনাতনী ঢোলা পোষাক। ঘরের সবচেয়ে ভালো টুলটা আমায় দিলেন, যেটা এক বড় সম্মান, কেননা ওই টুল পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত। কফি এলো। অতিথি পরিচর্যার কোন ঘাটতি এদের কখনো থাকে না। রঙ চেহারা যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এই ধরনের বৃদ্ধ বহুবার চোখে পড়েছে। সমস্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও বেশ সহজ এবং আপন মনে হয়—যেমন লাগে মেদিনীপুর বা মালদার কোন গ্রামে।

মানুষটার কাছে অনেক কিছু জানলাম। এই গ্রামের পত্তন প্রায় সত্তর আশী বছর আগে, ওর বাবার আমলে। উনি অন্য জায়গা থেকে ভাইদের নিয়ে এখানে আসেন, ঘাস পুড়িয়ে কেটে গ্রাম পত্তন করেন মাঠ তৈরী করেন। তারপর একটু একটু করে গ্রাম বেড়েছে জমি বেড়েছে। জমি ভালো নয়। তাই এক জমি চাষ করে কয়েক বছর ফেলে রাখতে হয়। সেখানেও আজকাল যেটা ঝামেলা—আগে যতো বছর ফেলে রাখতে পারতো এখন সেটা পারে না। জমির যোগান কমছে। তবে দক্ষিণের তুলনায় এখনও মানুষ এখানে খুবই কম। প্রতি বর্গমাইলে মাত্র পঁচিশজন।

জঙ্গলের চাষের সঙ্গে এক বড়ো পার্থক্য—এখানে এরা চাষ করে নিজেদের জন্য, খাবারের জন্য—বিক্রী করবার জন্য নয়। তাই জোরটা পড়ে ইয়াম, কাসাভা এই সব শস্যের ওপর। যেখানে ভোল্টা হ্রদের জল নীচু জমিতে জমে সেখানে ধানও বানায়। জল কোন বছর পায় কোন বছর পায়না। যে বছর পায় সেবারও বছরে মাত্র মাস দুয়েক ভালো বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টি প্রচুর—১১০০ থেকে ১২০০ মিলিমিটারের মতো—কিন্তু জল তার পরই নেমে যায়। বাকি সময়টা জলই এক মস্তোবড় সমস্যা। উপকূলের জঙ্গলের মতো সারা বছর ধরে জল থাকেনা।

বৃদ্ধ বলেন, "যতো উত্তরে যাবেন ততো জল কম পাবেন। গাছ কমতে কমতে আর থাকবে না। ঘাসগুলো ছোট্ট হতে হতে হাঁটুর নীচে চলে যাবে। দেখবেন গরম ঝোড়ো হাওয়ার কী ভীষণ দাপট। তবে একটা ভালো দিক আছে।"

কি ?

"গরম হাওয়ার দাপট যেখানে বেশী সেখানে সেটসি মাছিও কমতে থাকবে—তারপর আরও উত্তরে আর থাকবেই না। ওখানে তাই গরু নিয়ে যাযাবররা ঘুরে বেড়াতে পারে, যা এখানে

আমরা ভাবতেই পারিনা।"

সেটসিহীন পশ্চিম আফ্রিকা ভাবতেও ভালো লাগে। সেই আরো উত্তরে আমরা অবশ্য যাইনি। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কজো বলে, জঙ্গল আর সাভানার সীমারেখার কাছে দুটো অঞ্চলের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো রয়েছে। এখানে এমন রুক্ষ্ম গরম বাতাস নেই যে সেটসি একেবারে থাকবে না। তাছাড়া সেটসি ছাড়াও মানুষের শত্রু কম নেই। ও আঙুল দিয়ে সামনের ছেলেগুলোকে দেখায়।

এখানে আসবার পর থেকেই মাছির আক্রমণে ব্যতিবস্ত। তবে সেটসি নয়। হাত পাখা দিয়ে যতদূর সম্ভব ওদের সরিয়ে রাখছি।একটা ছেলে এক বড়ো পাখা নিয়ে আমাদের চারপাশে হাওয়া দিচ্ছে, যাতে মাছি না বসে। ভনভন শুনলেই অস্বস্তি—নড়েচড়ে বসি।

কিন্তু ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়া বাচ্চাগুলোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। জন্ম থেকেই মাছি ওদের জীবনের সঙ্গী। ওরা বিরক্ত হয় না। সেটসি যেখানে বাদামি, এই মাছিগুলো কালো বা ধূসর, নামও 'ব্ল্যাক ফ্লাই'। দেখতে অনেকটা আমাদের বাঙালী মাছির মতোই।

কিন্তু সেখানেও এক বড় তফাৎ, যা দেখে চোখে পড়বে না। সেটসির মতো ওরাও রক্তচোষা। ওদের কামড়ে মুরগী, পাখী, ছোট জন্তু সহজেই মরে। কামড়ায় মহিলা মাছিরা, এবং সদলবলে। একটা দুটোর কামড় কিছুই না–কিন্তু ওরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। এমনও শোনা যায় যে কোথাও কোথাও গরু বা ঘোড়ার নাকের মধ্যে শয়ে শয়ে ঢুকে ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে ওই বড়ো প্রাণীগুলোকেও মেরে ফেলে। আমেরিকার কোথাও কোথাও ওরা আছে, সেখানেও ওরা এক বড় আতংক।

সবচেয়ে বড় ক্ষতি ওরা করে ওই প্রাণবন্ত, ছুটে বেড়ানো বাচ্চাগুলোর। ওদেব আক্রমণের লক্ষ্য বাচ্চাদের চোখ। কোন কোন বাচ্চার চোখ দুটো মাছিতে মাছিতে ভরে যায়। কামড়াবার সঙ্গে ডিম ফেলে—সেই ডিমের মধ্যে থাকে অনকোকারসিয়াসিসের জীবাণু। ওই জীবাণু চোখের চামড়ার তলায় বড়ো হয়, তারপর অন্ধ করে দেয় শিশুকে।

কজো বলে, "দক্ষিণে যেমন সেটসি, উত্তরে তেমনই এই ব্ল্যাক ফ্লাই। শিশুদের মধ্যে গড়ে একশো জনে তিনজন অন্ধ—কোথাও কোথাও একশো জনে দশজন। তুমি এখানকার গ্রামে গ্রামে প্রচুর অন্ধ লোক দেখবে। এই গ্রামেও। কারণ একটাই—ওই মাছি। কিন্তু এই মাছি তাড়ানো এক দারুন কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তারপর সাধারণ মানুষ এই সব অঞ্চলে একটু পিছিয়ে—ওরা ভালো করে জানেও না মাছির সঙ্গে ওই অন্ধত্বের কি সম্পর্ক।

এখানে ওই মাছি কেন? দক্ষিণে কেন নয়?

এখানেও উত্তর—প্রকৃতি। এই অন্ধত্বের আর এক নাম 'রিভার ব্লাইণ্ডনেস', "নদী-অন্ধত্ব"। এখানকার নদী খরস্রোতা বেশী, কয়েক মাইল অন্তরই বেশ খানিকটা নীচে নামে। স্রোতের জলে এই মাছি জন্মায় আর বাড়ে। আমাদের দেশে বদ্ধ জলই এক বড়ো সমস্যা, সেখানে মশা জন্মায়। এখানেও বদ্ধ জলে মশা হয়, ম্যালেরিয়া এখানেও এক বড়ো সমস্যা। কিন্তু যে জল থেমে থাকে না,জোরে ছোটে, সেখানেও মশা না তৈরী হলেও তৈরী হয় কালো মাছি—যে মাছি শিশুদের অন্ধ করে।

বৃদ্ধ বলেন, "জলই আমাদের সমস্যা। জল না পেলে দুর্ভিক্ষে পিপাসায় আমরা মরি। জল থাকলেও হাজার রকমের অসুখ। মরবো আমরা ঠিকই—জল পেয়ে বা জল না পেয়ে। আর শুধু কি কালো মাছি? শামুকও আমাদের শেষ করে দিলো।"

ভোল্টা হ্রদের কল্যাণে জল এখন ছড়িয়ে পড়ছে। জলের সঙ্গে ছড়াচ্ছে অসংখ্য শামুক। শামুকের পেটে কৃমি—সেই কৃমি শামুক থেকে মানুষে ছড়ায়, যখন মানুষ ওই জলে নামে স্নান

করতে বা আর দশটা কাজে। অসুখটার নাম বিলহার্জিয়া বা সিসটোসোমিয়াসিস—ম্যালেরিয়ার পরই সবচেয়ে বেশী মানুষ যে অসুখে ভোগে। ওই কৃমির লক্ষ্য অন্ত্র বা প্রস্রাবযন্ত্র—যারা ভোগে তাদের রক্তবমি বা রক্ত-পায়খানা হয়। মরে অবশ্য বেশী না, আফ্রিকানরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অসুখবিসুখে সময় নষ্ট হয়, কাজ বন্ধ থাকে, শরীর দুর্বল হয়, প্রাণশক্তি অনেকখানি কেড়ে নেয়। সেচের জল চাষ বাড়ায়, ফলন বাড়ায়, প্রকৃতির অনিশ্চয়তা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে ফেলে—কিন্তু সঙ্গে আনে শামুক, বিলহার্জিয়া, যার ফলে সুযোগ পেয়েও সেই সুযোগ ওরা পুরোটা কাজে লাগাতে পারেনা।

সেটসি, ব্ল্যাক ফ্লাই, শামুক—সবকিছু নিয়েই পশ্চিম আফ্রিকা। সমস্ত জঙ্গল ভর্তি সেটসি, নদীর স্রোতে বাড়ে কালো মাছি। সেচের শাখাপ্রশাখার সঙ্গে বাড়ে শামুক।

যে মেয়েটি আমার জন্য কফি নিয়ে এলো, সৌন্দর্য্যে সে হয়তো নিকোইর চেয়ে একটু কম—কিন্তু একই রকম সহজ ও সপ্রতিভ। অল্পবয়সী বউ। বৃদ্ধের নাতনী স্থানীয় হয়তো। বহুক্ষণ থেকেই দূর থেকে আমাকে দেখছিল। এখন কফি দিতে এসে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে। নিশ্চয়ই আমার চেহারায় পোষাকে বা ভঙ্গীতে হাসির উপাদানও পেয়েছে—নয়তো হাসবে কেন ? সাজসজ্জা পুরোদস্তুর—চুলের বিনুনীগুলো ঠিকমত আঁটসাঁট করে বাঁধা। স্কার্ফটা মাথার এক বড়ো অংশ জুড়ে জড়ানো। পিঠে বাঁধা টুলটুলে চোখ বাচ্চাটাও কৌতূহলী চোখ দিয়ে আমায় গিলছে।

কজো বলে এই গ্রামেই মেয়েদের টাইম-বাজেটিং নিয়ে একটা সার্ভে ও করেছে। সেই সার্ভেতে প্রমাণ হয় যে মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশী কাজ করে। একটা পুরো দিনের মধ্যে মেয়েরা কাজ করে বারো ঘণ্টা, ছেলেরা সোয়া নয় ঘণ্টা। জঙ্গলের তুলনায় মেয়েরা এখানে মাঠে বেশী কাজ করে, যেহেতু খাবার উৎপাদনই এখানকার চাষের মূল লক্ষ্য। যেখানে পণ্য বেশী—সে কোকোই হোক বা নিকোইর গ্রামের সালোটই হোক, সেখানে অবশ্য পুরুষরা মাঠে বেশী সময় দেয়।

কিন্তু শুধু কি চাষ ?

আমি মেয়েটাকে জিগেস করি, "তুমি আর কি কর ?"

মেয়েটা আমার কথা শোনে আর খিলখিল করে হাসে। সেই হাসি নার্ভাস করে দেবার মতো। মনে হীনমন্যতা আসে, অস্বস্তি আসে—এটা কি বোকার মতো কোন প্রশ্ন হয়ে গেল ? পরে দেখি ও সবকিছুতেই হাসে। কখনো খিলখিল করে, কখনো কোন বন্ধুর গায়ে এলিয়ে পড়ে, কখনো মুখ টিপে—যখন হাসেনা তখন ওর চোখ হাসে। ওর কাছে হাসাটাই স্বাভাবিক, আমার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হাসি সামলে ও যেটুকু বলে তার মর্মার্থ: "আমাকে তো সবই করতে হয়। মাটি ভেঙ্গে ক্ষেত বানাও, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াও যত্ন নাও, রান্না করো, ঘর পরিস্কার করো, জল আনো—কি করিনা বলুন !"

"তোমার স্বামী !"

আবার দমকা হাসি, "ও কিছুই করে না। শুধু কথা বলবে, নেশা করবে।" সেটা অবশ্য পুরো ঠিক নয়। এখানে যখন থাকে তখন ওর স্বামী গল্প করে নেশা করে সময় কাটায়। কিন্তু থাকে কতক্ষণ ? ওর আসল কাজ দক্ষিণের বক্সাইটের খনিতে। সোনা, বক্সাইট থেকে শুরু করে হীরা, ম্যাঙ্গানিজ পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘানাতে পাওয়া যায়। সাভানার বহু গ্রামের পুরুষরা যায় সেখানে কাজ করতে।

কজো হিসাব করে দেখেছে কোন্ কাজে কতো সময় লাগে। রান্নায় এক থেকে তিন ঘণ্টার মতো তো বটেই। কিন্তু এক বড় পরিশ্রমের কাজ হলো জল আনা। বিশেষ করে সাত আট মাস, যখন আকাশে বৃষ্টি নেই, যা বৃষ্টি পড়েছে তা শুকিয়ে গিয়েছে, মাটি শুষে নিয়েছে বা জল গড়িয়ে নীচে নেমে গিয়েছে, তখন জল আনতে হয় অনেক দূরের নদী বা জলাশয় থেকে—কখনো পুরো এক থেকে দু-ঘণ্টা লেগে যায শুধু এই কাজে। শুধু সময় নয়, পরিশ্রমও লাগে প্রচুব। হিসেব করে দেখা যায়, মোট ক্যালোরী খবচের প্রায় সিকিভাগ যায় জল মাথায় বয়ে দূর থেকে আনতে।

কজোর অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগত সত্তা ফিরে আসে। ও বলে, "আমরা সব সময় হিসেব করি টাকার অঙ্কে—কতো খরচ করলাম ! কিন্তু টাকা ছাড়াও আবো কতো রকমের জিনিষ খরচ হলো সেই হিসেব রাখিনা। যেমন ধরো ক্যালোরি। আমবা খেয়ে ক্যালোবি দেহে ঢোকাই, এটা যেন টাকা আয় করবার মতো। তারপব যতো খাটবে ততো ক্যালোরি খবচ হবে। ক্যালোরি আয়ের থেকে ব্যয বেশী হলে শবীব শুকিযে যাবে, নানারকম কঠিন অসুখ হবে। আবার ক্যালোরি কম খরচ হলে সেটা দেহে জমবে, কখনো কখনো বড্ড বেশী জমে শরীব ফুলে যাবে। তাই দরকার ক্যালোরি এ্যাকাউন্টিং-এর। প্রতিটি মুহূর্তে হিসেব কবতে হবে কতো ক্যালোরি এল কত গেল। না করলেই নানা গণ্ডগোল।"

বড়লোক দেশগুলোতে ক্যালোরির হিসাব মানুষ রাখে মেদ কমাবার তাগিদে। এখানে সমস্যার ধবনটা একেবাবে উল্টো। ভারী কাজে ক্যালোরীর খরচ বেশী—যেমন জল আনতে বা চাষের জন্য মাঠ তৈরী করতে। কিন্তু সমস্যা যেটা—সারা বছর ধরে ক্যালোরিব আয়-ব্যয সমান থাকে না। যখন চাষের সময—মাঠের কাজে ক্যালোরি লাগবে সবচেয়ে বেশী তখনই হয়তো ঘরে খাবার সবচেয়ে কম। ফলতঃ মাঠের কাজ ভালো হয় না, দুর্বল না খাওযা শরীর আবো দুর্বল হয়, ফসল যা হতে পারতো তা হয় না, পরের বছর সমস্যা আবও বাড়ে। অড্রি রিচার্ডসের বইতে এই সময়টার নাম দেয়া হয়েছিল 'হাংরি পিরিয়ড', 'ক্ষুধার্ত সময়', যখন ঘরে ভাত বাড়ন্ত, কিন্তু মাঠে কাজের দরকার। রিচার্ডসের লেখা অবশ্য রোডেশিয়া নিয়ে, ১৯৩৯ সালে, কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকার এখনকার অবস্থাও একই রকমের।

শুধু কি ক্যালোরির হিসাব ?

কজো বলে, "জলের হিসাব আমরা কেন বাখবো না ? যেখানে জল প্রচুর সেখানে হয়তো এই হিসেব না রাখলেও চলে। কিন্তু যেখানে প্রতিটি জলেব বিন্দুর মূল্য আছে সেখানে ? সাভানায় যখন খরা হয় তখন এরা প্রতিটি জলবিন্দু গুণে খরচ করে। তাছাড়া উপায় কি বলো ? ভাবতে হবে কোন্ শস্য লাগাবে ? জল প্রচুর পেলে ধান গম, এইরকম দশটা জিনিষ হতে পারে। না পেলে বাজরা, জওয়ার, ইয়াম—এই সবই ভাবতে হবে, যারা অল্প জলেও বেঁচে থাকবে, খরা যাদের প্রাণে মারতে পারবে না। এই অবস্থায় যদি হিসেব করো এই জলাশয়ে এতটা জল আছে, এবং প্রয়োজন এতটা খাদ্যের, তখন ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে, ওদের জলের খিদে ধরে, কোন্ শস্য বানাবে।"

এখানকার চাষীকে 'ওয়াটার এ্যাকাউন্টিং' বললে সে হয়তো বুঝবে না, কিন্তু জলের মোটামুটি একটা হিসেব সে রাখে। না রেখে তার উপায় নেই। ওই গৃহবধূটিও রাখে। বৃষ্টি যখন পড়ে তখন ও বেশ খানিকটা জল পানীয় হিসেবে ধরে রাখে। এমন কোন ফসল ফলায় না যার জলের লোভ বড্ড বেশী।

হিসেবটা শুধু টাকা, ক্যালোরি বা জলের নয়। এখনকার সবচেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত কথা 'এনার্জি-অ্যাকাউন্টিং'। ক্যালোরির হিসেবও এনার্জির হিসেব। কতো তেল, কতো গ্যাস, কতো

কয়লা, বা আণবিক শক্তি—এই হিসেবই এখন মাথা ধরিয়ে দেবার মতো। আকোশোম্বোর বিদ্যুৎ প্রকল্প ঘানার প্রয়োজন মেটায়—ভবিষ্যতে যদি না পারে? যে গ্রামে বসে আমি কথা বলছি সেখানে বিদ্যুৎ নেই, কিন্তু ওখান থেকে আরো দূরের আলোকোজ্জ্বল রাজধানী আক্রায় কখনো লোডশেডিং হয়না। যখন সত্যি সত্যি ঘানার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়বে, তখন কি আকোশোম্বোর সাধ্য আছে সেই প্রয়োজন মেটাবার?

"আকোশোম্বো না পারলেও করা সম্ভব", কজো বলে, "আমাদের রোদ্দুর আছে।"

বিষুবরেখাব প্রায় ওপরই আমরা বসে। সেখানে এর থেকে বড় সত্য আর কি থাকতে পারে? বোদ্দুরই তো এনার্জির উৎস। গাছপালা সবুজের ফাঁদ পেতে ওখান থেকেই এনার্জি ধরে, খাবারে রূপান্তরিত করে সমস্ত দেহে পাঠায়। সেই গাছপালা আর উদ্ভিদ খেয়ে অসংখ্য প্রাণী বাঁচে—ওদের খেয়ে বাঁচে অন্যরা, তারপর তারা আবার অন্যদের খাদ্য হয়ে ওঠে। এ যেন এক 'খাদ্য শৃঙ্খল', খাদ্য খাদকের ফুড চেইন, পরপর সাজানো। কিন্তু শৃঙ্খল যেভাবেই সাজাও, খাদ্য যাই পাও মশলা যাই দাও, রঙ যতোই খুলুক, জিনিষ আসলে একটাই—রোদ্দুর। সেই রোদ্দুব এখানে অফুরন্ত, সব জায়গায় ছড়িয়ে। এনার্জির এখানে অভাব হবে কেন?

গত কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চলছে রোদ্দুরকে ধরবার—এমনভাবে ধরা যাতে দিন গিয়ে রাত এলেও রোদ্দুর না ফুরিয়ে যায়। ওই বোদ্দুরকে সংগ্রহ করতে হবে ধাতুর জাল পেতে, তারপর জমাবার কায়দা রপ্ত করতে হবে, যেমন ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ ধরে, তারপর খরচ করতে হবে মানুষের প্রয়োজন ধরে। এর থেকে সহজ কাজ হয়তো কিছু হতে পারে না। সমাধান যখন শেষ অবধি সত্যি সত্যি বের হবে, তখন হয়তো সবাই আমরা বলবো, "কি সোজা"। আপাততঃ বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তিবিদরা ওই 'সহজ' সমাধানের সন্ধানে মগজ তোলপাড় করছেন।

ফিরবার আগে মেয়েটা খিলখিল করে মুখ হাত দিয়ে চেপে অকারণে হাসলো। বৃদ্ধ তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। বাচ্চাগুলোর কৌতূহলী দৃষ্টি গাড়ীটা দিগন্তে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এঁটে থাকলো। আমি আর কজো রোদ্দুর, মাছি, শামুক আর ক্যালোরির হিসেব নিয়ে সারা পথ ঝগড়া করতে করতে ফিরে চললাম। যাতায়াতেই সময়টা যেন কেটে গেল, আক্রায় ফিরলাম গভীর রাতে। গ্রাম দেখার সময়টা সেই অনুপাতে সামান্যই। তবু তো দেখা হলো।

॥ সাত ॥

দ্বিতীয় দফা আক্রা যাবার পথে প্লেনে আরতিকে সব বললাম। এর আগেও বলেছি। আর একবার ঝালিয়ে নেয়া আর কি। বলতেও ভালো লাগে। বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায়, কোথায় গেলাম কি দেখলাম।

আবতি বললো, "আক্রা কেমন লাগলো ?"

আমি বললাম, "সত্যি সত্যি এখনও ভালো করে দেখিনি। থেকেছি ওখানে। গাড়ীর জানলা দিয়ে দেখেছি যেটুকু দেখবাব। বাকিটা তোমার সঙ্গে দেখবো বলে রেখে দিয়েছি।"

আরতি বললো, "হুঁ। কুমাসি গিয়েছিলে ?"

বললাম, "কুমাসির পাশ ঘেঁষে গিয়েছি, ঢোকা হয়ে ওঠেনি। ওটাও তোমার জন্য রেখে দিয়েছি।"

আরতি বললো, "হুঁ। তাহলে দেখছি সবই তুমি আমার জন্য রেখে দিয়েছো ? রাজধানী দেখোনি, আসান্তির রাজাদের পুরোনো রাজধানী কুমাসি যাওনি ! তবে দেখলেটা কি ? কোকোর চাষ জঙ্গল আর ঘাস ?"

আশান্তিদের নিয়ে অশান্তি করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না তাই যোগ করলাম, "আর দেখলাম এখানকার মেয়েদের।"

বেল্টবদ্ধ আরতি একটু নড়ে চড়ে বসলো বলে মনে হলো। চোখেমুখে এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

আমি বললাম, "সত্যি বলছি। ঘানায় মেয়েরাই এক বড় দ্রষ্টব্য। এই রকম সপ্রতিভ, সহজ আত্মপ্রত্যয়শীল মহিলা সমাজ আমি খুব কমই দেখেছি। তুমি ঘোরো, তোমারও ওদের দেখে ভালো লাগবে।"

আরতি বললো, "তোমরা ছেলেরা সবই এক।" মনে হলোনা যা বলতে চেয়েছি সেটা বোঝাতে পেরেছি।

আক্রায় পৌঁছে আমার যা দরকার ইত্যাদি সেগুলো মেটানোর পর, আমরা দুজনে শহর-পরিক্রমায় বেরুলাম। এই দেখাটা পায়ে হেঁটেই সবচেয়ে ভালো হয়। ইউরোপ বা মার্কিনী মহাদেশে যেটা সুবিধে, শহরের ভালো ম্যাপ পাওয়া যায়, এবং সেটা দেখে, ভাষা না জেনেও লিপি এক বলে ঘুরে ঘুরে সবরকম দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখা যায়। হাঁটা ছাড়াও কখনো ট্রাম কখনো বাস। সেটাও শক্ত নয়, কেননা ম্যাপে ওই রুটগুলোও নম্বর দিয়ে বলা থাকে। বাস-ট্রাম পাল্টে স্বচ্ছন্দে বেড়ানো যায়। ট্যাক্সি করি না এমন নয়—কিন্তু সেটা মাঝে মধ্যে নিতান্তই সময় বাঁচানোর জন্য, বা ফেরার সময় যখন সারা শরীরটা ভীষণভাবে ক্লান্ত। আক্রার ম্যাপ হাতে পাইনি—তবে ম্যাপ ছাড়া হাঁটাটাও কম আনন্দের নয়। হোটেলের ঠিকানার কার্ড এবং কিছু টাকা থাকলেই চলবে—হারিয়ে গেলে ট্যাক্সি তো আছেই।

একটা শহরে কি দেখবার থাকতে পারে ? সব দেশের ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টই দ্রষ্টব্য জিনিষের

একটা তালিকা করে দেন। এর মধ্যে থাকে চার্চ -মসজিদ-মন্দির—এখানেও কিছু কিছু দেখলাম। রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ—দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয়—কেন্দ্র থেকে একটু বাইরে, উঁচু জায়গার ওপরে, লেগোনে, আমি ইতিমধ্যেই দেখেছি। শহরের কেন্দ্র, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ধরে হাঁটলাম। বন্দর দেখলাম, সমুদ্র দেখলাম। দোকানপাট চোখে পড়লো—ব্যাস আর কি?

আরতি যা দেখে তাতেই আসানসোলের কথা মনে হয়। ওই বাড়ীগুলো—রেলওয়ে কোয়ার্টারের মতো। ওই রাস্তা যেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ওই উঁচু জায়গাটা যেন কালাপাহাড়ি।

আমি বললাম, "এরপর তুমি বলবে আক্রা শহরটাই আসানসোলের মতো।"

আরতি অম্লান বদনে বলে, "সেটাও বলতে পারো।"

এই রকম আসানসোল-প্রেমিক পৃথিবীতে কজন আছে জানি না। যতোই বলি আক্রায় এয়ারপোর্ট আছে, বড় ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেল আছে, সব দেশের দূতাবাস আছে, যার একটাও আসানসোলে নেই, আরতি তবু সেই মন্তব্যের মূল্য দেবে না। ওর বক্তব্য আসানসোলের রেলওয়ে জংশনের ধারে কাছে আসবার মতো ট্রেণ ব্যবস্থা যখন এখানে নেই তখন আসানসোলই বড়। আসানসোলের এক লক্ষেব কাছে আক্রার আট লক্ষ কিছুই না।

দীর্ঘদিন আরতির মগজ-ধোলাইর পর এখন আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো বা সত্যি সত্যি আসানসোল কোলকাতার চেয়েও বড়, ওখানে যা দেখবার আছে তার সিকি অংশ কোলকাতায় নেই। অকৃতজ্ঞ নয় বলে এটাও স্বীকার করবো যে আসানসোল যখন প্রথম এক লক্ষের সীমা পার হয়ে 'সিটি' আখ্যা পেল সেবার খবরটা শুনে আরতি প্রচুর ভালো জিনিষ এক সপ্তাহ ধরে আমাকে রান্না করে খাইয়েছে।

আক্রা আসানসোলের চেয়ে বড় হলেও, সত্যি সত্যি বড় শহরের মেজাজ ওখানে নেই। ডাকার তুলনায় ছোট হলেও যেন বেশী চোখে পড়ে। লেগোসের সঙ্গে তো তুলনাই হতে পারে না। একটা শহরে যা যা দেখবার দেখলাম। কর্মব্যস্ত কেন্দ্র থেকে নিমা বস্তী অঞ্চল পর্যন্ত। এমনকি পুরনো ইউরোপীয় আস্তানা 'রীজে'ও গেলাম। তারপর, আর কি?

এরপরই আমাদের আসল ভ্রমণ শুরু হলো। আমরা এখানে এক আধখোলা ছাদ সিনেমা হলে এক জঘণ্য হিন্দী সিনেমা দেখলাম। প্রশ্ন থেকে গেল ছাদটা খোলা কেন? ওরা বৃষ্টির সময় কি করে? না কোন বিশেষ কারণ রয়েছে যা ধরতে পারছি না। তবু বলতে লজ্জা নেই, ঘানার মানুষ ভারতীয় ভাষার সিনেমা দলে দলে দেখছে, সেই ছবি যতো খারাপই হোক, এই দৃশ্য দেখেও মনটা ভরে গেল।

তার থেকেও ভালো লাগলো বাজারে। যারা নতুন কোনো দেশে গিয়ে প্রথমেই বাজারের দিকে ছোটে তাদের আমি দেখতে পারি না। ওদের দেখে মনে হয় যেন ওটাই আসল লক্ষ্য—স্যুভেনির বা অন্য জিনিষপত্রই যেন দেশটাকে ওদের মনে চিনিয়ে রাখবে। দেশটা না দেখলেও চলবে। তবু এটাও ঠিক, কিছু কিনুন না কিনুন, বাজারও দেখবার মতো জায়গা। একটা জায়গার মানুষ কি তৈরী করে, খায়, পরে, বা অন্যভাবে ব্যবহার করে সেটা জানবার এক ভালো জায়গা বাজার। মাঝে মাঝে অদ্ভুত জিনিষও চোখে পড়ে। যেমন, ডাকারের বাজারে চীনের থেকে আনা মূল পণ্য হলো—টয়লেট পেপার। প্রশ্ন মনে আসে—কেন আর কিছু নয়? কেন ওই জিনিষটাই বা ওরা ফ্রান্স থেকে আনলো না? কেনই বা চাইনিজরা ঠিক করলো এই বস্তুটিই পশ্চিম আফ্রিকায় রপ্তানী করতে হবে?

আরতির শেষ পর্যন্ত চোখে পড়লো মেয়েদের। বাজারটা বলা যায় ওরাই চালায়। সব রকমের শব্জী, আনাজ, ফল থেকে মনিহারী নানা জিনিষ বিক্রীর দায়িত্বটা ওদেরই হাতে। ওদের ভাবস্বভাব দেখে বোঝা যায় যুগযুগ ধরে এখানকার মেয়েরা এটা করতে অভ্যস্ত। যেমন পশ্চিম

আফ্রিকার অন্যত্র তেমনি এখানেও মেয়েদের পিঠে বাঁধা বাচ্চাগুলোও কম দেখবার নয়। ওদের খালি পাগুলো পিঠের দুপাশে বেরিয়ে থাকে, মায়ের মাথার পাশ দিয়ে দুটো চোখ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীটা ওরা গেলে। ওরা একদম কাঁদে না—এতগুলো বাচ্চা, কিন্তু কান্না একবারও শুনলাম না। বরং ওদের মুখে চোখে পরিতৃপ্তি এবং নিশ্চয়তা। মেয়েরা ওদের পিঠে নিয়েই ছুটে বেড়ায়, হাজার রকম কাজ করে। দরদামের ব্যাপারে এরা দারুন দজ্জাল। কিন্তু দরদামের পর জিনিষটা হাতে তুলে দিতে গিয়ে একগাল মিষ্টি হাসি। টাকা পয়সা পেটের কাছে থলিতে রাখে—সেখান থেকে বের করে দেয়।

আরতি অবাক হয়ে দেখলো। টুলটুলে বাচ্চাগুলোর মতোই প্রায় বড়ো বড়ো চোখ করে। পরে বললো, "দেখেছো মেয়েগুলো কেমন স্মার্ট?"

আমি হাসলাম, "সেটাই তো বললাম তোমাকে। মেয়েরাই এখানকার আসল দেখার জিনিষ।"

পরদিন সকালে নিকোই হোটেলে এলো। আমরা চা খেলাম একসঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আমাকে একপাশে একা ফেলে ওদের দুজনের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। সেই আলোচনায় আমাকে ওরা ঢুকতে দিতে নারাজ। আরতির মুখ উজ্জ্বল।

আমি জিগেস করি বাংলায়, যাতে নিকোই না বোঝে, "কি হলো তোমার, এতো খুশী খুশী কেন।"

আরতি বললো, "যদি পরজন্ম মানতাম তা হলে চাইতাম যেন পরের জন্মে ঘানায় জন্মাই। তুমি জানো, এখানে মেয়েরা আলাদা জমি পায়, ওদের নানা অধিকার আছে, বাড়ীতে সবকিছু ওদের কথায় চলে! টাকার হিসেব ওরা নিজেরা রাখে, ব্যবসাপত্তর ওরাই চালায়। তারপর এখানে ছেলেরাই মেয়েদের পণ দেয়। সেটাই তো ঠিক। ফালতু একটা কাজের মেয়ে বিয়ে করে পুরুষরা পাবে, তার উপর টাকাও পাবে? পাওয়া তো উচিত মেয়েদের। এটাই ভালো নিয়ম। জানতে এসব?"

আমি বললাম, "তাই নাকি? তবে তো খুব সুবিধের ব্যাপার। চলো না, ভারতেই কোথাও জমি কিনি। তুমি চাষ করবে, রান্না করবে, বাজারে গিয়ে যা উদ্বৃত্ত বিক্রী করবে, আর আমি পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবো।"

পরে যখন ওরা দুজন আমাকে অনুমতি দিলো ওদের সঙ্গে এক আসরে আলোচনায় ঢুকতে তখন নিকোই বললো, ওদের এই অধিকারগুলো কমছে। দুটো কারণে। এক, জমি যতো পণ্য তৈরীর কাজে লাগছে ততো এই অধিকারগুলো স্বামী দখল করে নিচ্ছে। মেয়েদের অধিকার মূলতঃ খাবার তৈরীর জমিতে, খাবার না তৈরী হলেই নিয়ন্ত্রণ স্বামীর হাতে। তারপর যেখানে যেখানে যন্ত্র আসছে সেখানেও পুরুষরাই ওই যন্ত্র চালায়। যে সব অঞ্চলে সেটসির ঝামেলা কম, হালের বলদ চালু হয়েছে, সেখানেও জমির অধিকার থেকে মেয়েদের হঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। মজুর বসানো মানেও মেয়েদের সরিয়ে দেয়া। এই প্রবণতা পৃথিবীর অন্যত্রও আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায়, এক সময় একটা সামাজিক নিয়ম ছিল যে ধানের ফসল কাটার সময় গ্রামের মেয়েরা যে কেউ কাজে ঢুকে যেতে পারে, এবং ফসল যা কাটবে তার প্রতি দশ আঁটির এক আঁটি মেয়েরা পাবে। এখন ওই কাজটা বাইরে থেকে চুক্তি করে আনা পুরুষ শ্রমিকদের দিয়ে করানো হয়—ওই সামাজিক অধিকার আর নেই। এর ফলে দুস্থ, সম্বলহীন মেয়েদের পেট চালানো এক সমস্যা। তারপর ওখানেও প্রযুক্তিবিদ্যা বা বিজ্ঞানের উন্নতি মানেই মেয়েদের কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া। ইন্দোনেশিয়ায় ওরা ফসল কাটে 'আনি আনি' বলে এক ধরনের ছুরি দিয়ে। আনি-আনির বদলে কাস্তে এলেই মেয়েরা বাদ, ভারী

যত্ন না এলেও।

"দ্বিতীয় কারণটা কি?" আরতি জিগেস করে।

"সেটা হলো সামাজিক মালিকানা যেখানে উঠে গিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার দলিল দেয়া হচ্ছে। ওই দলিল পাচ্ছে স্বামী—বৌয়ের কোন অধিকার থাকছে না। যে সব আফ্রিকার দেশে জমি সমবায়কে দেয়া হচ্ছে সেখানেও স্বামীদের সমবায়ের সদস্য করা হচ্ছে। নিঃসঙ্গ, অবিবাহিত, স্বামীহারা বা ডিভোর্সড না হলে মেয়েরা কোন অধিকার পাচ্ছে না।"

"তার মানে সমাজ যতো আধুনিক হচ্ছে ততো মেয়েদের অধিকার কমছে?" আরতির কণ্ঠে উষ্মা।

"ব্যাপারটা সেই রকমেরই", নিকোই বলে।

আমি বলি, "তোমরা দুজন অনুমতি দিলে আমি একটু বলি। আমাদের দেশের কোথাও কোথাও তুমি দেখবে এই রকম ঘটছে। গ্রামে ধান কাটে ভূমিহীন পরিবারের মেয়েরা, বিধবারা। এখন গ্রামে গ্রামে যতো হাস্কিং মিল ছড়িয়ে পড়ছে ততো মেয়েদের ওই রোজগারের পথটা থাকছে না। ওরা উৎখাৎ হচ্ছে। তারপর গ্রামীন শিল্প। তুমি দেখবে কাজের বড় অংশটাই করে মেয়েরা—পুরুষরা হয়তো বিক্রী করে জিনিষটা। এখন শহরের জিনিষ যতো গ্রামে ঢুকছে ততো গ্রামীণ শিল্প ভাঙ্গছে, মেয়েদেরও কাজ কমছে। শহর যতো বাড়ছে ততো প্রবণতা হচ্ছে মেয়েদের অর্থকরী কাজ থেকে সরে যাবার। তোমার আমার চোখে পড়ে কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো ট্রামে বাসের চাকুরীজীবি মেয়েদের—কিন্তু মোট মেয়েদের সংখ্যার অনুপাতে এরা শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগের মতো। তারপর আর একটা প্রবণতা হচ্ছে, যতো দিন যাচ্ছে ভূমিহীন পরিবার বাড়ছে। তোমরা দেখবে পরিবার ভূমিহীন হলে মেয়েদের কাজে ঢোকার অসুবিধে বাড়ে। মেয়েরা বাচ্চা সামলায়, বুড়োদের যত্ন করে, বাড়ীর কাজ করে, তারপর মাঠে যায়—সেটা তো অন্য লোকের জমিতে সময় মিলিয়ে করতে পারবে না। তোমার যদি জমি না থাকে, তুমি যদি মজুর হও, তাহলে তো মালিকই তোমার সময় বেঁধে দেবে। সেই সময় মেনে কাজ করলে বাচ্চা কে দেখবে? ঘর কে সামলাবে? এই এক বড় সমস্যা।"

আরও একটা বড় প্রশ্ন ওরা দুজনই তুললো। সেটা হলো স্বীকৃতির। মেয়েরা যা করে তার স্বীকৃতি পায় না। স্বামীরা চেষ্টা করে মেয়েদের কাজের ক্ষেত্রে অবদান কমিয়ে দেখাতে। চাকরী না করলেও, মাঠে না গেলেও ওদের যে আরো পঞ্চাশ রকম কাজ করতে হয় ঘরের মধ্যেই সেটা যেন পুরুষরা দেখেও দেখে না। প্রায় সব সমাজেই যোগ্য মেয়েকে দাঁড়াতে হলে তুলনীয় পুরুষের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশী যোগ্য হতে হবে।

আমার বাবা যতোদিন বেঁচে ছিলেন মা ছিলেন নেপথ্যে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বাবা থাকতেন দশ গজ সামনে, মা ঘোমটা টেনে পিছনে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর আমরা বুঝে উঠবার আগেই দেখলাম সংসারের নিয়ন্ত্রণ মায়ের হাতে। বাজারের হিসেব রাখা, স্কুল-কলেজের ফী পাঠানো থেকে, দুধ-রেশনের ব্যবস্থা, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে চিঠি লিখে যোগাযোগ—সবই মা করতেন। এবং জীবনের প্রথম আটান্ন বছর যা করেননি, পরের পনেরো বছর তাই করলেন—একা একা বাসে-ট্রামে ঘুরলেন। যোগ্যতা ছিল, দক্ষতা ছিল—সুযোগ এলো বড্ড দেরীতে। আমি মাকে বলতাম, "তুমি বিলেতে জন্মালে স্কার্ট পরে এক বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ভালো ম্যানেজ্রেস হিসেবে চালাতে পারতে।" স্কার্ট পরা মা—মা তো হেসেই খুন, "তুই যে কি পাগোলের মত বলিস।"

আমার বন্ধু ডঃ রামগোপাল আগরওয়ালা, এখন বিশ্বব্যাঙ্কের কাজে ওয়াশিংটনে, ষাটের দশকের দ্বিতীয় ভাগে লণ্ডনে। ওর সঙ্গে রাজনৈতিক-দার্শনিক মত মেলেনা, তবু বন্ধু।

রামগোপাল চিরকালের ভালো ছাত্র, রক্ষণশীল মাড়োয়ারী পরিবারের সন্তান, ম্যাঞ্চেষ্টারে পি-এইচ-ডি করে লণ্ডনে এলো 'এগ মার্কেটিং বোর্ডে' ভালো চাকরী নিয়ে। সেই খবর শুনে আত্মীয়রা অনেকে কেঁদে আকুল—মাড়োয়ারীর ছেলে কিনা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আণ্ডা বেচছে! রামগোপাল ওদেব বোঝাতে পারে না যে ওর কাজ পরিসংখ্যানের, বিশ্লেষণের, মাথায় ঝাঁকা নিয়ে ওকে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে হয় না।

রামগোপালের বৌ বিমলাকে আমি ব্রিজ খেলা শেখালাম। তারপর আমরা চারজন একসঙ্গে খেলি—বলা নিষ্প্রয়োজন চা-সহযোগে। মহিলারা একদিকে, পুরুষরা আরেক দিকে। রামগোপাল ফিসফিস করে জনান্তিকে বলে, "মেয়েদের জিতিয়ে দিই, কি বলুন। খাওয়াটা ভালো পাওয়া যাবে।" সেই মতো আমরা খেলি, শেষদিকে ইচ্ছে করে ভুল ডেকে হারি। এই রকম কয়েক সপ্তাহ গেল।

তারপর একদিন আমি আর রামগোপাল আবিষ্কার করলাম, না ইচ্ছে করলেও আমরা হারতে শুরু করেছি। আমরা ঠিক মতো ডাক দিলেও ভালো করে খেললেও আরতি-বিমলা জুটি জিতছে। রামগোপালকে জনান্তিকে জিগেস করি, "কি হচ্ছে?"

রামগোপাল আমাকে সংখ্যাতত্ত্বের 'নরমাল কার্ভ' বোঝায়। একটা জনসংখ্যার গড় বয়স যদি হয় বত্রিশ, তার মধ্যে অনেকেই থাকবে পাঁচের কম বা পঞ্চাশের বেশী। কিন্তু পাঁচের কম বা পঞ্চাশের বেশী হওয়ার যা সম্ভাবনা তার থেকে বত্রিশের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই নরমাল কার্ভের মাঝখানটা মোটা, দু পাশে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর লেজ—যেখানে গড় থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। তবু এটা হতেই পাবে যে অল্প দু-চারজন লোককে জিগেস কবলে হয়তো দেখবেন তাদের বয়স পঞ্চাশের বেশী। কিন্তু যতো বেশী লোককে জিগেস করবেন ততো সম্ভাবনা থাকবে বত্রিশের কাছে যাবার—লেজ ছেড়ে ধড়ের দিকে রওনা হবার। এই হলো নরমাল কার্ভের তত্ত্ব।

রামগোপাল বলে, "এই হারটা হলো নরমাল কার্ভের লেজ। আমরা যতো খেলবো ততো ধড়ের দিকে যাবো—শত হলেও আমরা দুজন পুরুষ, ওরা মহিলা। আমরা পি-এইচ-ডি। ওরা কেন পারবে আমাদের সঙ্গে?"

কিন্তু যতো খেলা চলে ততো যেন লেজ ধরে আমরা নেমেই চলি। অথবা হয়তো আমাদের জেতাটাই লেজ, ওদের জেতাটাই আসল—ধড়। এবং আমরা সত্যি সত্যিই নরমাল কার্ভের গড়ের দিকে ছুটছি। প্রতিদিন খেলার শেষে দুই মহিলার উল্লাস বেড়েই চলে, সঙ্গে প্রচুর খাওয়া। আর আমাদের দুজনের মধ্যে ডাক নিয়ে খেলা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান।

শেষ অবধি রামগোপাল কবুল করলো, "পরিসংখ্যান মানলে, নরমাল কার্ভ ঠিক হলে, আমাদের মেনে নিতেই হবে ওদের বুদ্ধি আমাদের থেকে বেশী।" রামগোপালকে বেশ বিষণ্ণ মনে হলো সেদিন, বিশেষ করে ওদের বাঁধন ছাড়া উল্লাস দেখে।

বিচারটা বুদ্ধির হতেও পারে নাও পারে। টিমওয়ার্ক একটা দিক। বিমলা-আরতি বোঝাপড়া অনেক ভালো ছিল নিঃসন্দেহে—আমি আর রামগোপাল দুজনই হয়তো এককভাবে নিজেদের একটু বেশী বুদ্ধিমান মনে করে যৌথভাবে নিজেদেব ডুবিয়েছি। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা--বুদ্ধি নানা ধরনের। পি-এইচ-ডি করা এবং তাসখেলার বুদ্ধি এক না।

ফুটবলের মাঠে ব্রাজিলের পেলে যেভাবে এক পলক দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়ে ঠিক জায়গায় বল পাঠান, সেটা থেকে বোঝা শক্ত নয় কি বিরাট বুদ্ধির তিনি অধিকারী—অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হওয়া তার অসাধ্য ছিল। মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলীর আমি এক বড়ো ভক্ত—ওর সনি লিষ্টনের সঙ্গে প্রথম লড়াই থেকে জর্জ ফোরম্যানকে অষ্টম রাউণ্ডে নক আউট পর্যন্ত সমস্ত খেলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি, তার পরের কয়েকটা অবশ্য দেখিনি। মহম্মদ

আলী প্রজাপতির মতো ভেসে বেড়ায়, মৌমাছির মতো হুল ফোটায়, যেন মুষ্টিযোদ্ধা নয়, নর্তক। প্রতিদ্বন্দ্বীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচে, দু পায়ের ছন্দের সেই বিশেষ নাম 'আলী সাফল' যা অন্যজনকে সম্মোহিত করে রাখে। প্রতিদ্বন্দ্বী ঘুঁষি ছুড়লে ঠিক আধ ইঞ্চির জন্য ফসকায়—আলী মাথাটা সামান্য একদিকে হেলিয়ে দেয়, বা হাত দুপাশে ঝুলিয়ে মুখ না গার্ড করে দেহটাকে ধনুকের মতো পিছন দিকে সামান্য বেঁকিয়ে দেয়। আলী বাঁহাতে জ্যাব করেই নেচে পিছনে চলে আসে—ওকে ছুঁতে কেউ পারে না। সেই আলী, যার নাচে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ, সত্যিকারের নাচের আসরে অপারগ। ব্যাঙের তালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাকি পা ফেলতে পারে না। আলির নাচ তাই বক্সিং-এর রিং-এ, ডান্স ফ্লোরে নয়।

বুদ্ধির বিচার যদিও জটিল, একথা এখন বলতে অসুবিধে নেই যে ছেলে বা মেয়ের বিচারে বুদ্ধির তারতম্য হয় না। তবু সমাজ যেন এক বিরাট জগদ্দল পাথর মেয়েদের বুকের ওপর চাপিয়ে রেখেছে। ঘানায় ভালো লাগে, যেহেতু পাথরটাকে ওরা অনেকখানি নামাতে পেরেছে, সবটা না পারলেও।

এরপর গেলাম কুমাসি। যেতেই হলো। কতোটা আশান্তি রাজাদের ঐতিহ্য দেখতে, কতোটা ডাঃ দাশগুপ্তের খোঁজে বলা শক্ত। ডাঃ দাশগুপ্তকে অবশ্য হাসপাতালে গিয়ে কোয়ার্টারে গিয়েও পেলাম না। কুমাসি সম্বন্ধে ধারনা খানিকটা হলো। হাসপাতাল শহরের মাঝখানে। তাই ডাক্তারকে খুঁজতে গিয়ে ওখানকার পুরনো বৃটিশ দুর্গ দেখলাম, যেখানে এখন একটা মিউজিয়াম করা হয়েছে। তার পাশেই এক সময় ছিল আশান্তি রাজাদের প্রাসাদ, যার মধ্যে আশমান থেকে পাওয়া সোনার টুল সিংহের চামড়ায় ঢেকে রাজারা বসতেন। কুমাসি এখনও এক সুন্দর শহর—রাস্তা, বাড়ী, বাগান সব মিলিয়ে। আমার বরং আক্রার থেকে কুমাসিই ভালো লাগলো।

এর আগেই কজোর কাছ থেকে জেনেছি, নামটা 'কুম' গাছ থেকে। সেই গাছ এইখানে নিশ্চয়ই আগে অনেক ছিল। কুমাসি বলা যায় জঙ্গলের মধ্যেই। জঙ্গল কেটে এই শহরের পত্তন—অঞ্চলটা হাজার ফিট উঁচু মালভূমির ওপর। সেই জঙ্গল সাফ করে কোকোর বাগানও হয়েছে, যা আগেই দেখা। সাম্প্রতিক কালে কোকোর তালে তালে গড়ে উঠেছে—কুমাসি পৃথিবীর কোকো রাজধানী।

কুমাসি বড় হবার আর একটা কারণ অবস্থান—যে কারণে ইবাদান বড় হয়েছে। কুমাসির উত্তরে ঘাসের বন, দক্ষিণে জঙ্গল। এই শহর যেন দুটো জীবনধারার সন্ধিস্থলে। উত্তর থেকে দক্ষিণ বাণিজ্যের এক বড় কেন্দ্র কুমাসি। ঘাসের বনের জীবন এখন শীর্ণ, মানুষ কম, কাজ কম। প্রচুর মানুষ এখন উত্তর থেকে দক্ষিণে যায় কুমাসি হয়ে কাজের খোঁজে।

সাম্প্রতিক কালে পুরনো ঘানা সাম্রাজ্যের থেকেও বেশী নামডাক আশান্তি রাজাদের। ওরাও আকান গোষ্ঠী। এক সময় দক্ষিণ ঘানার পুরো অঞ্চলটাই ছিল ওদের নিয়ন্ত্রণে। বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সিকিভাগ থেকে দুশো বছর। তখন উপকূলে বৃটিশদের আধিপত্য। পর্তুগীজদের তৈরী এলমিনা দুর্গ ওদের হাতে, ডাচেরাও চলে গিয়েছে। বৃটিশদের সঙ্গে আশান্তিদের সম্পর্কের সূত্র ছিল দাসব্যবসা। দুর্ধর্ষ আশান্তি রাজারা ওদের দাস যোগান দিতো, বদলে পেতো বন্দুক, ভালো জামাকাপড়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ওদের দুপক্ষের মধ্যে খটাখটি শুরু—একবার, ১৮২৪ সালে ওরা বৃটিশদের যুদ্ধে হারিয়েও ছিলো। কিন্তু শেষ অবধি ১৮৭৪ সালে ওরা বৃটিশদের কাছে হেরে গেল। সেই যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যের এক বড় অংশ ছিল ভারতীয়। আশান্তিরা সন্ধি করলো, কিন্তু সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল। ১৯০২ সাল থেকে

আনুষ্ঠানিকভাবে আশান্তি অঞ্চল বৃটিশ উপনিবেশ হয়ে গেল।

আশান্তিবা কোন সংজ্ঞাতেই আদর্শ বাজা ছিল না। ওদেব দাসব্যবসায় অংশগ্রহণ নিশ্চয়ই এক বড কলঙ্ক। প্রতিবেশী বাজ্যগুলো ওদেব ভয কবতো, যেহেতু ওরা ছিল নির্মম, দুর্ধর্ষ। তবু, উপকূলে বৃটিশ আধিপত্যেব পাল্টা একটু কিছু ওবা এখানে তৈবী কবতে পেবেছিল, ওদের একবাব হাবিযেও দিযেছিল, সেটা মনে কবে এখানে এসে ভালো লাগে।

॥ আট ॥

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'লার্জার দ্যান লাইফ'। জীবনের থেকে বড়। ঘানার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান কোয়ামি নক্রুমা সম্বন্ধে ওই কথাটা পুরোপুরি খাটে। বরং যোগ করে বলা যায়, নক্রুমা ঘানার থেকে বড়। নক্রুমা আফ্রিকা। ঘানায় যাবার এক বড় আকর্ষণ ছিল ওই মানুষটা।

আমি ঘানা যাবার আট বছর আগেই নক্রুমাব পতন হয়েছে। দুবছর আগে, গিনীতে নির্বাসিত তেষট্টি বছরের প্রাণবন্ত মানুষটার মৃত্যু হয়েছে। ওই ছয়টা বছর ছিল নক্রুমার জীবনের এক বিশেষ যুগ, যখন সীমান্ত পার হয়ে দূরের দক্ষিণের নিজের দেশটার কথা ভেবেছেন, যেখানে ফিরবার উপায় তার ছিলনা। কিন্তু শুধু ঘানা নিয়ে ভাবেননি, ভেবেছেন গোটা আফ্রিকা নিয়ে, একটার পর একটা বই লিখেছেন। রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে গেলে, অবসর নিলে বা গদীচ্যুত হলে মানুষ যেন বাতাসে হারিয়ে যায়। আয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খানের শেষ দিনগুলো নিয়ে কার মাথাব্যথা ? দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইরানের শাহ্ স্বর্ণখচিত ময়ূর সিংহাসন হারিয়ে আমাদের মন থেকেও হারিয়ে গেলেন। উগাণ্ডার ইদি আমিন এখন কোথায় ? কিন্তু নক্রুমা আমাদের ভুলতে দিলেন না। গিনীর গুনমুগ্ধ রাষ্ট্রপতি সেকোতুরে ওকে সম্মান দিয়ে গিনীর সহযোগী-রাষ্ট্রপতিব মর্যাদা দিলেন—এই আনুষ্ঠানিক সম্মানটাও কোন নির্বাসিত প্রাক্তন বাষ্ট্রপ্রধান কোথাও পাননি। ওই ছটা বছর নক্রুমা ঘাড় গুঁজে বসে পড়াশুনা করেছেন, আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছেন, একটার পর একটা বই লিখেছেন। সেই বইয়ের মূলকথা আফ্রিকার ঐক্য, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা এবং নতুন ঔপনিবেশিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে জেহাদ। ঘানাকে তিনি আফ্রিকার অংশ হিসেবেই দেখেছেন, আলাদা করে নয়।

এক মধ্যবিত্ত স্বর্ণকার পরিবারের সন্তান, নক্রুমা কখনো রাজনীতি করবেন বলে ভাবেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গিয়ে ওখানকার কালো-আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। জানলেন ওরাও পশ্চিম আফ্রিকার সন্তান—মাঝে সমুদ্র আর কয়েকটা যুগ। ওদের বেদনা আর সাম্রাজ্যবাদী শাসনে পিষ্ট পশ্চিম আফ্রিকার মানুষের বেদনা এক হয়ে গেল ওঁর মনে। পর্তুগীজ তৈরী দুর্গ ফোর্ট আলমিনা, গোল্ডকোষ্টের উপকূলে তখন বৃটিশ দখলে, দাসব্যবসার পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনলো। নক্রুমা ইতিহাস পড়লেন, মার্কসবাদ পড়লেন। কৃষ্ণচেতনা আর সমাজতান্ত্রিক চেতনার দুই স্রোত এক জাতীয়তাবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী মহাসমুদ্রে এসে মিশলো।

মার্কিনবাস শেষ করে ৩৬ বছর বয়সে পড়তে এলেন লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্-এ। কেনিয়ার কেনিয়াট্টাও যেখানকার ছাত্র ছিলেন। দু বছর পর প্রকাশ হলো—টুয়ার্ডস কলোনিয়াল ফ্রিডম। ওই প্রথম বই, যা নক্রুমার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিলো। আফ্রিকার কথা, ওখানকার মানুষের কথা, স্বাধীনতার কথা, এর আগে এত স্পষ্ট করে কেউ লেখেনি। ওঁর বই পৌছল আক্রায়—সেখানকার নেতারা চাইলেন নক্রুমা দেশে ফিরুন, ওদের নেতা হোন। নক্রুমা সেই অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

দীর্ঘদিন বিদেশ বাসের পর দেশে ফিরে ১৯৪৮ সালে প্রকাশ করলেন এক সান্ধ্য দৈনিক। পরের বছর তৈরী হলো কনভেনশন পিপল্‌স পার্টি—যারা স্বাধীনতার ডাক দিলো। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো নক্রুমারও জেল হলো। জেলে যাওয়া যেন একটা স্বীকৃতি—এর ফলে নক্রুমার জনপ্রিয়তা বাড়লো বই কমলো না। বৃটিশরা যখন খানিকটা স্বায়ত্ব শাসন দিয়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যেই ১৯৫২ সালে সংসদীয় নির্বাচন করলো, তখন নক্রুমার দলই জিতলো এবং পরাধীন অবস্থাতেই উনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে যখন ঘানা স্বাধীন হলো নক্রুমাই হলেন স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার। ১৯৬০ সাল থেকে রাষ্ট্রপতি—যখন প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলো।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৬—এই নয়টা বছর ঘানার সর্বোচ্চ দায়িত্বে থাকলেন নক্রুমা। শুধু ঘানা নয়। নামকরণের মধ্য দিয়েই প্রথম পরীক্ষা। নাম কতো কিছু হতে পারতো গোল্ডকোষ্ট, টোগোল্যাণ্ড। আশান্তি সাম্রাজ্যের নামেও নামকরণ হতে পারতো। কিন্তু আশান্তি, গোল্ডকোষ্ট বা অন্য কিছু নয়, নাম হলো ঘানা। এই নাম ভুল, কেননা পুরনো ঘানা সাম্রাজ্য ছিল অনেক উত্তরের জঙ্গল পার হয়ে সাহারা সংলগ্ন ঘাসের বনে—ওই দেশের সীমারেখার মধ্যেই না। তবু কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম হলো ঘানা। এখানে ভূগোলেব থেকে বড় হলো ইতিহাস। এই নতন রাষ্ট্র যেন পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত ওই সাম্রাজ্যেরই সার্থক উত্তরসূরী। ঘানার স্বাধীনতা আর নামকরণের মধ্য দিয়ে যেন কৃষ্ণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ঘটলো। নক্রুমা উদ্যোগ নিলেন ১৯৬৩ সালে আফ্রিকার দেশগুলোকে নিয়ে এক নতুন সংগঠন তৈরীর—নাম হলো অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি, কেন্দ্র হলো ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায়। নক্রুমা দাবী করলেন, সমস্ত আফ্রিকা থেকে ইউরোপীয় শক্তিদের তল্পী গোটাতে হবে। আফ্রিকার স্বাধীনতা চাই। ঘানায় যে প্রক্রিয়ার শুরু তার সফল সমাপ্তিই ছিল নক্রুমার লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশেব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের কাছে আক্রাই হয়ে উঠলো তীর্থক্ষেত্র। শুধু আফ্রিকা নয়, মার্কিনী মহাকাশের কালো নেতারাও এখানে এলেন। এলেন দুবোয়, এলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ প্যাডমোর। ১৯৬১ সালে নক্রুমা গেলেন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে—নতুন বন্ধুত্বের সন্ধানে—যদিও বৃটিশ বা আমেরিকান রাষ্ট্রনেতারা এর ফলে খুশী হলেন না।

পরের নয়টা বছর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। একটার পর একটা আফ্রিকান দেশ ওদের দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গলো। ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত ফরাসী-শাসিত দেশই স্বাধীন হলো। বৃটিশ শাসিত নাইজিরিয়া স্বাধীন হলো ১৯৬০ সালে, সিয়েরা লিওন ১৯৬১ তে, গাম্বিয়া ১৯৬৫ তে। এই সবই হলো নিয়ম করে। বিদেশী শাসকেরা বুঝলো ওদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলবে না। তাই স্বাধীনতা দিয়েও কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হাতের মুঠোর মধ্যেই রাখলো। শোষণ থাকলো, কায়দাটা পাল্টালো। ষাটের দশকের প্রথমে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোও স্বাধীন হলো। উত্তরে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্য শেষ হয়েছে, শুধু উত্তর-পশ্চিমের স্পেন-শাসিত অংশটুকু ছাড়া।

সবাই অবশ্য এই কায়দাটাও মানলোনা। পর্তুগীজরা এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাউ, কেপ-ভার্ট ১৯৭৪ অবধি ছাড়লো না। রোডেশিয়ার বৃটিশরা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দখল রাখলো। দক্ষিণ আফ্রিকা একই থাকলো, সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা বা নামিবিয়া—যেখানে এখনও বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। সবচেয়ে বড় লড়াই হলো কঙ্গোতে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যে হত্যা করে ওখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা আবার হীরক-কোম্পানীগুলোর লেজুড় আফ্রিকানদের হাতে দেয়া হলো।

নক্রুমার ওপরও আঘাত এলো। আঘাতটা এলো কোকো থেকে। কোকো যেমন ঘানার মূল সম্পদ, তেমনিই যেন নগ্ন এ্যাকিলিস গোড়ালি। ঘানা কোকো উৎপাদন করে কিন্তু কেনে বৃটিশ-মার্কিন-সুইস কোম্পানীরা। ওরা তখন যুক্তি করে বিদেশী বাজারে কোকোর দাম ভীষণভাবে ফেলে দিলো। ষাটের দশকের প্রথম দিকেই ঘানার বিদেশী ধার হলো ১২৫ কোটি টাকা। সেই ধাক্কা ঘানার অর্থনীতি সামলাতে পারলো না। অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে গেল।

আর একটা আঘাত এলো দেশের ভিতর থেকে। নক্রুমা চেয়েছিলেন আফ্রিকার সব ধরনের মানুষ এসে ভীড় করুক ঘানায়। সীমান্তের পাশপোর্ট আর ভিসা তিনি বড় করে দেখতে চাননি। কোকোর বাগানের কাজে প্রচুর মানুষ অন্য দেশ থেকে এখানে কাজের জন্য ভীড় করেছে, প্রতি আটজনে একজন ; নক্রুমা ওদের বঞ্চিত করতে চাননি। ওদের এক বড় অংশ এলো আপার ভোল্টা আর টোগোল্যাণ্ডের অনুর্বর অঞ্চল থেকে। ১৯৬০ সালের হিসেবে দেখা গেল ওদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের ঘানাতেই জন্ম। কিন্তু সবাই নক্রুমার মতো দূরদর্শী আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী ছিলো না। তাই অর্থনৈতিক সংকট যতো বাড়লো ততো ওই বাইরে থেকে আসা মানুষগুলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধলো।

নক্রুমা বললেন, লোক এলে ক্ষতি কি ? তখনও লোকসংখ্যা আশী লক্ষের কম। উনি হিসেব করে বললেন, দু কোটি অবধি মানুষ ঘানায় থাকতে পারে। মানুষ বাড়লে জঙ্গল পরিষ্কার হবে, উৎপাদন বাড়বে। অন্যরা ভয় পেলো, ভাবলো শেষপর্যন্ত বাইরের মানুষই না সংখ্যাধিক্য হয়ে যায়। নক্রুমা চাইলেন ঘানাকে সমস্ত আফ্রিকায় ছড়িয়ে দিতে, ওঁর বিরোধীরা চাইলো ঘানাকে পাশপোর্ট-ভিসা জঙ্গল-সাভানা-সমুদ্র দিয়ে সংকুচিত করে রাখতে।

শেষ পর্যন্ত বিরোধীরাই জিতলো। নক্রুমা ভিয়েতনাম গেলেন। তারপর চীনে গেলেন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। সেখানে চৌ-এন-লাইব মুখে শুনলেন উনি আর রাষ্ট্রনেতা নেই—ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর দখলে। সম্মেলনের শেষে গেলেন গিনীতে। নির্বাসনে ছয় বছর কাটাবার পর রুমানিয়ার বুখারেষ্টে চিকিৎসা করতে এসে মারা গেলেন। নক্রুমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন কৃষ্ণ আফ্রিকার একটা যুগ শেষ হলো।

নক্রুমাহীন ঘানা এক থাকলো না। ওই বিরাট ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ঘানা হয়ে উঠলো একটি ছোট্ট অত্যন্ত সাধারণ দেশ—কেউ তাকে নিয়ে আজ তাই বেশী মাথা ঘামায় না। নীতিও ভীষণভাবে পাল্টালো। ঘানা পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছাকাছি চলে এলো। অভিবাসীদের সম্বন্ধে মনোভাব কঠোর হলো। বলা হলো, হীরক ব্যবসায় বিদেশীরা থাকবে না। অন্য ব্যবসার ক্ষেত্রেও এক নির্দিষ্ট মূল্যের নীচে বিক্রী হলে সেই ব্যবসা শুধু ঘানার মানুষের হাতেই থাকবে। ট্যাক্সি অন্য আর কেউ চালাবে না, ত্রিশজন শ্রমিকের নীচে কারখানাও থাকবে স্থানীয়দের হাতে। বিদেশীদের নাম রেজিষ্ট্রি করার ব্যবস্থা হলো।

১৯৬৯ সালে অধ্যাপক বুসিয়া নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী হলেন। বুসিয়া ছিলেন ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক—ওদেরই মনোনীত। নির্বাচিত হবার পর সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে হাতে রাখবার জন্য তিনিও ভীষণভাবে বিদেশীদের আক্রমণের লক্ষ্য করলেন। বলা হলো বিদেশীরা ক্রিমিনাল, বার্গলার, স্মাগলার। নতুন আইন হলো আগের তুলনায় অনেক কড়া, মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে জোর করে সীমান্ত পার করে দেয়া হলো। বেশ কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ীও বাদ গেলেন না। দূরে, গিনী সীমান্তের ওপারে নক্রুমার বুকে এটা অনেক বড় আঘাত হিসেবে এলো। তাঁর ব্যক্তিগত নির্বাসনের চেয়েও অনেক বেশী বড় আঘাত। নক্রুমার ঘানা আর থাকলো না। এমনকি গণতন্ত্রের মুখোসটাও থাকলো না যখন ১৯৭২ সালে আবার সামরিক

বাহিনী বুসিয়াকে সরিয়ে ক্ষমতায় এলো, তৈরী করলো ন্যাশনাল রিডেম্পশন কাউন্সিল। সেই থেকে ঘানা সামরিক তত্ত্বাবধানেই চলছে। প্রতি সামরিক অভ্যুত্থানের পরেই একটা নতুন সার্কেল তৈরী হয়েছে আক্রার রাজপথে, যার নাম এই অভ্যুত্থানের দিন-মাস-বছর ধরে। এই হারে প্রতি ছ-সাত বছর অন্তরই এখানে একটা করে নতুন সার্কেল হবার কথা।

নক্রুমাহীন ঘানা বড্ড ছোট। নক্রুমা কিন্তু মরলো না। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিকে যারা লড়লো তারাও জাতি, ভাষা, বর্ণ, ধর্মের বিভেদ মানলো না। ওদের সঙ্গে সামিল হলো গণতান্ত্রিক পর্তুগীজরা, মুলাতোরো। ওরা জাতীয়তাবাদী গান বানালো, ছবি আঁকলো, যাতে ট্রাইব না বড়ো হয়। শেষ পর্যন্ত সফল হলো। মোজাম্বিকের এডুয়ারডো মণ্ডলেন, গিনি-বিসাউর আমিলকার কাবরাল, এ্যাঙ্গোলার অগাষ্টিন নেটো-এরা তিনজনই চেষ্টা করলেন জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চেতনা মেলাতে, কৃষ্ণচেতনার সঙ্গে সমাজতন্ত্র মেশাতে, যা নক্রুমাও চেয়েছিলেন। এই জীবনের থেকে মানুষটার প্রভাব ওখানে না পড়ে পারলো না।

তবু ওই মানুষটারও অনেকগুলো দুর্বলতা ছিলো। ক্ষমতা মানুষকে নষ্ট করে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে নষ্ট করে—এই সত্য ওঁর ক্ষেত্রেও খানিকটা কাজ করেছে। একনায়কতান্ত্রিক ঝোঁক ছিল, ব্যক্তিগত বিলাসিতার মোহ বড হযেছে কোন কোন সময়। কখনও কখনও পাথরের মতো শক্ত নির্ভরশীল মানুষটার এলো পোষাকের ফাঁক দিয়ে মাটির পা বেরিয়ে না পড়ে পারেনি।

১৯৬৪ সাল। ঘানায় তখন জটিল অর্থনৈতিক সংকট। আমি ছাত্র অবস্থায় লণ্ডনের এক ফুটবল পুল কোম্পানীর কুপন চেক করি শনি রবি। ভালো পয়সা দেয়। ব্যাপারটা মূলতঃ লটারীর মত। লোকেরা কুপনে ভবিষ্যদ্বাণী করে শনিবারের ফুটবল লীগের পঞ্চাশ ষাটটা খেলার ফল কি হবে, জেতা-হারা-ড্রর সম্ভাবনা কি , কে কত গোল দেবে। এরকম লক্ষ লক্ষ কুপন আসে প্রতি সপ্তাহে। বৃটিশরা জুয়াড়ীর জাত—ওরা যে এটা করবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক হলাম যখন দেখলাম ঘানারও হাজার হাজার মানুষ বৃটিশ ফুটবল লীগের খেলায় কি হবে না হবে তা নিয়ে টাকা ধরছে। ওদের কাছে ওই খেলার কি মূল্য ? ওরা কি জানে লিভারপুলের খেলোয়াড়দের নাম, ই-পসউইচ দলের লীগের চ্যাম্পিয়ানশীপের রেকর্ড অথবা গর্ডন ব্যাঙ্কের কেরামতি ? তবু প্রতি হপ্তায় ঘানা থেকে হাজার হাজার কুপন আসে। ওই কুপন পাঠাবার বৈদেশিক মুদ্রার অনুমতি আসে ওখানকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে—তার রাবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ কুপনে স্পষ্ট। কোকোর বাণিজ্য ডুবছে, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বৃটেনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব—তবু ওই কুপন টাকা সহ ইংল্যাণ্ডে আসবে। কারণটা হয়তো সাংস্কৃতিক। নক্রুমা হয়তো ছাত্র অবস্থায় লণ্ডনে এই কুপন পূর্ণ করতেন। নক্রুমার সহযোগীরাও হয়তো করতো। সেই অভ্যাস দেশে ফিরেও ছাড়তে পারেননি। বৃটিশরা দেশ ছাড়লেও, বৃটিশ ফুটবল লীগের খেলার কুপন থেকেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আপত্তি করেনি। ঘানা ডুবলেও এই খেলা বন্ধ হয়নি।

নক্রুমাকে বুঝতে হলে এই দুর্বলতাটাও বুঝতে হবে। দোষগুণ সব নিয়েই তো একটা মানুষ। কিন্তু কোন্‌টা বড় ?

ঘানা থেকে নাইজিরিয়া যাবার পথে প্লেনে আবার সেই ক্লান্তিকর অনমিয়া-যা-য়া-য়া সংগীত।

এবার আর ততোটা ক্লান্তিকর লাগলো না। বরং ওই গানের রেশ ধরে ফিরে গেলাম আক্রার কাছের সেই গ্রামে, যে গ্রাম প্রতি মুহূর্তে পাল্টাচ্ছে। কিছুদিন পর ওখানে আর নগ্নবপু ঘর্মাক্ত

কলেবর বিশাল ঢাকীর হাতের বোল শুনতে কেউ যাবে না, গেলেও সেই আওয়াজ ছাপিয়ে কানে আসবে ইলেকট্রনিক জলসা। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো মাথার খুলি সরিয়ে বসবে সুদৃশ্য মডার্ণ অয়েল পেইন্টিং। আকোশোম্বোর উজ্জ্বল বিদ্যুতের ছটায় পূর্বপুরুষের উপস্থিতি ক্ষীণতর হবে। সাহেলের রুক্ষ অনিশ্চয়তা এড়িয়ে ঘাসের বন ভেঙ্গে আরো হাজারে হাজারে মানুষ জঙ্গল আর উপকূলে ভীড় করবে। গ্রাম ভাঙবে, শহর বেড়ে কল্লোলিনী মহানগরী হবে। সনাতন সমাজ, মালিকানা, অর্থনীতি, মূল্যবোধ কোনো কিছু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না।

এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই সপ্তাহে দুবার নিকোইর মনের ছবি পাল্টাবে। চারপাশের আলোড়ন উপেক্ষা করে মিঃ সুব্রম্মনিয়ম পরম নিষ্ঠায় একটা একেবারে না-জানা দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব তৈরী করেই চলবেন। কজোর বিশ্লেষণ আর এ্যাবির বিভ্রান্তিকর রঙ্গ উপেক্ষা করে অসংখ্য সেটসি, ব্ল্যাক ফ্লাই আর গুবরে পোকা ভনভন করে ঘুরে বেড়াবে। কফির বাগান কখনও সোনা ফলাবে, কখনো বিষাক্ত শামুকের যতোই মানুষের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করবার সংকল্পে ব্রতী হবে। সবকিছুর মধ্যেই ভেসে থাকবে ওই জীবনের থেকে বড় মানুষটার প্রতিকৃতি, যাকে ঘানায় গিয়ে দেখিনি, যার নাম ঘানার আগে শুনেছি, যে মানুষটার ভস্ম কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতিটি অণুতে আজ মিশে॥

হোটেল ইন্ডিয়ার মানুষ সমুদ্র

॥ এক ॥

ডাডলী সিযার্স, আমার সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ সহকর্মী, জিগ্যেস করলো, "আবির্জঁ যাবে ?"

"কেন ?"

"হোটেল ইভয়ারে থাকবে।" ডাডলীর উত্তর।

হোটেলে থাকতে বেড়াতে যাওয়া ? সাধারণত উল্টোটাই হয়—বেড়াতে গিয়ে লোকে হোটেল খোঁজে। সে হোটেল যতো ভালোই হোক।

আসল কারণ কি ?

সেটাও ডাডলী বললো। সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (এস-আই-ডি)-র সম্মেলন, আইভরী কোষ্টের রাজধানী আবির্জঁয়। আলোচনার অন্যতম মূল বিষয় : পেট্রোলিয়মের দাম। কয়েক মাস আগেই তেল রপ্তানীকারী দেশগুলো তেলের দাম চার গুণ বাড়িয়েছে। সেই নিয়ে সমস্ত পৃথিবী তোলপাড়। ডাডলী এস-আই-ডির ভাইস-চেয়ারম্যান, তেলের আলোচনায় সভা পরিচালনা করবে। আমার ভূমিকা—আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে, পরে রিপোর্ট তৈরী করে দিতে হবে। রাজী ?

রাজী তো নিশ্চয়ই। বেড়াবার নামে সব সময়ই এক পায়ে খাড়া। কিন্তু হোটেল ইভয়ারে কি আছে ? আমার সহকর্মীদের মধ্যে আফ্রিকাবিদ কম নেই। ওদের জিগ্যেস করি, "হোটেল ইভয়ার কি এমন জিনিস ?"

ওরা বলে, "যাও, নিজেই চোখ দিয়ে দ্যাখো। এমন হোটেল কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সব হোটেলের সেরা সে যে মোদের বিলাসভূমি।"

ওরা যে সত্যি সত্যিই কবিতা করে এরকম বলেছে তা নয়। কিন্তু যা বললো, তা প্রায় কবিতারই মতো। মনে মনে বেশ অবাকই হলাম, হোটেল নিয়ে যে কেউ এমন আহামরি করতে পারে ভাবিই নি।

ডাডলী বলে, "আইভরী কোষ্ট মানেই রাজধানী আবির্জঁ ; আর আবির্জঁ-য় একটাই দেখার জিনিস—হোটেল ইভয়ার। কোন সন্দেহ নেই আইভরী ক্লাশ।"

হোটেল মানে রাত্রিবাসের জায়গা। সারাদিন মিটিং, লোকের সঙ্গে যোগাযোগ। রাত্রে যখন ফিরি তখন শরীর বয়না—কোন রকমে শরীরটাকে টানতে টানতে রিসেপসন থেকে চাবি নিই, লিফটে উঠে, নেমে, চাবি খুলে, জামা কাপড় ছেড়ে পাজামা পরে এলিয়ে পড়ি। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যাওয়া। এই আমার সাধারণভাবে হোটেল জীবন। কোন্ ঘরে থাকলাম, কিভাবে থাকলাম, সে সবই গৌণ। ফার্ণিচার ভাঙা না ঝকঝকে না মডার্ণ না এ্যান্টিক, ল্যাম্পের শেডের রঙ আর দেয়ালের কারুকার্য মিলছে কিনা, কার্পেটে কতোটা পা ডুবলো, অয়েল পেইন্টিং-এর ঘরানা কি, এসব দেখবার না আছে সময় না আগ্রহ। চাই দুটো জিনিস—ভালো পরিষ্কার বিছানা, এবং আরও পরিষ্কার টয়লেট-বাথরুম-টাওয়েল। এই দুটো হলেই মন

পরিতৃপ্ত। আর কিছু চাই না।

এটা অবশ্য আমার কথা। আমার চাওয়াটাই পৃথিবীতে বড় ব্যাপার নয়। আমার মতো লোকদেব দিয়ে হোটেল ব্যবসা চলবে না। হোটেলে থাকাই যাদের জীবন, যারা কম্পিউটার যুগের যাযাবর, সুটকেশ যাদের একমাত্র সম্বল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য জন ম্যাকেনরো বা মাইকেল জ্যাকসনদের দরকার—না হলে টেনিশ টুর্ণামেন্ট বা পপের আসরের পারফরমেন্স ভালো হবে না। তাই দেখতে হবে হোটেলে কি কি আছে, সার্ভিস কেমন, মান কেমন ? হেয়ার ড্রেসার আছে ? ম্যাসাজের ব্যবস্থা ? ডান্স হল কেমন ? ব্যাণ্ড কি ভালো ? ক্লিনিং ? রেস্টুরেন্ট ? বার ? সুইমিং পুল ? হোটেল এদেরই জন্য—যারা সমঝদার, যারা ভালো আর খারাপ সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। যাদের ক্লাশ আছে।

সুইমিং পুল অবশ্য আমিও খুঁজি। সাঁতার ভালো কাটি এমন না। আমার সাঁতার ব্যাকরণ মানে না। গতি নেই, ছন্দ নেই, শুধু তাল-বেতাল হাত পা ছুড়ে, ডুব দিযে, চিৎ হযে এগুনো পেছনো। অশিক্ষিত অমার্জিত সাঁতার, যে কোন সুইমিং পুল, এমন কি বাড়ীর পাশের পচা ডোবারও কলংক। কিন্তু সেসব আমার দেখবার প্রয়োজন নেই—সাঁতার কেটে প্রাইজ পাবো না, কারোকে মুগ্ধ করবো না, কিন্তু আমার-আমার নিজের শরীর আর মন ঠাণ্ডা হবে। হোটেলের সুইমিং পুল সাধারণত থাকে বেসমেন্টে। শীতকালেও গরম করা জল। বাইরে তাপমাত্রা যাই হোক, বরফ পড়ুক, ফ্রস্টের সাদা আবরণে গাড়ীর কাঁচ ঢেকে যাক—হোটেলের বেসমেণ্টের নিরাপত্তায় সেখানে গা খুলে স্নান করা যাবে। টলটলে জলে কুড়ি ফিট নীচের ফ্লোরের সবুজ-নীল-লাল পাথরের স্ল্যাব বা কারুকার্য পরিস্কার দেখা যায়। কোথাও ওপরে খোলা জায়গায়, বাগান ঘেরা টেরেসে সুইমিং পুল—সেখানে সাঁতারের পর চেয়ারে বসে ড্রিঙ্কস খাওয়া এক বড় বিলাসিতা। চারপাশে যারা শুয়ে বসে তাদের হাতে প্রচুর সময়—পৃথিবীর সময়ের কাঁটা যেন থেমে আছে। আলসেমির সবচেয়ে ভালো জায়গা সুইমিং পুল।

একবার যুগোশ্লাভিয়ার আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলের এক বড় ট্যুরিস্ট হোটেলে ছিলাম এক সম্মেলন উপলক্ষে। সেখানকার সুইমিং পুল পনেরো তলার ওপরে ছাদে—এক বিরাট জায়গা নিয়ে। ওখানে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রায়ই ভেবেছি, যদি হঠাৎ ছাদ ফুটো হয়ে যায় ? যদি পুলের সমস্ত জল নীচের ঘরগুলোকে ভাসিয়ে দেয় ! তবে এই আশংকা অমূলক—প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক, সমস্ত রকম সম্ভাব্য দুর্যোগের জন্য জরুরী ব্যবস্থা তৈরী।

'মোটেল' মানে এমন হোটেল যেখানে গাড়ী রাখা যায়। বড় হোটেল, সব রকম ব্যবস্থাই আছে, যেন এক ছোটোখাটো শহর—দোকানপাটে রেস্টুরেন্টে ভর্তি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের সামগ্রিক ব্যবস্থা। জুতো সেলাই না হোক, পালিশের ব্যবস্থা রয়েছে—রাত্রে জুতো খুলে ঘরের বাইরে রেখে দিন, পরের দিন সকালে দরজা খুলে দেখবেন ঝকঝকে পালিশ করা জুতো। এবং চণ্ডীপাঠ না হলেও বিছানার পাশের টেবিলে পিয়রের কাছে বাইবেলের কপি রয়েছে। অনেকে ঘুমুতে যাবার আগে একটু পড়ে নেয়, সারাদিনের অধর্ম কিছুটা লাঘব করে। জামাকাপড় কাচতে চান-ওদের দেয়া ব্যাগে পুরে ঘরেই রেখে দিন—রাত্রে ফিরে এসে দেখবেন কেচে, ইস্ত্রী করে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে। বিছানা নতুন করে সাজানো, বাথরুমে নতুন সাবান-তোয়ালে। টুথব্রাশ গ্লাসের মধ্যে, স্লিপার বিছানার তলায়, পাজামা বালিশের নীচে, যেখানে যেটা থাকবার কথা। যারা এসব করে তাদের হয়তো কোনদিন দেখবেনও না। ওরা যেন অদৃশ্য, অশরীরি, দূর থেকে লক্ষ্য রাখছে। বিছানার সামনের টেবিলে রঙীন টেলিভিশন, সাইড-বোর্ডের রেডিওতে নানা চ্যানেলের গান ও অন্যান্য প্রোগ্রাম। আগের রাত্রেই ব্রেকফাস্টের মেনুকার্ডে টিক দিয়ে বলতে হবে কি কি চাই, কখন চাই—ডিম সেদ্ধ হবে না ফ্রাই

হবে, না আধ সেদ্ধ হবে, না অন্য কিছু। এবং সেই কার্ড ঝুলিয়ে রাখতে হবে দরজার নবে। পরদিন সকালে সেই অনুযায়ী ব্রেকফাস্ট আসবে। সঙ্গে খবরের কাগজ।

এই সব হোটেলে থাকতে নিজের পয়সা লাগে না। যারা থাকে তারা নিজেদের কোম্পানীর নাম করে আসে—বড়লোকরাও। আমার মতো অধ্যাপকরাও থাকে কোন না কোন সম্মেলন বা সভা উপলক্ষে, অন্যদের ব্যবস্থাপনায়। আজকাল 'এক্সপেন্স এ্যাকাউন্ট' কথাটা আমাদের দেশেও চালু হয়েছে। কোম্পানীর এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টেই ব্যক্তিগত খরচ ঢোকানো হয়—মায় মদ এবং নাচের পয়সা, বা খেলাধূলোর খরচ। এই টাকাটাও হাতে করে দেবার দরকার নেই। এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টের আলাদা 'ক্রেডিট কার্ড', বিল যতোই হোক, ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করে হোটেল হিসাবটা রেখে দেবে।

হোটেলের নম্বর আছে তকমা আছে শ্রেণীভেদ আছে। আন্তর্জাতিক হোটেল এ্যাসোসিয়েশন ঠিক করে কার কতোটা তারকা-এক থেকে পাঁচ নম্বর। এক তারকা পাওয়াও কম বড় ব্যাপার নয়, পাঁচ-তারকা হোটেলে তো এলাহী কাণ্ড। কিন্তু সে রকম হোটেলে পৃথিবীর নানা দেশে থেকেও মনে হয় যেন শেষ পর্যন্ত তফাৎটা সামান্যই। হোটেল রুম ছোট বড় হতে পারে, কিন্তু সাজানোর ধরণটা এক হয়ে এসেছে। বাথরুমে সিংক কোথায়, আয়না কোথায়, ইলেকট্রিক রেজর কোথায়, ড্রিংকসের ফ্রিজ কোথায়। জলের গ্লাস কোথায় থাকবে, সেভিংস সেট কোথায় লুকোবে থেকে শুরু করে, সোফা, বসার টেবিল, বিছানার মাথার কাছের অংশটুকু, অনেক কিছুই এখন একটা ছকে সর্বত্র সাজানো হচ্ছে। রিও থেকে টোকিও, নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন, আলজিয়ার্স থেকে আক্রা—এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। তাই পর পর কয়েকদিন হোটেলে হোটেলে কাটালে, দেশে দেশে ঘুরলে, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চারপাশে তাকিয়ে অনেক সময়ই গুলিয়ে যায়—কোথায় আছি ? সেশেল্‌স না সিঙ্গাপুর ? মালাগাসি না ম্যানিলা ? কেননা যেখানেই থাকি না কেন, ভোরবেলার আধ-ঘুমন্ত চোখে সবই এক মনে হয়।

বড় হোটেলে কি নেই ? চাইলেই হলো, ফোন করলেই হলো। কিন্তু কেন জানি না তবু পুরো শান্তি পাই না। এই অভিযোগ অনেকেরই। একটা কারণ, বড় হোটেল যেন বাজারের মতো। রিসেপসনে প্রচুর মানুষের ভিড় লেগেই আছে, যারা কাউন্টারের ওপাশে তাদেরও ডিউটি পাল্টাচ্ছে। কেউ কারোকে চেনে না। প্রত্যেকে নিজের নিজের কক্ষপথে ভ্রাম্যমান। এক একটা মানুষ এবং তার ঘর যেন এক আলাদা জীবন। মাসের পর মাস থাকলেও তুমি ক্ষণিকের অতিথি। এখানে সবকিছুই স্বল্পমেয়াদী।

রোমে যখন যাই, এক মাঝারী ধরনের হোটেলে থাকি। ১৯৮৫ জুন মাসেই পুরো এক মাস থাকলাম, কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। অক্টোবরের প্রথম—অর্থাৎ তিন মাস পরে—আবার গেলাম, ওই হোটেলেই দুই সপ্তাহ থাকলাম। প্রথম দিনই একজন মহিলা কর্মচারী আমাকে বললেন, "কিছুদিন আগেই ৯২ নম্বর ঘরে আপনারই মতো একজন ছিলেন। তিনিও ভারতীয়। কি আশ্চর্য মিল চেহারায় !" সন্দেহ নেই মিল আছে, কারণ ওই মানুষটি আমি স্বয়ং। কিন্তু ওই কর্মচারীর মনেও নেই সেই কথা, শুধু মুখের আদলটুকু খানিকটা স্মরণে আছে। এবং মাঝখানে যে তিনটি মাস কেটে গিয়েছে সেটাও খেয়াল নেই। হোটেল যেন রেলের স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, কতো মানুষ আসে কতো যায়—কে খেয়াল রাখবে ! ছোট হোটেলে বরং বাড়ীতে থাকার আমেজ আছে।

ভেবেও পাই না হোটেল ইন্ডয়ারে কি এমন থাকতে পারে যা আগে অন্য কোন হোটেলে দেখি নি ?

তবু আলোচনার বিষয় ভালো লাগলো। ১৯৭৪ সাল। তেলের দাম নিয়ে বিরাট বিতর্ক শুরু

হয়েছে। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরাবিয়ার মরুভূমিতে কম্যাণ্ডো নামালো বলে। কারো প্রশ্ন—সেক্ষেত্রে সোভিয়েট কি করবে? সৌদিরা কি করবে—ওরা কি সোভিয়েটের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করবে? কারো সন্দেহ সমস্ত ব্যাপারটাই মার্কিনীদের চক্রান্ত, পশ্চিম ইউবোপ আর জাপানের প্রতিযোগীদেব টিট করবার জন্য। প্রশ্ন উঠছে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কতোটা হবে এবং এর ফলে বিশ্বব্যাপী কোন অর্থনৈতিক সংকট আসবে কিনা! তেলের দেশগুলো, যাদেব সংগঠন 'ওপেক', তারা কি করবে এত টাকা দিয়ে? শিল্প করবে? জমাবে? জমালে কোথায় রাখবে সেই টাকা—এবং তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য কি? যে সব দেশের তেল নেই, 'নোপেকরা' কি করবে? ওদের কি হবে? এইসব নানা প্রশ্ন মাথার মধ্যে ততক্ষণে ঘুরতে শুরু করেছে।

আইভরী কোষ্ট যাবার মুখে হোটেল ইভয়ার মনের মধ্যে আর থাকলো না।

॥ দুই ॥

এয়ারপোর্ট থেকে আবিজঁ শহরে যাবার বাসে লিণ্ডার সঙ্গে দেখা। লিণ্ডার সঙ্গে আগের এক সম্মেলনে আলাপ-তখন এক আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থার সঙ্গে ছিল। পশ্চিম আফ্রিকা ওর সড়গড়; ও বললো, "শুনছি, দারুণ সম্মেলন হবে। এমনিই এস-আই-ডি সম্মেলনে ভীড় হয় অনেক। এবার শুনছি দেড় হাজার মানুষ আসছে। যারা আসছে তারা সব বাঘা বাঘা লোক। এ্যাকাডেমিকরা তো আছেই, জার্নালিস্ট, সরকারী কর্মচারী, লেখক, গবেষক থেকে শুরু করে কোম্পানীর লোক, বড় শিল্পপতি সব ধরণের মানুষই আসবে। যা শুনেছি আজ সকালের প্লেনেই অধিকাংশ মানুষ এসে যাবার কথা।"

শুনে একটু ঘাবড়েই গেলাম। এ যেন কুম্ভ মেলা—যেখানে লোক দেখতে আর ভীড় ঠেলে পথ করে নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়াতেই সময় চলে যাবে। বড় হোটেলের মতো বড় বড় সম্মেলনেও আমার আপত্তি। আমার ভালো লাগে পনেরো থেকে ত্রিশ জনের 'ওয়ার্কশপ', যেখানে শুধু একটা বিষয় আলোচনা হবে, সবাই জানবে সেই বিষয়টা, পড়ে আসবে, সবাই সবাইকে জানবে, এবং নানারকম তর্কবিতর্ক কথা-কাটাকাটির মধ্য দিয়ে চিন্তা পরিস্কার হবে। সেই সুযোগ বড় সম্মেলনে নেই—উদ্যোগ আয়োজনই সেখানে বড়।

লিণ্ডাকে আপত্তিটা বলি। লিণ্ডা বলে, "তোমার বক্তব্য ঠিক। কিন্তু এই ধরনের সম্মেলনেরও একটা অন্য রকমের মাহাত্ম্য আছে। ওয়ার্কশপ-টপে যারা যায় তারা তোমারই মতো লোক—পড়ায়, গবেষণা করে, লেখে। কিন্তু তোমাদের 'চার্মড সার্কেলে'র বাইরেও যে একটা জগত আছে, সেখানকার মানুষ যে চিন্তা করে, তাদেরও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে, এবং তাদের কথায় বা চিন্তায় কাজ যে তোমাদের থেকে বেশী এগোয়—এসব জানারও তো একটা প্রয়োজন আছে। এই যে তেলের কোম্পানীর লোকেরা আসবে, ওপেকের লোকেরা আসবে, গরীব দেশের লোক, উন্নত দেশের লোক, সবাই যে যার নিজের মতো কথা বলবে, সেটাও শুনতে কি ভালো লাগবে না?"

"এই ব্যাপারে আমিও একমত," আমি বলি, "ভয়টা এই, যারা আসছে তারা গভীরে না গিয়ে যদি ওপর ওপর কথা বলে বা 'সারমন' দিয়ে চলে যায়, বা নিজের নিজের কথা বলে অন্যদের কথা না শুনে—তবে অবশ্য মনে হবে সময়টা নষ্ট হলো।"

"তোমার তেলের ওপর লেখা বইটা পড়েছি," লিণ্ডা বলে।

শুনে একটু সংকুচিত হই। ১৯৬৬-সালে লেখা, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত, কিন্তু গত কয়েক মাসের ঘটনা প্রবাহে পুরোপুরি 'আউট অফ ডেট'। মনে পড়ছে এম-আই-টির অধ্যাপক মরিস এ্যাডেলম্যানের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী, "সত্তরের দশকে তেলের দাম কমতে কমতে হয়ে দাঁড়াবে 'ব্যারেল পিছু এক ডলার'। সেই ভাবে আমরাও অনেকে ভেবেছি—কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এবং 'ওপেকে'র রাজনীতি ওই ভবিষ্যদ্বাণীকে যেভাবে হেনস্থা করছে তারপর তেল নিয়ে কারো কিছু লেখাই শক্ত।

আমি বলি, "আমি যখন তেল নিয়ে লিখতাম তখন তেল জাতে ওঠে নি। গবেষণা করবার মানুষ ছিল কম। তারপর, গত দু তিন বছর হলো, কৃষি আর গ্রাম নিয়েই আমার গবেষণা। তবু ভালো লাগছে তেলের ব্যাপারটা এই সুযোগে ঝালিয়ে নিতে পারছি বলে। আলোচনার সূত্রপাত করেই আমি খালাস। মূল প্রশ্নগুলো তুলে ধবে চুপ কবে বসে শুধু শুনবো।"

সম্মেলনের গাড়ী রাতের অন্ধকারে ছুটছে। দুপাশে অন্ধকার। দেখবার উপায় নেই, বোঝা যাচ্ছে রাস্তা ভালো—গাড়ীর লাফালাফি বিশেষ নেই।

"আইভরী কোষ্টে আগে এসেছো?" লিণ্ডা জিগ্যেস কবে।

"না। সত্যি বলতে কি, আইভরী কোষ্ট নিয়ে কিছু ভাবিই নি। শুধু ভাবছি তেল, পেপার, সম্মেলন, কি প্রশ্ন উঠবে, আলোচনা কিভাবে চলা উচিত। এই সম্মেলনে যে কোন একটা দেশে হচ্ছে, সেই দেশে যে আমি কখনো যাই নি, এটা ভাবিই নি। সত্যি কি, আমার চিন্তায় আইভরী কোষ্ট কখনও ছিল না। নাম শুনেছি এই যা—বুরুণ্ডি, ক্যামেরুন, চাদ-এই রকমই একটা কিছু হয়তো? কখনো মনে দাগ কাটে নি।" আমি বলি।

"সেটা তোমার বৃটিশ-কেন্দ্রীকতার প্রতিফলন", লিণ্ডা বলে, "তোমবা আফ্রিকার সেইটুকুই জানো যেটুকু বৃটিশ প্রভাবে ছিল, বা যা নিয়ে বৃটিশ কাগজে লেখে। কেনিয়া, ঘানা, নাইজিরিয়া, রোডেশিয়া—এসবই তোমাদের সড়গড়। তোমরা ভেবেও দেখ না, যে আফ্রিকাব বড় অংশটাই ফরাসী-প্রভাবে ছিল। এই মহাদেশেব মানুষ যতোটা ইংবাজী জানে ততোটাই ফরাসী বলে। আইভরী কোষ্ট ফরাসী আফ্রিকার বলে তোমাদের নজর কাড়ে নি।"

লিণ্ডার কথার ভাবটা একটু অন্য রকম। এইভাবে কোন বৃটিশ বলবে না। তাই বলি, "তুমি তো বৃটিশ!"

"তাতে কি হয়েছে?" লিণ্ডা হাসে," কিন্তু আমি তো বৃটিশ এ্যাকাডেমিকদের কথা বলছি—যার মধ্যে তোমরা পড়। তোমরা বরং এই ব্যাপারে আমাদেব থেকেও বেশী বৃটিশ। বলো সত্যি কিনা?"

কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি। তাই কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, "আইভরী কোষ্টে কি দেখার আছে বল তো?" সাধারণত যে কোন কাজে যেখানেই যাই, কয়েকটা দিন রাখি সঙ্গে ঘুববার জন্য, দেশটার জন্য। আইভরী কোষ্ট কখনও সত্যি সত্যি আমার মনকে টানে নি, এই সম্মেলন না হলে আসতামও না কখনো।

লিণ্ডা বলে, "তুমি কি জানো না আইভরী কোষ্ট এখন 'মিরাক্‌ল্ অফ আফ্রিকা' বলে পরিচিত? এখানকার অর্থনীতি তেজী ঘোড়ার মতো জোর কদমে ছুটছে। জাতীয় আয় দারুণভাবে বাড়ছে, বেকারী নেই বললেই চলে, গ্রামে গ্রামে গোলাভরা শস্য, সেই শস্য বিক্রী হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে। প্রতিদিন প্লেন ভর্তি মানুষ আসছে, ফ্রান্স থেকে, নানা কোম্পানীর লোক। ওরা দেশটাকে ওদের মতো করে তৈরী করছে। এত ব্যাপার, তুমি একজন অর্থনীতিবিদ, তুমি খোঁজই রাখো না?"

খোঁচাটা ধরি না। লিণ্ডার কথার পর চিন্তাটা সম্মেলন ছেড়ে, দেশটার দিকে গেল। মনে মনে আফশোস হলো—সত্যিই তো, হাতে কোন সময় রাখি নি ঘুরবার জন্য, দেশটা দেখবার জন্য! তখনও অবশ্য সম্মেলনের প্রোগ্রাম হাতে পাই নি—পরে দেখলাম ঘুরবার বেশ খানিকটা ব্যবস্থা সম্মেলনের কার্যসূচীর মধ্যেই রয়েছে।

লিণ্ডাকে বলি, "আমি স্বীকার করি ফ্রেঞ্চ আফ্রিকাটা আমরা ভালো জানি না। ভাষাটাও এক বড় কারণ। আমাদের দেশের মানদণ্ডে ইংরাজী জানলেই তুমি শিক্ষিত। প্রথম ধাক্কা খেলাম উত্তর আফ্রিকায়, যখন সাধারণ মানুষ আমাকে অশিক্ষিত ধরে নিলো—যেহেতু আমি ফ্রেঞ্চ

জানি না।"

ভাষার তফাৎ অনেক কিছু পাল্টায়। ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু ইংরেজরা যেভাবে ইংরেজী বলে, ফরাসীরা সেভাবে ফ্রেঞ্চ বলে না। ইংরেজদের কায়দা হলো হাত-পা কিছুই নড়বে না, ঠোঁটও যেটুকু না নড়লে কথা বেরুবে না সেইটুকু। ফরাসীরা যখন কথা বলে ওদের কাঁধ ওঠে নামে, দু হাত ছড়িয়ে দেয় টেনে আনে, আঙুলগুলো একসঙ্গে হয় আবার ফুলের পাপড়ি মেলবার মতো বিকশিত হয়।

"একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করি," লিণ্ডা বলে, "ফরাসীরা ফ্রেঞ্চ আফ্রিকার মানুষকে কায়দায় চলনে বলনে যতোটা ফ্রেঞ্চ করেছে, বৃটিশরা তোমাদের সেটা পারে নি। যেমন ধরো হাউসারা। হাউসারা নিজেরেও আছে, নাইজিরিয়াতেও আছে। নিজেরের শিক্ষিত হাউসা যতোখানি ফ্রেঞ্চ, নাইজিরিয়ার শিক্ষিত হাউসা তার সিকিভাগও বৃটিশ না। ওরা যখন ফ্রেঞ্চ বলে তখন উচ্চারণ, বলার ভঙ্গি. বক্তব্য সাজাবার পদ্ধতি সবই খাঁটি ফ্রেঞ্চ বলে মনে হবে।"

লিণ্ডাকে বলি, "তোমাকে পেয়ে নিশ্চিন্ত। নাহলে ভাষাটা আমার এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। ডাডলীকে তো আর হাতের কাছে পাবো না—ও নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত থাকবে।"

লিণ্ডা বলে, "আমার ফ্রেঞ্চও আহামরি নয়, তবে চালিয়ে দিতে পারবো।"

গাড়ী আর এখন অন্ধকার পথে যাচ্ছে না।

দূরে চোখে পড়লো সেই আলোকজ্জ্বল টাওয়ার। অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে আকাশের দিকে অনেক দূর উঠে গিয়েছে। আরও কাছে গিয়ে দেখলাম চত্বর গাড়ীতে গাড়ীতে ভর্তি। ভিতর থেকে ব্যাণ্ডের আওয়াজ।

এই তাহলে হোটেল ইভয়ার।

প্রথমেই চোখে পড়ে কতোখানি জায়গা নিয়ে হোটেল। শুধু সামনেটাই দেখছি, ভিতরে কতটা তখনও জানি না। কিন্তু বোঝা গেল একরের পর একর জায়গা নিয়ে হোটেল দাঁড়িয়ে—সত্যিই যেন ছোটখাটো শহর। হোটেলের সব অংশটা সমান উঁচু নয়, টাওয়ারের দিকটা ষোলতলা। প্রতিটি তলার ব্যালকনিতে সিঁড়িতে আলো জ্বলছে—সেই আলো দূর থেকে চোখে পড়ে। ঘরগুলোর অধিকাংশতেই আলো নেই—ভিড় নীচের নাচের আসরে। ঘরে থাকবে কেন শুধু শুধু ?

সত্যি বলতে কি, ষোলতলা উঁচু বড় কোন ব্যাপার নয়। আমি একবার নিউইয়র্কে পঁচিশতলা এক হোটেলে ছিলাম। সেই থাকাটা যে খুব ভালো লেগেছিল এমন নয়। এ যেন আকাশে ঝুলে থাকা—নিরলম্ব অবস্থান। প্রথম প্রথম জানলা দিয়ে নীচের কর্মব্যস্ত শহর, রাস্তা, গাড়ী, মানুষ দেখতে ভালো লাগে। তারপর একটা অস্বস্তি মনে চেপে বসে। যদি হঠাৎ বাড়ীটা ভেঙে পড়ে ? বা, আরও বাস্তব—যদি লিফটগুলো বন্ধ হয়ে যায় ? যদি বিদ্যুৎ না থাকে ? আসলে সেসবও ঠিক কারণ নয়। ওই ধরণের ভয় বা আশংকা যে অমূলক সেটা মনকে বোঝানো শক্ত নয়। আসল কারণ, মাটির থেকে দূরত্ব। যতো ওপরে উঠবে ততো নিঃসঙ্গ মনে হবে। মানুষ মানুষের সঙ্গে থাকতে চায়। লাজুক মানুষও চায় চুপ করে মানুষের কাছাকাছি থাকতে। সেটাও হয়তো ওপরতলার অবস্থানের অস্বস্তির কারণ।

হোটেল ইভয়ার নিউইয়র্কে নয়, ট্রপিকাল আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে। তফাৎটা সেইখানে। নিউইয়র্কে অনেক বড় জিনিষই চোখে পড়ে না। ওখানকার মানুষ, বাড়ী, রাস্তা, গাড়ী সবই বড় বড়। এম্পায়ার স্টেটস বিল্ডিং-এর ওপর থেকে চারপাশে তাকালে বহু বাড়ীই চোখে পড়ে যেগুলো পঞ্চাশ থেকে একশো তলা। কয়েকটা তো এম্পায়ার স্টেটস বিল্ডিং-এর চেয়েও উঁচু। ওখানকার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মনেই হয় না এত উঁচুতে, বরং কিছুটা নিরাশই হয়েছি। হোটেল ইভয়ার, ষোলতলা উচ্চতা নিয়েও যেন এম্পায়ার স্টেটস বিল্ডিংকে ছাপিয়ে যায় ওই

পরিবেশে। এক চোখ ধাঁধানো আলোক স্তম্ভ।

হোটেলের সামনে বেগুনে কাপড়ে সাদা অক্ষরে ইংরেজী 'ওয়েলকাম' ও ফরাসী তর্জমা। আফ্রিকান কোন ভাষায় আমন্ত্রণ নেই কেন ? লিণ্ডা জানায়, ফ্রেঞ্চই এখানকার রাষ্ট্রভাষা। ভিতরে ঢুকেই চোখে পড়ে সেই বিরাট হল—যেন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোর সামনের পুরো চত্বরটা। ঝকঝকে পালিশ করা পাথরের মেঝে—যেখানে নানা রঙের মানুষ আর পোষাকের প্রতিফলন। সমস্ত হল ছড়িয়ে নানা ভাস্কর্যের নিদর্শন। একপাশে রিসেপশন, সেখান থেকে চাবি নিতে হবে। ব্যাণ্ডের আওয়াজ খুব জোরালো—পাশের হলে নাচ হচ্ছে।

লিণ্ডাকে বললাম, "দেখো যেন টাওয়ারে ঘর পাই।"

লিণ্ডাই ফ্রেঞ্চে কথা বললো, আমার আর ওর ঘর এগারোতলায় ব্যবস্থা হলো। অবশ্য দেখলাম, হোটেলেব বহু কর্মচারীই কাজ চালাবার মতো ইংরেজি জানে।

ঘরে গিয়ে স্নান করে জামা কাপড় পাল্টে সোজা নীচে চলে এলাম।

একটা বড় ডাইনিং হলকেই নাচের জন্য সাজিয়েছে। হলঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লাল-নীল-সবুজ নানা রঙেব কাগজের শৃঙ্খল আর বঙ্গিন জেল্লা দেয়া সিল্কের রিবনে সাজানো। অসংখ্য বেলুন। সিলিং থেকে দেয়াল ধরে, মেঝেতে পর্যন্ত গড়াগড়ি খাচ্ছে। পাৎলা ঝিকমিক ফিতের মতো রঙীন ধাতুখণ্ডে দেয়ালের রূপসজ্জা। হলের প্রায় মাঝখানেই প্ল্যাটফর্ম—পাশে নীচে ব্যাণ্ড বসেছে। ড্রাম, ফ্লুট, ইলেকট্রনিক গিটার—সবকিছু মিলিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড। হলের চারপাশে ছড়ানো টেবিল-ফ্রোবে বসা প্রচুর মানুষ ড্রিঙ্কস নিচ্ছে, স্ন্যাক্স খাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের ওপরে নাচের ব্যবস্থা। সাধাবণত ব্যাণ্ড প্ল্যাটফর্মে বসে, অন্যবা প্ল্যাটফর্মেব নীচে নাচে—এখানে উল্টো। বাজনার তালে তালে পাযেব ধুপধুপ শব্দ।

লিণ্ডাকে বললাম, "এ যে দেখছি খৃস্টমাস পার্টি। এই টিনসেল-সজ্জায় আফ্রিকা কোথায় ?"

লিণ্ডা বললো, "তুমি ভুল করছো। এটা আফ্রিকা নয় আইভরী কোষ্ট। ভৌগোলিক অবস্থান যাই হোক, আমরা এখন ফ্রান্সে।"

আমরা বসে ড্রিঙ্কসের অর্ডার সবে দিয়েছি, তখনই ভিড ঠেলে এলো খালিক। ডঃ খালিক নাকভি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, নানা কারণে এক বিতর্কিত মানুষ, কিন্তু আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। দিল্লীতে গেলেই খালিকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, ওর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছে। আমি ওর ছেলেদের নিয়ে খেলাধুলার গল্প করেছি—ও অবাক হযে শুনেছে, কেননা খেলাধুলায় আগ্রহ ওর নেই। ওর বৌয়ের রান্না খেয়ে তাবিফ করেছি—খালিক বিরস বদনে বলেছে, "রান্না নিয়ে বলবার কি আছে—যা হোক একটা খেলেই হলো।" সব কথাতেই ওর একটা উল্টো কিছু বলা চাই। কিন্তু সেটা তর্কের জন্য, সেই কথাগুলো সত্যিই ওর মনের কথা নয়। খালিক একটা জিনিসই ভালোবাসে—তর্ক করতে।

লিণ্ডার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। বললাম, "তুমি যদি তর্ক পছন্দ করো, তাহলে খালিককে তোমার ভালো লাগবে। যদি কোনো বক্তব্যের উল্টো যুক্তি চাও, শুধু খালিককে একবার বলে দেখো। খালিক এখনও একটা জিনিস পারে না, সেটা হলো ছেলেকে মেয়ে করতে, আর মেয়েকে ছেলে করতে। আমার ধারণা কিছুদিনের মধ্যে খালিক সেই কায়দাটাও রপ্ত করবে।"

খালিক প্রতিবাদ করে বললো, "ওর কথা একদম বিশ্বাস করো না। কম্যুনিস্টরা কখনই সত্যি কথা বলে না—১৯৪২ সাল থেকেই..."

আমি ওকে থামিয়ে লিণ্ডাকে বললাম, "কিন্তু সেখানেও মজা দেখাবে যদি তুমি নিজে কম্যুনিস্ট বিরোধী কথা বলো। খালিক তখন প্রমাণ করে দেবে কম্যুনিজমই একমাত্র পথ।

জোর গলায় বলবে, আমি দিল্লীতে কার্ল মার্কস পড়াই। এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে আসলে ইন্দিরা গান্ধীও কম্যুনিস্ট।"

তারপর খালিককে বললাম, "তুমি কেমন সিভালরাস পুরুষ ! এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, নাচরে আসরে, তুমি এখনও নাচবাব প্রস্তাব করলে না ?"

খালিক ভারতীয় কায়দায় হাত জোড় করে লিণ্ডাকে বললো, "ওই রসে আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গে নাচবার মতো জঘন্য শাস্তি তোমায় দেবো না। এমন কি বিপ্লবের মতো আমার এক বন্ধু বললেও না।"

খালিকের কথা শেষ না হতেই লণ্ডনের ও-ডি-আই বা ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের রবার্ট উপস্থিত। "হ্যালো, বিপ্লব, হ্যালো লিণ্ডা," দু চার কথাব পরই আমাকে জিগ্যেস করলো, "তুমি কিছু মনে করবে না তো, যদি লিণ্ডাব সঙ্গে নাচি !" তারপব লিণ্ডার হাত ধরে ঢুকে গেল প্ল্যাটফর্মের নাচের ভীড়ে।

খালিককে বললাম, "দ্যাখো, একেই বলে মেল-শভিনিজ্‌ম। অথচ লিণ্ডা একজন প্রফেশনাল মহিলা, আমার পরিচিত এই যা। কোন পুরুষ ওর জীবনে আছে কি নেই জানি না, আমার জানার কথা নয়। থাকলেও লিণ্ডা স্বাবলম্বী, স্বাধীন। তবু রবার্টস ধরে নিচ্ছে, যেহেতু আমরা একসঙ্গে বসেছি, অতএব ও আমার সঙ্গী, এবং আমাব অনুমতি ছাডা লিণ্ডার সঙ্গে ওর নাচবার প্রস্তাব হবে অনধিকার চর্চা।"

খালিক বললো, "এতে অন্যায় কি ? পুরুষ ও নারী, একসঙ্গে কথা বলছো, সেটাও তো একটা সম্পর্ক। এইভাবেই তো সব সম্পর্কের শুরু হয়। তোমার মনে কি মতলব আছে, ও কি ভাবে জানবে ? তুমি হয়তো মনে মনে চাইছো নিজেই নাচবে লিণ্ডার সঙ্গে। সেখানে অনুমতি না নিলে হাত গুটিয়ে তুমি হয়তো মারামারি করতে যাবে ? আমি তোমার কথা বলছি না, কিন্তু হতে পারে তো ?

এই নিয়েই অনেকক্ষণ তর্ক চললো। তিনটে বাজনা শেষ হবার পরও, রবার্ট-লিণ্ডার নাচ আর আমাদের তর্ক শেষ হলো না। এর মধ্যেই ভীড় ঠেলে আড্ডায় ঢুকলো বাংলাদেশের মহিউদ্দিন আলমগীর, বোম্বের ব্যাঙ্কার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ অরুণ ব্যানার্জী, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নর্মান গিভার্ন এবং আরো অনেকে। আমরা একটা ভালো আড্ডার গ্রুপ হয়ে গেলাম।

কিন্তু ডাডলী কোথায় ?

এতজনের সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু ভীড়ের মধ্যে ডাডলীকে দেখছি না। অথচ ডাডলীকেই দরকার সবচেয়ে বেশী। কালকের আলোচনা নিয়ে কথা বলতে হবে। ইতিমধ্যে রিসেপশনে ওর ঘরের নম্বর দেখে ঘরে গিয়ে দেখেছি তালা বন্ধ। ডাডলী নিশ্চয়ই সম্মেলনের ব্যাপারে কোনো গুঢ় আলোচনায় ব্যস্ত। সাসেক্সেও ডাডলীকে ধরা শক্ত—সব সময় ব্যস্ত। কাজের পর কাজ। বছরের আদ্ধেক সময় বিদেশে। আমরা ঠাট্টা করে বলি, এয়ারপোর্ট লাউঞ্জেই ওর বাসা—এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার পথে ডাডলী প্রবন্ধ লেখে। ব্রাইটনে সিঁড়িতে, খাবার ঘরে দেখা হলেও 'হ্যালো' বলে না, পাশ কাটিয়ে চলে যায়, সব সময় যেন কি ভাবছে। চোখের দৃষ্টি তোমার দিকে পড়লেও তোমায় দেখছে না—দেহ ফুঁড়ে অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ে। আমাদের সকলের কাছেই, সাদা চুল, সাদা দাড়ি, গলায় পেণ্ডেন্ট ঝোলানো, বিরাট চেহারা, দ্রুতগতি মানুষটা এক রহস্য।

অনেকক্ষণ পর চোখে পড়লো, প্ল্যাটফর্মের নাচিয়েদের ভীড়ের এককোণে ডাডলী এক তন্বী সুন্দরীর সঙ্গে নাচছে, কথা বলছে। নাচের মধ্যেই মহিলাটি ওর পেণ্ডেন্টে হাত দিয়ে কি জিগ্যেস করছে, ডাডলীও ছন্দ রেখে, গতি না থামিয়ে, হেসে তার জবাব দিচ্ছে।

ডাডলীর সঙ্গে চোখাচুখি হলো। সেই দৃষ্টি স্বচ্ছ, আমার শরীর ফুঁড়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে ঠেকলো না। ও হাত তুলে অভিনন্দন জানালো। যাক, দেখা হলো, এখন নিশ্চয়ই বাজনা থামলে আসবে।

বাজনা থামলো, ডাডলী এলো না। আধ-মিনিটের মধ্যে নতুন বাজনার তালে আবার নাচ শুরু। একটার পর একটা গান আর বাজনা হয়েই যাচ্ছে—ডাডলী তবু আসে না।

খালিক বললো, "তুমি খামোখা কেন ডাডলীকে নিয়ে পড়লে ? দেখছো না ওর বয়স এই এক ঘণ্টায় পাঁচ বছর কমে গিয়েছে। সম্মেলন তো কতো হয়, আরো কতো হবে। কিন্তু একবার নাচ ছেড়ে নীচে নেমে এলে ওই সুন্দরী মহিলা যদি অন্য কারো সঙ্গে জুড়ে যান ! তুমি আর ওকে জ্বালিও না। আসলে তোমার ওকে দেখে হিংসে হচ্ছে।"

লিণ্ডা-রবার্ট ততক্ষণে ফিরে এসেছে। লিণ্ডা বললো, "একটাই উপায় আছে। চলো আমার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে উঠবে। নাচের ফাঁকে কথা বলো। তোমারই উচিত ছিল আমার সঙ্গে নাচের প্রস্তাব দেবার। এতক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন বুঝছি তুমি বলবে না, তখন আমার আর না বলে উপায় থাকলো না। চলো।"

তারপর আমাব হাত থেকে টম্যাটো জুসের গ্লাসটা ছিনিযে নিয়ে টেবিলে বেখে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

আমার নাচ আমার সাঁতারেরই মতো। সাধ থাকলেও সাধ্য কম। প্রাণশক্তি যতোখানি আছে, দক্ষতা বা কুশলতা ঠিক ততোখানিই কম। ছন্দজ্ঞান আছে, কিন্তু শবীবটাকে দুমড়ে মুচড়ে স্পোর্টস বা নাচের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারি নি। পার্টনারেব সঙ্গে সুবের তালে শরীর দোলাই, হাত পা ঘোরাই, সেইটুকুই। সেই নাচ ভীড়েই নাচবার মতো—যেখানে চোখে পড়বে না।

আমার প্রথম নাচ আমার মাষ্টারণীর সঙ্গে। আমি তখন লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের ছাত্র। সুপারভাইসার এক ডাকসাইটে মহিলা, ইডিথ পেনরোজ, কাজ ছাডা বোঝেন না—পষ্টাপষ্টি কথা বলেন, কিন্তু মানুষটা ভালো। ক্রিশমাসের আগের পার্টি, ফ্লোরে নাচ হচ্ছে, আমি অন্যদের সঙ্গে ধারে দাঁড়িয়ে গল্প করছি—ড্রিঙ্কস আর স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছি। হঠাৎই ধাঁ করে ইডিথ এলো, এবং কিছু বুঝবার আগেই হাত ধরে টেনে নিয়ে ঢোকালো নাচের ভীড়ে। কি লজ্জা! কি লজ্জা! মুখ লাল বা বেগুনী হয়ে গেল। আমার মধ্যবিত্ত বাঙালী সত্তাব যতোরকমের সংস্কার সবকিছু একসঙ্গে মিলে আমাকে চুপসে দিলো। ধারে দাঁড়ানো ভারতীয়-বাংলাদেশী-পাকিস্তানী বন্ধুদের অনেকেই আমার অপ্রস্তুত ভাব দেখে তখন হাসছে, মজা পাচ্ছে।

ইডিথ বললো, "নাচো।"

আমি বললাম, "আমি নাচ জানি না।"

ইডিথ বললো, "জানবার দরকার নেই। ছন্দজ্ঞান থাকলেই হলো। তুমি আমাকে দেখো, আমার মত হাত পা নাড়াও। হ্যাঁ ঠিক আছে। পা আর একটু তোলো, না হলে বোঝাই যাচ্ছে না যে তুমি নাচছো। হাতটা আর একটু ছড়াও। পিছনে দু হাত রেখে নাচ হয় না। উঃ হাত আর পা আলাদা নয়—দুটোকে মেলাও। পাশের মেয়েটাকে কনুইর গুঁতো দিও না, সরে এসো। এবার ঠিক আছে। তুমি বড্ড স্টিফ, খেলাধূলো করোনি কখনো ? কোমরটা একটু বাঁকাও—কেউ খারাপ মনে করবে না। গুড। তোমার পা এখন ঠিকঠিকই চলছে। মাথাটা কি হলো ? নড়ছে না কেন ? না না, শুধু শুধু মাথা নাড়াতে বলছি না। তুমি তো খেলার পুতুল না। মাথা, হাত, পা, কোমর সব একতালে চলবে, তবে নানাভাবে—বৈচিত্র্য আনো। বাঃ ! চমৎকার। দেখলে তো, শিখবার দরকার নেই, তাল মেলালেই হলো। নাচ একা একাই করা

যায়। এসো, এবার আমার কোমরটা ডান হাত দিয়ে ধরো। বললাম তো বাঁ হাত নয়। বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরো। হ্যাঁ, আমি তোমার কাঁধে বাঁ হাত রাখছি। এবার আমার পায়ের সঙ্গে পা মেলাও। ক্লোজ হও। লজ্জা পেতে হবে না, আমি তোমার মায়ের মত। ফ্রি হও। এই তো ঠিক আছে। চমৎকার চমৎকার। উঃ, আমার পা-টা মাড়ালে কেন ? এত জোরে তোমাকে পা ছুড়তে কে বললো ?"

মিনিট পনেরো পরে বিধ্বস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে ফিরে এলাম। সেই প্রথম নাচ।

তারপর ধীরে ধীরে লজ্জা কাটলো। দেখলাম, কিভাবে নাচছি, ভালো না মন্দ এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, আলোচনা করে না। দু একজন পার্টনার মাঝে মধ্যে টিপ্‌স দেয়। একজন দেখিয়ে দিল কি করে দুজন দুজনের হাত ধরবে, তারপর হাতের নীচে মাথা গলিয়ে ছন্দ মিলিয়ে ঘুরে যাবে, আবার একই জায়গায় ফিরে আসবে। অনেকেরই উপদেশ বৃথা গেল। তবু এসে গেল না। বুঝলাম নাচটাও ওদের সামাজিকতার এক অঙ্গ। বন্ধুর বাড়ীতে হয়তো তিন চার দম্পতি গিয়েছি। ডিনারের কিছুটা পরে ওরা রেকর্ড চাপালো, আলো কমালো, সবাই মিলে বাজনার তালে নাচলো। নাচের সঙ্গেই যতো রকম গল্প, পরচর্চা এবং হাসি ঠাট্টা। পার্টনাররা ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধু, বা বন্ধুর পত্নী। পরিবেশটা সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ, নাচটা বড় জিনিষ নয়, মেলামেশারই একটা ধরন। আমাদের দেশে অবশ্য এই ধরনের সামাজিক যৌথ নাচের চল মূলত আদিবাসীদের মধ্যেই আছে। যে কোন কারণেই হোক, এশিয়ার মধ্যবিত্ত এই নাচ নেয় নি—কিন্তু বাকি প্রতিটি মহাদেশেরই সংস্কৃতির এক বড় অঙ্গ এই যৌথ নাচ। আফ্রিকায় তো বটেই।

প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়াটা সহজ নয়। প্রচুর মানুষ গিজগিজ করছে। পথে কোথাও চেয়ার, কারো বিরাট ঠ্যাং বা বপুর বাধা। এরই মধ্যে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওয়েটাররা মাথার ওপর হাতে করে তোলা ট্রেতে ড্রিংকস আর স্যাণ্ডউইচ সবাইকে দিচ্ছে। যাহোক *ঠেলেঠুলে* প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়লাম, এবং নাচের মধ্যেই ডাডলীর কাছে পৌঁছে বললাম, "হ্যালো ডাডলী।" পরিচয় পর্বে নাচতে নাচতেই ডাডলীর তন্বী সুন্দরীর সঙ্গে করমর্দন হলো। ডাডলী লিণ্ডার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললো, "এনজয় করো। কাজের কথা পরে হবে।"

আমি বললাম, "একটু আলোচনা করলে ভালো হতো না ?"

ততক্ষণে একটা গান শেষ হয়েছে। নাচের স্বল্প বিরতি। ডাডলী বললো, "আলোচনার কি আছে ? ইস্যুগুলো তুমি তোলো যেমন নোটে লিখেছো। তারপর আলোচনা তার নিজের গতিতে এগোক। কে কি বলে শুনি। শেষের দিকে সামারি করবার আগে আলোচনা করা যাবে।"

ততক্ষণে বাজনা আবার শুরু। ডাডলী শরীর দুলিয়ে দুলিয়েই বললো, "তোমার ঘর কেমন ?"

বললাম, "ভালো জায়গায়। টাওয়ারের এগারো তলায়।"

চমৎকার।" বলে নাচতে নাচতেই ডাডলী পার্টনারের সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে অন্যদিকে চলে গেল।

লিণ্ডা বললো, "তুমি ব্যর্থ চেষ্টা করছো। ডাডলী তোমাকে আজ সময় দেবে না। বরং এসো, এই গানের পর হোটেলটা ঘুরে দেখি। এখানে বড্ড স্টাফি লাগছে। তাছাড়া তুমি এর মধ্যেই দুবার আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছ।"

নাচ শেষ হলে খালিক, লিণ্ডা আর আমি বেরুলাম হোটেল পরিদর্শনে। লিণ্ডা বললো, "আবিজঁই এখন আফ্রিকার এক বড় কনফারেন্স সেন্টার। রাজনৈতিক, ব্যবসাগত, সাংস্কৃতিক,

এ্যাকাডেমিক, সব ধরনের সম্মেলনই এখানে হয়। এত বড় কমপ্লেক্স আফ্রিকাতে আর নেই। এখানে দেড় হাজার মানুষ থাকবে, খাবে, আলোচনা করবে, দোকানপাট করবে—সবকিছু এক ছাদের তলায়। বেরুবার দরকার হবে না। বড় অডিটোরিয়াম তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে তিন থেকে পাঁচশো লোক ধরে এমন কয়েকটা মাঝারি হল। ছোট ছোট হলও আছে। সব রকম আলোচনার জন্য সব সাইজের হল আছে। সবকিছুই মডার্ণ, সুন্দরভাবে ফরাসী কায়দায় ফার্নিশড।"

খালিক বলে, "আমি সকালে এসেছি। তখন থেকে ঘুরে ঘুরে হোটেলের সব কিছু দেখছি। ভাবি নি আফ্রিকার রেইন ফরেস্টে এ জিনিস দেখবো। ইউরোপে হলেও অবাক হতাম। এখানে বোলিং, গ্যাম্বলিং, সব রকমেরই ব্যবস্থা, এমন কি আইস-রিংকও আছে।"

আইস-রিংক? বিষুবরেখার ওপরে জমাট বাঁধা বরফের মাঠ? প্রথমে সেটাই দেখতে গেলাম।

সেখানে নানা রঙের পোষাক এবং চেহারার মানুষ স্কেটিং করছে। মনে হলো কোন প্রতিযোগিতা চলছে। স্কেটিং করতে করতেই বাজনার ছন্দে নানা তালের দ্বৈত নাচ। বরফের ওপর ওই নাচ দারুন গতিশীল, সাবলীল। খেলোয়াড়দের অদ্ভুত ব্যালেন্স—ঝড়ের মতো ছুটে গিয়েও প্রান্তসীমায় এসে হঠাৎ থেমে অন্যদিকে ঘুরতে পারছে, লাট্টুর মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে স্পিন করছে, অথবা পুরুষ-পার্টনার মহিলাকে হাতে ধরে স্বচ্ছন্দে বরফ ঘেঁষে ঘোরাচ্ছেন। সকলেরই নিয়ম-মাপা নাচের স্মার্ট পোষাক।

"আমি কি জেগে?" খালিককে জিগ্যেস করি।

"যতদূর মনে হয়, উত্তর হলো-হ্যাঁ," খালিক বলে।

"আমি কি আফ্রিকায়?"

"এখানেও একই উত্তর, তবে ধরে নিচ্ছি আমি জেগে রয়েছি।"

জেগে আছি কিনা চিমটি কেটে পরখ না করলেও সন্দেহ গেল না।

"কিন্তু আফ্রিকানরা কোথায়?"

"কেন ওই তো!" খালিক দেখায় যারা খাবার পরিবেশন করছে, গার্ড দিচ্ছে, রিসেপসনে বসে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের। ওদেরও ঝকঝকে বো-টাই, শুধু বুকের তকমা থেকে বোঝা যাবে হোটেলের কর্মচারী। এই হোটেলে আফ্রিকানদের ওইটাই মূল ভূমিকা।

গেস্টদের মধ্যে আফ্রিকান নেই এমন নয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এই সম্মেলনে মানুষ জন কম আসে নি। কিন্তু রঙটাই একমাত্র বিচার্য নয়। ওদের উচ্চারণে অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড বা সরবোন, বুকপকেটে সাজানো ত্রিকোণ রুমাল উঁকি মারছে, বাটনহোলে ফুল, এবং জ্যাকেটের নীচে ওয়েস্ট কোট। ভাগ্যিস এয়ার-কণ্ডিসনিং খুব ভালো, না হলে ভারী থ্রী পীস স্যুটে গায়ে ফোস্কা লাগবার কথা। বাইরে ভ্যাপসা গরম, ঘামে গা ভিজে যায়। রোদ্দুরে মাথা ধরে। কিন্তু হোটেল ইভয়ার এক আলাদা জগত।

একপাশে বিরাট অফিস, টাইপিং পুল, সম্মেলনের ফাইল আর পেপার তৈরী, গোছানো, বিতরণ হচ্ছে। কর্মীদের মধ্যে মহিলাই বেশী, এবং বেশ কয়েকজনই শ্বেতাঙ্গিনী।

লিণ্ডা ফরাসী ভাষায় ওদের সঙ্গে কথা বলে। খালিকও একটু একটু ফরাসী জানে।

লিণ্ডা শ্বেতাঙ্গিনীদের দেখিয়ে বলে, "এরা কিন্তু ইউরোপীয় নয়, এখানকারই। বলতে পারো মিশ্র-জাতি, ফরাসী এবং আফ্রিকান দুই রক্তই ওদের মধ্যে রয়েছে। আইভরী কোস্টের সরকারী বড় বড় অনুষ্ঠানে এই রকম মহিলা প্রচুর দেখবে। এরা হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট হুফে বয়নির 'সো-পিস'।"

বোলিং-এর ব্যবস্থাটা পুরোপুরি মার্কিনী। খেলাটা প্রায় আমাদের কলকাতার পাড়ার রাস্তায় গুলি খেলার মতো—বলা চলে উন্নত শিল্প প্রযুক্তিবিদ্যাগত সংস্করণ। গুলি খেলায় হাতের আঙুল দিয়ে গুলি ঠেলে দিতে হয় নির্দিষ্ট গর্তের দিকে। এই খেলার মূল ঝকঝকে রঙীন ধাতুর ফুটবলের মতো বড় বল, এবং লক্ষ্য দূরের একটা ঘরের মতো জায়গায় পাশাপাশি দাঁড় করানো দশটা সুদৃশ্য সাদা কাঠি। বলটা হাতে করে মসৃণ পথে গড়িয়ে দিতে হবে ওই বড় কাঠিগুলোর দিকে—এবং যতোগুলো কাঠি পড়বে তার ওপর ভিত্তি করে পয়েন্ট। যারা একসঙ্গে দশটা কাঠি ভাঙতে পারে তারা খুব ভালো খেলোয়াড়। কাঠিতে লাগবার পর যন্ত্র দিয়ে আবার নতুন করে আপনা আপনি দশটা কাঠি বসে যাবে পরের বলের জন্য। খেলাটা সহজ, খেলার থেকে বড় কায়দা আর জাঁকজমক।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে লিগুাকে বলি, "এ তো পর্বতের মূষিক প্রসব। এত খরচের পর এই সাধারণ শিশুদের খেলা ! আমি তো দশ মিনিটে বোর হয়ে গেলাম। তার চেয়ে বরং চল টেবিল-টেনিশ খেলি।"

লিণ্ডা হেসে বলে, "এই খেলার মাহাত্ম্য তোমার ভারতীয় মগজে ঢুকবে না। এ হচ্ছে মার্কিনী বিসনেস একসিকিউটিভদের খেলা। ওরা বলে এই খেলায় ভালো রিলাকসেসন হয়। ওই যে দশটা পিন, এ যেন দশজন প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের দিকে বল ছোঁড়া এক ধরনের আক্রমণ। সমস্ত দিনের টেনসনের পর এই নির্দোষ এ্যাগ্রেসন ওদের মন ঠাণ্ডা রাখে। তারপর ধরো, আর একটা দিক হলো, আলোচনার সুযোগ। দুই কোম্পানীর প্রতিনিধি বল খেলতে খেলতে ড্রিংক করতে করতে দরদাম করবে, শর্ত নিয়ে তর্ক করবে। পরে লিখিত পড়িত ভাবে যেটা হবে সেটা আনুষ্ঠানিক। আসল বিসনেজ ডিল এখানেই হচ্ছে। এক সন্ধ্যায় কোটি কোটি টাকার সিদ্ধান্ত হচ্ছে। তাই এই ধরনের সহজ খেলাই ওরা চায়।"

যাহা মার্কিনী বা ফরাসী তাহাই আইভরি—এই হলো আপ্তবাক্য। এই টেন-পিন বোলিং-এর আসরে কয়েকবার বল ছুড়ে ভালো করে বুঝলাম সেকথা। তবে বল ছোড়াটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম তেমন নয়—প্রবণতা হচ্ছে সোজা 'লেন' ধরে না গিয়ে দুপাশের উঁচু বাধার ধাক্কা খেতে খেতে এঁকেবেঁকে যাবার। আমার টেবিল টেনিশই ভালো—সেটাও অবশ্য ভালো খেলি না।

গ্যাম্বলিং-এরও ভালো ব্যবস্থা। যেন মিনি লাস-ভেগাস। হুইল ঘুরছে, টাকার ঘুঁটি ছুড়ছে, হাতের রড দিয়ে ঠেলে সেই ঘুঁটি বিজয়ীর দিকে দেয়া হচ্ছে। এত টাকা কাদের যে এত স্বচ্ছন্দে নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দিচ্ছে ? লিণ্ডা বললো, এরা স্থানীয় ফরাসী বা আফ্রিকান, তবে বাইরের অন্য দেশ থেকেও অনেকে আসে। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের অনেককেও দেখলাম এই জুয়ার আসরে।

রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে খালিকের সঙ্গে কথা হলো, পরদিন ভোরে একসঙ্গে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটবো। নিজের স্যুইটটা ভালো করে দেখে চোখ বড় হয়ে গেল। পুরোটাই দামী পাথরের স্ল্যাব দেয়া—নানা কারুকার্য শোভিত দেয়াল, ছাদ, বাথরুম। এত প্রাচুর্য আগে কখনো দেখি নি, এত বিলাসিতার সুযোগ পাই নি। এই স্যুইট অন্যান্য হোটেলের ছকে মেলানো নয়। কারো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলে ভুল হবে না কোথায় রয়েছে।

ঘুম ভাঙলো ভোর হবার অনেক আগে, মাঝরাত্রে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। ট্রপিকাল আফ্রিকায় বিষুবরেখার প্রায় ঘাড়ের ওপর বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। কেননা এয়ার কণ্ডিশনিং চূড়ান্ত। ঘরে নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন 'নব' আছে, যেটা খুঁজে পেলাম না। অগত্যা ওয়ার্ডরোব খুলে কয়েকটা ভারী ভারী কম্বল বের করে গায়ে চাপিয়ে আবার ঘুমুলাম।

॥ তিন ॥

ভোরবেলা উঠে জানলার পর্দা খুলে নীচের দিকে তাকালাম।

এগারো তলার ওপর থেকে সেই প্যানারোমিক দৃশ্য বহুদিন মনে থাকবে। হোটেল ইভয়ারের অঞ্চলটাব নাম কোকোডি—নব্য ধনীদের জায়গা। যেন লোগোসের ইকোই দ্বীপ। বা টিউনিশের শহরতলীর কার্থেজ। সেখানে পর পর সাজানো সুন্দব ছবির মতো ভিলা—বাগান, ট্রিমড হেজে সুদৃশ্য। পটভূমিকায় লেগুনের নীল জল।

আইভরী কোষ্টের সমুদ্র উপকূলের পঞ্চাশ মাইল ধরে অসংখ্য খাড়ি, লেগুন, ছোট ছোট জলপথ। লেগুনের জলে বিষুব-আফ্রিকার তীক্ষ্ণ রোদ্দুর রূপালী বং মেশায়। রোদ্দুর আর ছায়ার কারসাজিতে নানা রঙ, নানা ছবি। বেশী রোদ্দুর হলে সেই জল দূর থেকে ধোঁয়াটে নীল লাগে।

আবিজঁর ঠিক মাঝখান দিয়েই এক লেগুন। ব্রিজে করে অন্যদিকে যেতে হয়। তবে লেগোসের মতো বড়ো যান জটের সমস্যা নেই। আইভবী কোষ্টেব মোট জনসংখ্যার দশ ভাগ থাকে আবিজঁতে, এবং মোট শহরবাসীব আদ্ধেক। তবু পাঁচ লক্ষের শহর আবিজঁতে লেগোসের ছাপ নেই। ধাঁচটা বরং ডাকারেব। শহব ভালো কবে দেখলাম পবদিন। সেইদিনটা গেল দশ রকমের ব্যস্ততায়।

ছুটলাম সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে গায়ে টাওয়েল জড়িয়ে সুইমিং পুলে। কিন্তু এ কি সুইমিং পুল না নদী? কেননা, বিরাট চওড়া জলেব এক সূত্র এঁকেবেঁকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে হোটেলময় ছড়িয়ে। স্নানের ভীড় কম না—সেই ভীড়ে খালিককে খুঁজে পেলাম না।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে খালিকের চোটপাট, "তুমি এলেনা কেন সাড়ে সাতটায়?"

আমি বললাম, "কি আশ্চর্য! চোটপাট করবার কথা তো আমার! তুমি কোথায় ছিলে?"

অনেক তর্কাতর্কির পর বোঝা গেল দুপক্ষই ঠিক—আমরা ওই বিশাল পুলের উল্টো দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে একজন আরেকজনকে দেখতে পাই নি।

সকাল নটা থেকেই সাজো সাজো রব। ড্রাম বাজছে বাঁশী বাজছে, তারের যন্ত্রের আওয়াজ, গানের গলা। এত সকালে? উদ্বোধন তো সাড়ে দশটায়—এখন কি? গেটের কাছে গিয়ে দেখলাম প্রায় মেলার মতো অবস্থা। অনেকগুলো গ্রুপ করে আলাদা আলদা নাচ-গান-বাজনা চলছে। নাচছে মেয়েরা, দশ থেকে ষোল বছরের মধ্যে। ওদের চুলে অসংখ্য সোজা-বাঁকা সিঁথি, আলাদা করে রঙীন ফিতে আর পুঁতি দিয়ে প্রচুর বাঁধা বেণী। আফ্রিকান মেয়েদের সোজা একটা বা দুটো বেণী করবার উপায় নেই—ওদের চুল এত কোঁকড়া আর ঘন যে একসঙ্গে করা যায় না।

গানের সঙ্গে নাচ। নাচ আমাদের দেশের সাঁওতালদের মতোই গায়ে গা ঘেঁষে দুলে দুলে অল্প কয়েকটা স্টেপ ধরে। গানও সেই রকম একই সুরের এবং ছন্দের পুনরাবৃত্তি। এই আর্ট সহজ,

অনাড়ম্বর, কোন রকম জটিলতা নেই। আমার কাছে এই নাচ গানের থেকেও ভালো লাগলো পরিবেশ। এদের দেখে মনে হলো গ্রামের মানুষ, হয়তো এই উপলক্ষে আনা হয়েছে।

উপলক্ষটা সম্মেলনের চেয়েও বড়। রাষ্ট্রপতি হুফে বয়নি সম্মেলন উদ্বোধন করতে আসছেন। এই মেয়েদের এবং যন্ত্রশিল্পীদের ভীড় ওকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। আইভরী কোষ্টে রাষ্ট্রপতিই সব—বাকি সবকিছুই উপলক্ষ, রাষ্ট্রপতির প্রয়োজনে।

নির্ধারিত সময়ে দেড় হাজার মানুষের অডিটোরিয়ামে বসলাম। কানে হেডফোন—ফরাসী থেকে ইংরেজি তৎক্ষণিক অনুবাদের জন্য। প্রেসিডেন্ট ফরাসী ভাষায় বলবেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৬০ সালে, কিন্তু ফরাসীই রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার আগে ফরাসী-নাগরিক হয়েছিলেন, যে সম্মান খুব অল্প আফ্রিকানকেই ফরাসীরা দিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ঢুকলেন। সঙ্গে, সামনে পিছনে একগাদা লোক। সম্মেলনের সংগঠক, সিকিউরিটি, ফটোগ্রাফার। রাষ্ট্রপতি প্রায় কুড়ি মিনিট বললেন। তার গলার স্বর শুনলাম, হেডফোনে ইংরেজী অনুবাদ বুঝলাম, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে দেখলাম না। যতক্ষণ ভাষণ চললো ততক্ষণ ধরেই রাষ্ট্রপতির সামনেটা পুরো আড়াল করে ত্রিশ চল্লিশ জন ফটোগ্রাফার ছবি নিল। ওদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তিও লক্ষ্য করলাম যা মাঝেমধ্যে শোভনতার সীমানার বাইরে গেল। ক্যামেরার এত মুহুর্মুহু ফ্ল্যাশেও কেন তাঁর চোখ অন্ধকার হয়ে গেল না, কি করে তারপরেও তিনি না থেমে পুরো বক্তৃতা পড়তে পারলেন সেটা আমার কাছে এক রহস্য। রাষ্ট্রপতি হবার এটাও নিশ্চয়ই এক প্রয়োজনীয় যোগ্যতা।

বক্তৃতার শেষে লিণ্ডা বললো, "সম্মেলনের আসল কাজ শেষ হলো।"

মানে ? আমি দারুন অবাক হলাম। লিণ্ডা বলে কি ? কুড়ি মিনিট ধরে তো শুধু দেখলাম কিছু না বলেও কি করে স্বচ্ছন্দে বলে যাওয়া যায় তার কসরৎ। সব মিলিয়ে কি দাঁড়ালো ?

লিণ্ডা বললো, রাষ্ট্রপতির কাছে সব ব্যাপারটাই এক বড় পাবলিক রিলেসন্স এক্সারসাইজ। ফটো উঠেছে, বক্তৃতা হয়েছে—কাল এখানকার সমস্ত কাগজপত্র ধরে শুধু এই খবরই থাকবে। রাষ্ট্রপতি দেখাবেন দেশ বিদেশের কতো বড় বড় মানুষ এই সম্মেলনে এসেছেন, অতএব তিনিও কতো বড়। এরপর সম্মেলন বন্ধ হয়ে গেলেও রাষ্ট্রপতির কিছু এসে যাবে না।

দুপুরের লাঞ্চের পর সম্মেলন চারটে ভাগে ভাগ হয়ে বসলো চারটে আলাদা হলে, তার একটার মধ্যে আলোচনা হলো তেলের বর্দ্ধিত দামের তাৎপর্য নিয়ে। আমি আলোচনার সূত্রপাত করলাম—তারপর তিনদিন ধরে আলোচনা চললো। নানা জনের নানা মত। অধ্যাপক, সাংবাদিক, সরকারী প্রশাসক, তেলের কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ—কে নেই এই আলোচনায় ! তারপর মার্কিন, ইউরোপীয়, ওপেক, নোপেক ভাগ তো আছেই।

সন্ধ্যেয় রিসেপসন। রাষ্ট্রপতি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পার্টি দিচ্ছেন। হোটেলের একপাশেই এক বড়ো ঘাসের লন, তার চারপাশ ঘিরে নানা ফুলের বাগান। পার্টি সেখানেই হচ্ছে। লনের মধ্যেই তিন জায়গায় চাদর ঢাকা টেবিল পেতে তার ওপর হাজারো রকম খাবার রাখা হয়েছে ; খাবার হটপ্লেটের ওপর, নীচে আগুন জ্বলছে। প্রতিনিধিরা প্লেটে করে খাবার নিয়ে সারা লন ঘুরে বেড়িয়ে গল্প করছে।

"এত সুন্দর ঘাসের লনটা যে মাংস, শব্জী, কাগজের রুমালে নষ্ট হয়ে গেল", আমি বলি।

লিণ্ডা বলে, "চিন্তা নেই। রাষ্ট্রপতির লোকবল আছে। হাতে তুড়ি দিলেই শয়ে শয়ে লোক এসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত নোংরা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।"

সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় বাইরে ঘুরে ঘুরে খাওয়া আর গল্প বেশ ভালোই লাগলো। রাষ্ট্রপতি তার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন, তবু দেখা হলো না। লনের মধ্যে যেদিকেই তিনি যান সেখানেই তাকে

ঘিরে সিকিউরিটি সভাসদ আর ক্যামেরাম্যানদের ধ্বস্তাধ্বস্তি। আমি ধারে কাছে যাবার চেষ্টাই করলাম না।

সন্ধ্যা না হতেই শুরু হলো আবার গান আর নাচ। এবার আর ছোট মেয়েরা নয়, পুরুষ পেশাদারী নাচিয়েরা। বিরাট লনের নানা জায়গায় পাঁচ ছটা ভাগে। নাচিয়েদের চারপাশে গোল হয়ে হয়ে আলাদা ভীড়। দু হাজার মানুষ—যেন কোন মেলা হচ্ছে। মানুষের কথাবার্তা, বাজনা, গান, সব মিলিয়ে জমাটি ব্যাপার।

আমরা কয়েকজন যে নাচটা দেখলাম সেটা মনে হলো যুদ্ধের নাচ। কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে তীর-ধনুক, কেউ নিয়েছে ধারালো কিছু অস্ত্র। চামড়ার পোষাক, পাখীর পালক দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে উঁকি মারছে, বিশেষ করে মাথার শিরস্ত্রাণ থেকে। সুঠাম, দীর্ঘ, মেদহীন চেহারা। রঙমাখা যোদ্ধার চোখে মুখে যেন আগুন। বাজনার ছন্দে ঘুঙুর পরা দুই পা দ্রুত ওঠা নামা করছে—উত্তেজনা যতো বাড়ছে ততো দুরন্ত হচ্ছে পায়ের গতি। একজনেব মুখে মাখা রঙ—তারও হাতে অস্ত্র, খানিকটা বন্দুকের মতো। বোঝা গেল কাহিনীটা ইউরোপীয় আক্রমণ নিয়েই, কিন্তু শেষদিকে দুপক্ষের বন্ধুত্ব। এ যেন আইভবী কোস্টেব রাজনীতির লোক উপাখ্যান।

নাচের মধ্যে ড্রামাব অভাব ছিল না। একবার তো বল্লম হাতে যোদ্ধা চোখ পাকিয়ে ছুটে এলো আমাদেরই দিকে। আমরা তিনজনই ঘাসে বসে থেকেও, একটু হকচকিয়ে ছিটকে পিছিয়ে গেলাম। সেই দেখে চারপাশে হাস্যরোল। তারপর প্রায় মিনিটখানেক ওই যোদ্ধা লিণ্ডার সামনে দাঁড়িয়েই পা মাটিতে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘুঙুরেব ঝংকার তুলে দাপাদাপি করলো। চারপাশের দর্শকবা তালে তালে হাততালি দিল।

খালিকের ভালো লাগলো সেই নাচ। আমারও। কোথায় যেন পুরুলিয়ার ছৌ নাচের সঙ্গে এই নাচের একটা মিল। মিলটা হয়তো নাচে নয়, মানুষে। সহজ, অনাড়ম্বর পিছিয়ে পরা মানুষ—তাদের সহজ ভাবে দেখা জীবন ও রাজনীতি। সবকিছুই গানের আর নাচের খোলসে।

আমি বললাম, "দেখে ভালো লাগলো যে ফরাসীয়ানার ঢেউয়ে এখানকার লোকসংস্কৃতি ভেসে যায় নি। আমার ভয় হয়েছিল পপ গানের আসর বসবে। কালকের টিনসেল পার্টির গ্ল্যামারের পর আজ যেন অনেকখানি খাঁটি আইভরী কোস্ট দেখতে পেলাম। অবশ্য ফরাসীদের সঙ্গে মিতালীর বক্তব্যটা ভালো লাগলো না। হোটেল ইভয়ার থেকে না বেরিয়ে এ জিনিস দেখবো বলে ভাবি নি। এ জিনিস ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখা যায়।"

লিণ্ডা চুপ করে থাকলো।

খালিক বললো, "কিছুদিন আগে দিল্লীর অশোকা হোটেলে রাজস্থানী নাচের একটা প্রোগ্রাম ছিল। আমি অবশ্য যাই না এসবে, কিন্তু বউয়ের পাল্লায় পড়ে গেলাম। ভারী চমৎকার লাগলো। এই নাচের সঙ্গে অবশ্য সেভাবে মিল নেই, কিন্তু কোথায় যেন একটা ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রয়েছে।"

অন্তত এই একটা প্রশ্নে আমার সঙ্গে খালিকের কোন বিতর্ক হলো না। কিন্তু লিণ্ডা তখনও নিশ্চুপ।

"কি হলো, তোমার কোন মতামত নেই এই ব্যাপারে?" জিগ্যেস করি।

লিণ্ডা বললো, "আছে, তবে বলতে দ্বিধা লাগছে। তোমরা দুজন ভুল বুঝতে পারো।"

আমরা দুজনই ওকে চেপে ধরলাম, বলতেই হবে। ততক্ষণে নাচের অঙ্গন ছেড়ে, হোটেল ইভয়ার ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে লেগুনের ধারে পৌঁছেছি। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না—তবু ঠাণ্ডা জলের হাওয়া গায়ে আসে।

লিণ্ডা বলে, "একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেবার অস্ট্রেলিয়া গেলাম। আমার এক কাকীমা সেখানে থাকেন। বললেন, চল মাওরিদের উৎসব দেখে আসি। শুনে আমি খুশী। তোমাদেরই মতো। দেখতে গেলাম সেই উৎসব। বিরাট স্টেডিয়াম, কয়েকদিন ধরে উৎসব চলছে। গ্যালারি ভর্তি মানুষ—শুধু অস্ট্রেলিয়ান নয়, আমেরিকান, বৃটিশ সবাই আছে, ওদের মধ্যে উৎসবের মেজাজ। মাওরিরা নানারকম খেলা আর নাচ দেখালো। খালি গায়ে বল্লম নিয়ে, তীর-তাক করে, কড়ি-পুঁতি-আর দশ রকম জঙ্গলের জিনিসের মালা পরে। মুখে গায়ে রঙ মাখানো। যুদ্ধের নাচ, পুজোর নাচ, বিয়ের নাচ, বড় হবার নাচ, কৃষির নাচ। ওরা খাচ্ছে, আর বিয়ারের ক্যান হাতে ভুঁড়ি ফোলানো ক্যামেরা ঝোলানো সাদা টি-সার্ট পরা দর্শকরা হাততালি দিচ্ছে, চিৎকার করছে। কেউ বলছে, 'গ্র্যাণ্ড', কেউ 'গ্রেট', কেউ 'সুপার', কেউ 'ফাইন'। মাঝেমধ্যেই ক্যামেরায় ফ্লাশের আগুন, ক্লিক শব্দ। দেখতে দেখতেই ওরা ফ্লাস্ক থেকে কফি খাচ্ছে, ব্যাগ থেকে বের করে স্যাণ্ডউইচ মুখে পুরছে। নানা ধরনের মন্তব্যও চলছে, অধিকাংশই অ্যানাটমিক্যাল। সেগুলো নাই বা বললাম।"

লিণ্ডা থামলো। একটা ঢিল ছুড়লো জলে। সেই নিস্তব্ধতায় শব্দটা ভালো করেই শোনা গেল। দূরে তখনও হোটেল ইভয়ারের বাগানে যুদ্ধের বাজনা চলছে।

তারপর বললো, "ওই দেখার পর থেকে আমার দু রকমের অনুভূতি হয়। একটা হচ্ছে তোমরা যেমন বললে সেইরকম। ওদের মতো করে জিনিসটাকে দেখে। এটা একটা লোক সংস্কৃতি—সহজেই হারিয়ে যেতে পারে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত পৃথিবীকে এক ছাঁচে তৈরী করা ঠিক না। ইতিহাস বাদ দিয়ে কোন সমাজ চলতে পারে না। ওই লোক সংস্কৃতি এক কালের জীবনের আলেখ্য। এই হচ্ছে চিন্তার একটা দিক। আজ তাই, সত্যি বলতে, খুব ভালোই লাগছিল ওই নাচ।"

আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, "বোরড হচ্ছো নাতো ?"

"না, না, বল।"

লেগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে লিণ্ডা বলে, "তারপর ভাবি, আমি অস্ট্রেলিয়ার ওই মাওরি উৎসবের সাদা দর্শকের চোখ দিয়ে দেখছি না তো ? ওরা কি নাচ দেখে আনন্দ পায় না ? হয়তো খানিকটা। কিন্তু আমার মনে হয়, তার থেকে অনেক বড় আর একটা অনুভূতি। যার জন্য ওরা অপেরা, সিনেমা, ফুটবল বা ঘোড়দৌড় ছেড়ে ওখানে যায়। ওরা খুশী হয় দেখে, ওই মাওরিগুলো কি প্রিমিটিভ, নগ্ন, বল্লম তীর ধনুক নিয়ে নাচে, মুখে অদ্ভুত রঙ দিয়ে ভূত হয়, মুখোস পরে। ওরা আমাদের মতো সভ্য নয়। আমরা কতো এগিয়ে। আমাদের নাচ ওইরকম কতোগুলো সীমাবদ্ধ হাত-পা দোলানো বা অঙ্গভঙ্গী নয়, আমাদের গান একই সুরের পুনরাবৃত্তি নয়। আমাদের কালচার আছে, সিভিলাইজেশন আছে। আমার মনে হয় ওই লোকগুলোর সেইটাই ভালো লাগে, এবং তফাৎটা বুঝবার জন্য দলে দলে ভীড় করে দেখতে আসে।"

লিণ্ডা বলেই চলে, "তারপর যারা নাচছে তাদের কথা ভাবো। নিজেদের সমাজে নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী নাচলাম সেটা একরকম। কিন্তু এটা তো পেশাদারী পারফরমেন্স—শ্রোতার মন জয় করবার জন্য। সেই শ্রোতা কে ? ইউরোপীয়, পুরনো ঔপনিবেশিক মালিক, বা আমেরিকান। তোমাদের মতো কয়েকজনের কথা বাদ দাও। ওই যে যুদ্ধের উপাখ্যান দেখলে সেটা কি ওই বিদেশী দর্শকদের কথা ভেবেই তৈরী হয় নি ?"

লিণ্ডা জলে আর একটা ঢিল ছুড়ে বললো, "এইসব দেখেই তো দেশ ছাড়লাম।"

"দেশ ?" অবাক হয়ে জিগ্যেস করি, "তুমি তো বৃটেনেই আছো ?"

"হ্যাঁ, বৃটেনে আছি এবং বৃটিশ", লিণ্ডা হাসে।

"তবে দেশ ছাড়বার ব্যাপার কি বললে ?" খালিকের প্রশ্ন।

"ঠিকই শুনেছো। আর একটা দেশে আগে ছিলাম। এখন বৃটিশ।" লিণ্ডার মুখে রহস্যময় হাসি।

"সে কোন্ দেশ ?"

"শুনলে হার্টফেল করো না।" লিণ্ডার রহস্য বেড়েই চলেছে, "দক্ষিণ আফ্রিকা। কি হলো, সরে বসছো কেন ? আমি কি করলাম ? আমার জন্মটা তো আর আমার হাতে ছিলো না !"

অবাক হবারই কথা। হার্টফেল হবার বয়স অবশ্য নেই। পৃথিবীতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। কিন্তু লিণ্ডা ? দক্ষিণ আফ্রিকা ?

সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া হয়তো ওইরকমই স্বাভাবিক। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তো নতুন নয় ! আমার বেশ কিছু বন্ধুই প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকান, রেকি কাপলিনস্কি, মার্গো রাসেল, জেফ ল্যাম্ব, এ রকম অনেকের কথাই মনে পড়ছে যারা জন্মসূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকান, কিন্তু সেই বন্ধন বড় হয়ে ছিড়েছে, বৃটিশ বা অন্য কিছু হয়েছে।

"শকটা যদি সামলে নিয়ে থাকো তাহলে বলি দক্ষিণ আফ্রিকার কথা।" লিণ্ডা বলে, "ওখানেও বড ট্যুরিস্ট শিল্প আছে। প্রচুর মানুষ যায় পশুপাখী দেখতে, কেউ কেউ আরো যায় প্রিমিটিভ আফ্রিকান দেখতে। ট্যুরিস্টদের এরা গ্রামে নিয়ে যায়, সেখানে বুক-খোলা, অসংখ্য বালা-চুড়ি হাতে, গলাবন্ধ, মাথায় ঢাকনা পরা পুবনো সাজের মেয়েদেব এক্সিবিট হিসাবে দাঁড় করায়—ট্যুরিস্টরা বড বড চোখ করে দেখে। হোটেল ইভয়ারে এই নাচ সেইবকমই অশ্লীল মনে হয়। তার থেকে বরং তোমার ভাষায় "খৃস্টমাস পার্টি" এখানে মানায় বেশী।

॥ চার ॥

হোটেল ইভয়ার হয়তো আইভরী কোষ্টের সবচেয়ে দ্রষ্টব্য বস্তু। কিন্তু ওই হোটেলের আলোকসজ্জা, টেন-পিন বোলিং, গ্যাম্বলিং ক্লাবের হুইল, প্রশস্ত লনের নৃত্যানুষ্ঠানের বাইরেও একটা বড় জগত আছে।

সেই জগতটার দেখা পেলাম পরদিন, অন্তত খানিকটা, যা না দেখলে আইভরী কোষ্টের ধারনায় অনেকখানি ভুল থেকে যেতো। উদ্যোক্তারাই ব্যবস্থা করেছিল ট্যুরের। এবং অন্য সবকিছুর মতো এ ব্যাপারেও মূলত সরকারী ব্যবস্থাপনায়। আমাদের ভি-আই-পি-ত্ব সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থেকেও ছিল, সেটুকু উবে গেল সুদৃশ্য, বিশাল, এয়ার কণ্ডিশনড লাক্সারী বাসগুলো দেখে।

এত মানুষ তো আর একসঙ্গে যেতে পারবে না। তাই আট-নটা আলাদা ট্যুরের ব্যবস্থা। প্রথম দিনই জানাতে হয়েছে, কার কোন্ ট্যুর পছন্দ। আমি পছন্দ করলাম বাগিচা দেখা।

সেদিন সারাদিন ঘুরলাম। আমরা পছন্দটা ঠিকই হয়েছিল—কেননা ঘুরতে গিয়ে বুঝলাম আবির্জঁ আর হোটেল ইভয়ারের জৌলুষ কোন সম্পদের ওপর দাঁড়িয়ে।

পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর মতোই আইভরী কোষ্টকেও প্রাকৃতিকভাবে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। আবির্জঁ সমুদ্রের উপকূলে, একেবারে সমতলে, যেখানে লেগুন, খাড়ি আর নালার জাল ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ধরে। তার ঠিক উত্তরেই ট্রপিকাল ফরেস্ট অঞ্চল—যেখানকার জঙ্গল খুবই ঘন। আমরা ভালো রাস্তা দিয়ে গেলাম, কাঁচের জানলা দিয়ে জঙ্গল দেখলাম। এই দেখাটা মোটেই সম্পূর্ণ নয়, কেন না জঙ্গলে না ঢুকে বোঝা যায় না ধরনটা কি। অথচ ঢোকাটাও সহজ নয়, হারিয়ে যাবার ভয় প্রতিপদে।

এই অঞ্চলটায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সময় মনে হতে পারে আকাশ ফুটো ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। এত বৃষ্টির একটা খারাপ দিকও রয়েছে। বৃষ্টিতে প্রতি বছরই মাটির ওপরতলার অনেকখানি সার ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, উর্বরতা কমছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলে 'লিচিং'। অনেক জায়গাতেই মাটি এখানে লাল্‌চে হয়ে আসছে এর ফলে। সরকারী পরিকল্পনার এই এক বড় মাথাব্যথা।

জঙ্গলের মধ্যে নানা গাছ—আমি চিনিও না। অরণ্যই এখানকার এক বড় সম্পদ। আফ্রিকার মধ্যে অরণ্য সম্পদের আয়ের বিচারে আইভরী কোষ্ট দ্বিতীয়।। ভালো কাঠের মধ্যে রয়েছে মেহগনী আর আফ্রিকান টিক। চিরসবুজ, শক্তিশালী, শক্ত দুই গাছ, বিশেষ করে ভালো লাগে মেহগনীর লাল-বাদামী পরিপক্কতা, বড় পাতার চারপাশে পালক-সম ছোট ছোট পাতার গুচ্ছ। টিক মূলত ভারত আর বার্মার গাছ, কিন্তু এখানেও এক বিশেষ ধরনের টিক হয়।

জঙ্গল রয়েছে, কিন্তু প্রাণী কোথায়? নাম যখন আইভরী কোষ্ট, নিশ্চয়ই একসময় প্রচুর হাতী এখানে ছিল, এখনও আছে, তবে জঙ্গল ফুঁড়ে দেখা শক্ত। ওরাই বা রাস্তার ধারে আসবে কেন? নানারকম জন্তু জানোয়ার শুনলাম এখানে আছে। মজার, এবং নতুন ধরনের কিছু

জন্তুরও তল্লাস পেলাম। যেমন বঙ্গো, লাল-বাদামী থেকে কালচে-লাল-বাদামী গায়ের রঙ, চামড়া শক্ত না হলেও যেন গণ্ডারের মতো ঝুলে ঝুলে পড়েছে। আর সবচেয়ে চোখে লাগার মতো, সমস্ত গা ভর্তি পর পর সাজানো যেন চক-খড়ি দিয়ে আঁকা অনেকগুলো সাদা রেখা। জিব্রার মতো দাগগুলো চওড়া নয়। হরিণের মতোই, শিংওলা চেহারা। আর আছে ছোটখাটো কাল্চে এক ধরনের হিপো, যারা জলার মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে—যাদের নাম 'পিগমী-হিপো'। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলাম ম্যানাটির কথায়। ম্যানাটি এক অদ্ভুত প্রাণী—মাছ আর ডলফিনের সংমিশ্রণ বলে মনে হবে। ডলফিনের মতোই মাথার কাছে দুটো ফ্লিপার, শক্ত-মোটা নাক, কিন্তু মাথা ডলফিনের মতো বড়ো না। চেহারা ডলফিনের চেয়েও বড়—পনেরো ফিট পর্যন্ত হতে পারে, এবং ওজনে ছশো-সাতশো কিলো। কিন্তু বাকি শরীরটায় মাছের আদল—লেজটা চামচের মতো। ম্যানাটিরা থাকে সমুদ্রেব উপকূলের অল্প জলে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে, একসঙ্গে দল বেঁধে ঘোরে। এই অদ্ভুত জন্তুগুলোর একটাও চোখে দেখবার সৌভাগ্য হলো না।

আমাদের বেড়াবার উদ্দেশ্য জঙ্গল দেখা নয়। দেখতে চাই জঙ্গল পার হয়ে বাগিচা, যেখানে জঙ্গল সাফ করে কফি আর কোকোব চাষ হচ্ছে। দুদিকে যতোদূর চোখ যায় লাইন কবে পব পর সাজানো গাছ, দিগন্তের একদিক থেকে অন্যদিক ঢেকে দিয়েছে। এখানকাব প্রকৃতি সাজানো-গোছানো, জঙ্গলের অবিন্যস্ত সহজ সৌন্দর্য নেই, তবু এই সুশৃঙ্খল কৃষি ব্যবস্থারও একটা নিজস্ব রূপ আছে। এখানকাব ল্যাণ্ডস্কেপ মানুষ আর প্রকৃতি একসঙ্গে হাত মিলিয়ে তৈরী করেছে।

লিণ্ডার সমস্ত কিছু পরিসংখ্যান মুখস্থ। গড় গড় করে বলে গেল, "কোকোতে আইভরী কোষ্ট পৃথিবীর তিন নম্বর দেশ, কিন্তু এখানকার জমির অনেক বেশী অংশ কফির চাষে লাগে। লোকও লাগে অনেক বেশী। কফিতে বিশ লক্ষ, কোকোতে দশ লক্ষ মানুষ। এই দুটোই বলতে পারো এখানকার মানুষের মূল কাজ।"

আর শুনলাম কোলা-নাটের কথা। বড় বড় বাদাম, পশ্চিম আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই হয়, কিন্তু ঘানার পরেই উৎপাদন আইভরী কোষ্টে বেশী। আর আছে পাম তেল, কলা আর নারকেলের গাছ।

এত ধরনের গাছ, ঘন করে প্রতিটি ইঞ্চিতে লাগানো, সবুজে সবুজে ভরে দিয়েছে চারদিক। এখানকার জমিতে উঁচু-নীচু ভাব বিশেষ নেই, উত্তরের এবং পশ্চিমের দিকের সামান্য অংশ বাদে। তবু চলতে গিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার সমতলভূমির একঘেয়েমি দেখি না—গাছেব রঙ, বাহার আর উচ্চতার তারতম্যে অনেকখানি বৈচিত্র্যের স্বাদ। ওরা নিয়ে গেল রিসার্চ সেন্টারে, যেখানে নানা দেশের নানা জাতের নারকেল আর কলা গাছ মিলিয়ে নতুন জাতের গাছ তৈরী হচ্ছে।

জঙ্গল আর বাগিচার উত্তরে সাভানা-ঘাসের বন। সেখানে বৃষ্টি কম, কিন্তু মানুষও কম, মাঝে মধ্যে গাছ আর ঝোপ। যতো উত্তরে যাবে ততো বৃষ্টি কমবে, গাছ কমবে, ঘাসগুলো ছোট হয়ে আসবে, এবং মানুষও কমবে। সেখানে বছরের এক বড় অংশ ধরে দারুণ হাওয়া বয়—উত্তর-পূর্বের 'হার-মাটান।'

আজকাল দক্ষিণের জঙ্গল বা উপকূলেই ভীড়, সাভানা থেকে মানুষ দক্ষিণে নামছে—যে প্রবণতা পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও দেখেছি, কারণটাও একই—বাণিজ্য বাড়ছে, বাগিচা হচ্ছে, কাজের সুযোগ বাড়ছে।

"অথচ এক সময় সাভানাই ছিল সব, জঙ্গলে কেউ থাকতো না।" লিণ্ডা বলে। লাম্বারী

এয়ার কণ্ডিশনড কোচ জঙ্গল ভেদ করে আমাদের নিয়ে ফিরে চলেছে।

"জঙ্গলে থাকবে কেন বলো ?" লিশু বলে চলে, "কতো অসুবিধে। পথ নেই। বৃষ্টি হলে হাঁটাচলা আরও শক্ত। যোগাযোগ রাখা যায় না। তারপর জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করার পরিশ্রম অনেক। একবার পরিস্কার করলেই হবে না, বারবার জঙ্গল ফিরে আসবে। কয়েক মাস না দেখলেই, ব্যস, যে কে সেই জঙ্গল। এর সঙ্গে সাপখোপ হাতি অন্য জন্তুদের ঝামেলা তো রয়েছেই। ওদের কাছে নিয়মিত জঙ্গল সাফ করবার যন্ত্রপাতিও ছিল না। জঙ্গলের জনপদগুলোও ছিল খুব ছোট ছোট এবং বিচ্ছিন্ন। কোথাও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে একটু পরিস্কার যায়গা সেখানে লোকেরা চাষ করে থাকতো। সংখ্যা বেশী ছিল না।"

"সেই অসুবিধে কি সাভানায় নেই ?" জিগ্যেস করি।

"আছে, তবে অনেক কম। যাতায়াত অনেক বেশী সহজ, বৃষ্টি কম, আড়াল কম। কৃষির কাজ অনেক সহজ। ঝোপ কেটে পুড়িয়ে বসে গেলেই হলো। জঙ্গল কাটবার মতো শক্ত কাজ না।" লিশু বলে।

"কিন্তু জমির উর্বরতা—সেটা কি সাভানায় একটু কম না ? তারপর বৃষ্টিও তো কম। ফসলের ফলন কি ভালো হবে ?"

"উর্বরতা কম নিশ্চয়ই," লিশু বলে, "কিন্তু জমি প্রচুর বলে এই সমস্যাটা এখানে বড় না। ওরা একবার জমি চাষ করে দশ থেকে কুড়ি বছর ফেলে রাখে, তারপর আবার ওই জমিতে ফিরে আসে। এতদিন ছুটি পেয়ে জমির উর্বরতা ফিরে আসে। আজকাল অবশ্য লোকের চাপ বেড়েছে। জমি এতদিন আর ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু আগে তো লোক ছিল দারুণ কম।"

"ওরা কি বানাতো ?"

"বলতে পারো খাবার জন্য যা দরকার সেইটুকু। এমন শস্য যা অল্প বৃষ্টিতে হবে, যার জন্য যত্ন লাগবে না, খরার সময় বেশী ঝামেলা হবে না। ভুট্টা, ছোলা ইয়াম ম্যানিওক বা কাসাভা, এই সবই সাধারণ চাষী এখনও তৈরী করে নিজের জন্য। জল যেখানে জমে সেখানে অনেকে ধান বানায়।"

পরিবর্তনটা এসেছে, লিশু বলে, যেহেতু এখন উৎপাদনের এক বড় অংশ চাষীর খাবার নয়, বাণিজ্যের জন্য। কফি, কোকো, কলা, নারকেলের সিংহভাগই যায় বিদেশে. ফ্রান্সে, ইউরোপের অন্যান্য দেশে। বিদেশী মুদ্রা আনে, যার বিনিময়ে আসে ইউরোপের শিল্পজাত দ্রব্য। এই পরিবর্তনটা এনেছে ফরাসীরা—ওদের কোম্পানীগুলো।

বাগিচা বাড়ছে, বাগিচার জন্য শ্রমিক চাই। সেই শ্রমিক আসছে সাভানা থেকে, আফ্রিকার অন্য দেশ থেকে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে উপকূলের শহর ও গ্রামে মানুষ বাড়ছে। ঝোঁক তাই দক্ষিণ দিকে যাবার।

বাগিচা যেন সুবজ-সোনা। সেই সোনার ছোঁয়া কোকোডীর ভিলার আলোকসজ্জায়, হোটেল ইভয়ারের আইস-রিংকে জমাট বাঁধা বরফে, ছোট নদীর মতো সুইমিং পুলে।

বিকেলে একটা রেষ্ট হাউসের কাছে গাড়ী থামলো। উচু টিলার মতো একটা জায়গা। সেখানে চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। দূরে বাগিচা আর তার পিছনে জঙ্গল। খানিকটা বৃষ্টি পড়লো। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দেখি সেই বৃষ্টিতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন, লাফাচ্ছেন আর হাসছেন। উনি কে ? ফরাসী ইণ্টারপ্রেটার শ্রদ্ধার সঙ্গে বললো, *"রেনে দুমোঁ"* বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী।

আমাদের আলোচনা তখনো চলেছে। খালিক, লিশু, নর্মান আর আমি।

খালিক বলে, "তুমি আসল কারণটাই বলছো না লিশু। এদের স্বাচ্ছন্দ্যের এক বড় কারণ,

এত জায়গা, এত অল্প মানুষ। ভারতবর্ষের মতো এত লোক হলে অতো বাগিচা করেও ওরা পারতো না, এবং করাও যেতো না, কেননা খাবারের জন্য জমি লাগতো।"

সঙ্গে সঙ্গে লিণ্ডার আরও কিছু পরিসংখ্যান পেলাম। ১২৫৭৮০ বর্গ মাইল আয়তন, ঘানার চেয়ে বড়, এক-তৃতীয়াংশ বেশী, অথচ লোক পঞ্চাশ লক্ষ, ঘানার প্রায় আদ্ধেক।

আমিও মনে মনে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা কবে দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চারগুন, কিন্তু লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের এক-দশমাংশ। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে লোকের চাপ প্রায় চল্লিশ গুণ বেশী।

নাইজিরিয়া, এবং কিছুটা ঘানা বাদ দিলে সাধারণভাবে পশ্চিম আফ্রিকাব এইটাই অবস্থা। জমি বেশী লোক কম। অনেক সময় লোক না থাকাটাই সমস্যা। এই অঞ্চলে লোক যেখানে বেশী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, আধুনিকীকরণও হয়েছে সেখানে বেশী। এত মানুষ এক জায়গায় থাকলে কতোগুলো জিনিষেব বাজার তৈরী হয়, উন্নতি করা যায়। বাস্তা-ঘাট, জলের ব্যবস্থা—এ সবও তখন করাটা পোষায়।

"তুমি দেখবে পশ্চিম আফ্রিকাব অনেক দেশই চাইছে লোক আর একটু বাড়ুক। অথচ জন্মহার শতকরা তিন ভাগেব মতো, তোমাদেব ভাবতের থেকে ঢেব বেশী। কিন্তু জায়গার তুলনায় লোক এখনও কম। আইভরী কোষ্ট, ক্যামেরুন—এরা তাই জন্ম নিযন্ত্রণ চায় না। নক্রুমারর সময় ঘানাও চাইতো না।"

পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে নাইজিবিয়াই যেন এক বড ব্যতিক্রম। নাইজিবিযা, হাজারো বকমের সমস্যা নিয়ে, আমাদের খুব কাছেব। আইভরী কোষ্ট, সেনেগাল, লাইবেরিয়া—এ সব যেন গ্রহান্তরের দেশ, এখানকার অর্থনীতি অন্য নিযমে চলে।

আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে চেষ্টা চলছে, গ্রামিনীকরণেব বা 'ভিলেজাইনেশনে'র। টানজানিয়ার 'উজামা' আন্দোলন সেই প্রচেষ্টাবই নেতৃত্বে। এখানেও কাবণটা আমাদেব দেশেব অধিকাংশ জায়গার অবস্থার থেকে আলাদা। তবে আমাদের দেশেও এক সময ওইবকম ছিল। গ্রামগুলো ছিল ছোট ছোট, ছড়ানো। উত্তর বঙ্গে এই শতাব্দীব প্রথম দিকে এইরকমই ছিল। আফ্রিকার অনেক দেশই এখন চাইছে গ্রামগুলো বড় বড় হোক। তাতে প্রশাসন এবং অর্থনীতি দু দিক দিয়েই ভালো।

নর্মান অবশ্য বলে, "কারণটা অর্থনীতিও নয় প্রশাসনও নয়, পরিস্কাব রাজনীতি। এই যে সব বড় বড় নেতারা, সেংগোর, হুফে বইনি, এদের সবচেয়ে বড দুঃখ, ওদের দেশগুলো বড্ড ছোট, আয়তনে ততোটা নয় যতোটা লোকসংখ্যায়। এত কম লোক যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে ওদের কেউ পাত্তা দেয় না। অথচ এরা দুজনই চায় আফ্রিকার নেতা হতে। আইভরী কোষ্ট অবশ্য যথেষ্ট স্বচ্ছল, কিন্তু তাই বলে তো লিবিয়া হতে পারে নি। আর লিবিয়াকেও যদি ধরো, ওরাও চাইছে বড় হতে। চেষ্টা হচ্ছে কখনো টিউনিশিয়া, কখনো ইজিপ্ট বা কখনো চাদের সঙ্গে জুড়ে লোকসংখ্যা বাড়াবার। সংখ্যার রাজনীতি এখানেও আছে, তবে কায়দাটা হয়তো অন্যরকম।"

লিণ্ডা বলে, "আফশোস থাকলো, এত উকিঝুঁকি মেবেও রাষ্ট্রপতির মুখ দেখতে পেলাম না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এদের তো কাছ থেকে দেখবার সুযোগ নেই। এখানে দু দুবার পেলাম, কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগলো না।"

নর্মান বলে, "কি দেখতে বলো ? একজন কালো ফ্রেঞ্চম্যান, বলতে পারো ফ্রেঞ্চের থেকেও ফ্রেন্চ, সেংগোরের জমজভাই। অটোক্রাট, কারোকে উঠতে দেবে না। সত্তরের বেশী বয়স—কিন্তু সবকিছু হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ফরাসীরা অবশ্য ওকে খুব ভালোবাসে। ও

হচ্ছে 'আফ্রিকার মিরাকল' আইভরী কোস্টের জনক।"

ফরাসী-প্রভাবিত আফ্রিকায় প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স হুফে বয়নির সঙ্গে তুলনা করবার মতো একজনই আছেন—তিনি হলেন ডাকারের প্রেসিডেন্ট সেংগোর। দুজনই পাশ্চাত্য-ঘেঁষা, রক্ষণশীল,, রেষারেষিও দুজনের মধ্যে কম না। যেখানে তফাৎ—হুফে বয়নির মধ্যে সেংগোরের নিগ্রোত্ব বা সমাজতন্ত্রের খোলসটাও নেই। আইভরী কোস্ট আফ্রিকার সবচেয়ে খাঁটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যে ধনতন্ত্রের বনিয়াদ শিল্প নয়, কৃষিপণ্য, এবং যে ধনতন্ত্র চালায় ফরাসী মেট্রোপলির বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এখানকার তুলনায় সেনেগালের ধনতন্ত্রকে বাদাম বলেই মনে হবে। হুফে বয়নি দরাজ হাতে তার দেশের অর্থনীতিকে ফরাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ফরাসীরাও টাকা খাটাতে কার্পণ্য করে নি। এই দেশে তাই রোজই প্যারিস থেকে প্লেনভর্তি কোম্পানীর লোকেরা আসছে। দেখে-শুনে মনে হতে পারে যেন, দূরত্ব সত্ত্বেও, এখনও আইভরী কোস্ট ফ্রান্সেরই অংশ। সরকারের প্রশাসকদের মধ্যে এবং রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পরামর্শদাতাদের মধ্যে রয়েছেন বেশকিছু প্রভাবশালী ফরাসী।

এখানকার এক বড়ো চীফের সন্তান, ফেলিক্স ফ্রান্সে গিয়ে ডাক্তার হন, এবং আইভরী কোস্টের বাগিচায় প্রচুর টাকা ঢেলে ভীষণ বড়লোক হন। রাজনীতি করতে শুরু করে তৈরী করেন আফ্রিকান বাগিচা-মালিকদের পার্টি, যাদের সঙ্গে ফরাসী বাগিচা মালিকদের ঝগড়া ছিল। ১৯৪৫ সালে উনি তৈরী করলেন পি-ডি-সি-আই, যার মানে আইভরী কোস্টের ডেমোক্রাটিক পার্টি, এবং যে কথা এখন বললে বিশ্বাস করা শক্ত, পাঁচ বছরের মতো সময় ওই পার্টি ছিল ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টির অনুমোদিত দল। কিন্তু কিছু দিনেব মধ্যেই উনি পথ ঠিক করে ফেললেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ফ্রেঞ্চ এ্যাসেম্বলীর সভ্য, ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ, পরবর্তী কালে আবিজঁর মেয়র, ফরাসী সরকারের একজন মন্ত্রী। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের কথা তিনি বলেন না—তাই নিখরচায়, বিনা রক্তপাতে, ১৯৬০ সালে ফরাসীরা আইভরী কোস্টকে স্বাধীনতা দিল, যখন ফেলিক্সের বয়স পঞ্চান্ন। তখন থেকেই তিনি ক্ষমতায়, আর কোন দল এখানে নেই।

॥ পাঁচ ॥

ভোর না হতেই ডাডলী সেজেগুজে তৈরী। আমাকে ফোন করলো। ব্রেকফাস্ট খেতে গেলাম, অন্যদের অনেক আগেই। ভীড় তখনো হয় নি। ব্রেকফাস্ট টেবিলে টমি বালোও

বৃটিশ অর্থনীতিবিদদের জগতে টমি বালো এক পবিচিত নাম। লেবার পার্টির দীর্ঘদিনের উপদেষ্টা, ভারতেও বহুবার এসেছেন এবং পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করেছেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। আবির্জ-এর এই সময়টায় বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী, তবে এই সম্মেলনে মন্ত্রী হিসাবে আসেন নি।। বেশীদিন মন্ত্রী ছিলেনও না। ঝগড়াটে, রুক্ষভাষী বলে দুর্নাম। হুটহাট কথা বলে দিতেন। এমন মানুষের পক্ষে বেশীদিন মন্ত্রী থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া বৃটিশ রাজনীতির বিচারে চিন্তাধারার দিক থেকে অনেকখানি বামপন্থী।

ডাডলী জিগ্যেস করলেন, "তোমার মন্ত্রীত্ব কেমন লাগছে ?"

টমি বালো মুখ বিকৃতি করে উত্তরটা জানালেন। তারপর টেবিলের ওপর রাখা কাঁটা-চামচ নাড়তে নাড়তে বললেন, "একটাই ভালো দিক। আমাদের বৃটিশ সিভিল সার্ভেন্টরা খুব ভালো ব্রিফ তৈরী করতে পারে। মন্ত্রী হবার এটাই সুবিধে। ওদের বললাম, আইভরী কোষ্টকে নিয়ে একটা ব্রিফ দাও, দ্যাখো পাঁচ পাতায় সব লেখা আছে। তুমি যা জানতে চাও সব। রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রপতি, ওদের দলের মধ্যে ঝগড়া থেকে, ভালো রেস্টুরেন্ট, নাইট ক্লাব সব কিছুর হদিশ পাবে মাত্র এই ক পাতায়। আমরা এ্যাকাডেমিকরা ছোটখাটো যা ধরি থিসিস করে ফেলি। ওদের এই গুণটা আমাদের আয়ত্ব করা ভালো।"

টমি বালো বৃটিশ অর্থনীতিবিদ, মন্ত্রী। কিন্তু আদপেই বৃটিশ নন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই দুজন হাঙ্গেরিয়ান-এর নাম বৃটেনে পবিচিত। নিকোলাস ক্যালডর আর টমাস বালো। হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্টের মধ্য দিয়ে ড্যানিউব নদী—আসলে দুটো শহর 'বুদা' আর 'পেস্ট' এক করে তৈরী। বৃটিশ অর্থনীতিবিদরা ঠাট্টা করে ক্যালডরকে বলতো 'বুদা' আর বালোকে 'পেস্ট'। ক্যালডরও ভারতে বহুবার এসেছেন, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে। ক্যালডরের সুপারিশেই ভারতে সম্পদ-কর, ব্যয়-কর, ক্যাপিটাল গেইন্স-কর ইত্যাদির আলোচনা ও প্রচলন হয়। ক্যালডরকে কখনো দেখি নি, কিন্তু ওর দুই মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে—একজন সাসেক্স আরেকজন অক্সফোর্ডের অধ্যাপিকা।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমোশন খুব জলদি—লেকচারার থেকে রীডার, রীডার থেকে প্রফেসর এবং সাধারণ ভাষ্যে অধ্যাপক মানেই প্রফেসর। বৃটেনে প্রফেসরের পদ কম, আগে আরও কম ছিল। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজে সারা জীবন পড়িয়েও, প্রচুর নাম করেও প্রফেসার হওয়া যেতো না। নিকোলাস ক্যালডর কখনও প্রফেসর হন নি।

একবার ভারতের এক সভায় যিনি উদ্যোক্তা তিনি নিকোলাস ক্যালডরকে পরিচয় করিয়ে দেন, "প্রফেসর ক্যালেডর" বলে। উনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন 'না'।

অপ্রস্তুত উদ্যোক্তা বলেন, "ডক্টর তখন বলেন, "ডক্টর ক্যালডর।"
উনি আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, "না। আমি ডক্টরেট করি নি।"
প্রফেসর নয়, ডক্টর নয়, এ কেমন মনীষী ? উদ্যোক্তা হতাশ হয়ে বললেন, "তবে কি বলবো ?" উত্তর, "বলুন মিঃ ক্যালডর।"
টমি বালো জাতে হাঙ্গেরীয়ান, পরে বৃটিশ, রাজনীতির জগতেও বিচরণ করেন। ওকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন 'লাইফ পিয়ার' করে হাউস অফ লর্ডসের সদস্য করলেন। পরিচয় হলো লর্ড বালো। গল্প আছে, দীর্ঘদিন পরে উনি যখন ওঁর পুরনো হাঙ্গেরীর গ্রামে বেড়াতে গেলেন, তখন গ্রামের লোকেরা ওঁকে অভ্যর্থনা দিলো। সেখানে আলাপ করিয়ে দেয়া হলো, "লর্ড বালো"র। 'লর্ড' কথাটা ওখানে অবশ্যই অপরিচিত। সেই শুনে ওরই এক ঘনিষ্ঠ খুড়তুতো ভাই সখেদে বললেন, "টমি ইংলণ্ডে গিয়ে অনেক নাম করেছে বড় হয়েছে শুনলাম। সে সবই ভালো কথা, আমরাও খুশী। কিন্তু তাই বলে পিতৃদত্ত 'টমি' নামটা পাল্টে 'লর্ড' করতে হবে ?"
টমি বালোকে জিগ্যেস করি, "আপনার ব্রিফ আইভরী কোষ্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি বলে ?"
উনি বলেন, "তুমি এতদিন ইংলণ্ডে থেকেও বৃটিশদের চেনো না। আমাদের সিভিল সার্ভেন্টরা কি তোমাদের মতো দুমদাম ভবিষ্যদ্বাণী করবে ? ওরা বরং বলবে এখানে বৃটিশ বাণিজ্যের সম্ভাবনা কি, কি বিক্রী করা যাবে, কোন্‌টা ওরা কিনবে। বা বলবে, এখানে কি কাঁচামাল পাওয়া যায় যা বৃটেনের কাজে লাগবে। বা জানাবে হুফে-বয়নিকে হাত করতে হলে কি উপহার দেবে, কার মাধ্যমে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ভবিষ্যৎ আমাদের ভেবে কি হবে ?"
আবার জিগ্যেস করি, "কিন্তু ওরা যে বলছে আইভরী কোষ্ট একটা 'মিরাকল'। আফ্রিকার ভবিষ্যতের দিকদর্শন।"
"মিরাক্‌ল ?" টমি বালোর মুখে বিদ্রুপের হাসি, "ষাটের দশকে তো পাকিস্তান ছিল এশিয়ার মিরাক্‌ল। তারপর কি হলো ? এখন সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া মিরাক্‌ল হবার দিকে। কিন্তু এর মধ্যে অনেকখানিই কাকতালীয় যোগ। আইভরী কোষ্ট ফরাসী কোম্পানীদের কাজে বাধা দেয় না, তাই প্রচুর ফরাসী টাকা এখানে খাটে—কিন্তু সব দেশ একই নীতি নিলে তো আর এত লগ্নী পাবে না ? তারপর এখানে মানুষ কম, প্রকৃতি অনেক বেশী দরাজ। নিজের বা মালী চাইলেও, ফরাসী কোম্পানীদের জন্য সমস্ত দরজা-জানলা খুলে দিলেও, ফ্রান্সের ষোল আনা লেজুড় হলেও, কিছু করে উঠতে পারবে না। টাকা দিয়ে তো আর মরুভূমিতে জঙ্গল তৈরী করা যাবে না। রাজনীতিটাও দেখতে হবে। মিরাক্‌ল একটা দুটোই হয়, নানা ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে। আইভরী কোষ্টের পথ সকলের জন্য না।"
ডাডলী বলে, "যদি ধরেও নিই, আইভরী কোষ্টের অর্থনীতি সফল, দুটো প্রশ্ন থাকছে। এক, নির্ভরতার প্রশ্ন। এই সাফল্য ফরাসী-নির্ভর। ফরাসীরা বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ যতোদিন চাইবে, টাকা ঢালবে, ওদের জিনিস কিনবে। কিন্তু ধরো কোন রাজনৈতিক সংঘাত হলো, বা কোন আভ্যন্তরীণ কারণে ফরাসী নীতি পাল্টালো ! তখন তো এই অর্থনীতির ভিত্তিটাই আর থাকবে না। দুই, ভবিষ্যতের কথা। কোকো আর কফি, দুটোই পানীয়। আজ পাশ্চাত্যে এই দুটোই মানুষ খায়। কিন্তু অভ্যেস পাল্টাবে না এমন কি বলা যায় ? এই তো চা, তোমাদের দেশে খায় না এমন লোক নেই, কিন্তু একশো বছর আগে কে চা খেতো বলো ! আজকাল যে কোকাকোলা, পেপসিকোলা চালু হয়েছে—আগে তো ছিল না। কি নিশ্চয়তা আছে বলো যে হঠাৎ কোন আরও নতুন, উত্তেজক পানীয় চালু হবে না ? তখন আইভরী কোষ্ট কোথায়

দাঁড়াবে ?"

ডাডলী সিয়ার্সের গবেষণার এক বড় বিষয়ই হলো, অনুন্নত দেশগুলোর উন্নত দেশের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা। উনি যেখানেই যান না কেন—এটাই হয় ওঁর জানবার এক বড় বিষয়।

টমি বালো বল্লেন, "সমস্যাটা অল্পবিস্তর সমস্ত অনুন্নত দেশেরই। বিদেশী বাণিজ্য দুটো একটা জিনিষের ওপর দাঁড়িয়ে, এবং কিনবে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশ। এই দুটো বন্ধনই ভাঙতে হবে। অনেক জিনিষ তৈরী করতে হবে, বেচতে হবে, আর পুরনো ঔপনিবেশিক গাঁটছাড়া খুলতে হবে, না হলে আজকের মিরাকল কালই বুদ্বুদ হয়ে উবে যাবে।" তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "অনেক আলোচনা হলো, আর না। তুমি আমাকে দিয়ে নিজেকে ব্রিফ করাচ্ছো। খুব খারাপ। আমি কি তোমার সিভিল সার্ভেন্ট ?"

ডাডলী সম্মেলনের সহ-সভাপতি, তাই এক বড় মার্কিনী গাড়ী সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী ওর বরাদ্দ। ডাডলীর গাড়ীতে, সম্মেলন শুরু হবার আগেই, আবিজাঁ ঘুরে এলাম।

দিনের আলোতেও লেগুনের দিকটা ভারী সুন্দর। কোথাও রূপোর মতো ঝকঝক করছে, কোথাও ছায়াবৃতা রহস্যময়ী।লেগুনের ধার দিয়ে হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়লো অসংখ্য গিরগিটি আর গোসাপ। গোসাপ দেখতে যতোটা হিংস্র আচরণে ততোটা নয়—অন্তত মানুষের কাছে। পোকারা হয়তো অন্য কথা বলবে। এক একটা বেশ বড়ো, লেজ নিয়ে তিন চার ফিট তো হবেই।

হোটেল ইভয়ার রাজধানীর এক বড়ো অংশ থেকে দেখা যায়। রাত্রিবেলা তো কথাই নেই—টাওয়ারের আলো অনেক দূর থেকে চোখে পড়বে।

ডাডলী বলে, "এ তো হোটেল নয়, মনুমেন্ট। আগেকার লোকেরা পিরামিড বানাতো, তাজমহল বানাতো। আজকাল বানায় হোটেল, অফিসবাড়ী। তুমি নাইরোবির কেনিযাট্টা সেন্টার দেখ নি ! ব্যাপারটা একই। দেশে দেশে আজকাল নানা ধরনের প্রতিযোগিতা চলে। অস্ত্রের প্রতিযোগিতা তো আছেই। তারপর স্টেডিয়াম, এয়ারপোর্ট, অয়েল রিফাইনারী নিয়েও প্রতিযোগিতা। এখন ফ্যাশন হয়েছে সম্মেলনের জন্য বড় অডিটোরিয়াম, হোটেল এই সব। দেশের মানুষ খেয়ে পরে থাকলো কি থাকলো না, তার থেকে বড় কথা বিদেশে কতটা নাম হচ্ছে। সম্মেলন-টম্মেলন করলে বিদেশে প্রভাব বাড়ে, আর সেই প্রভাবের খানিকটা দেশের মধ্যেও পড়ে। গরীব না-খেতে পাওয়া মানুষও যেন মনুমেন্ট, আলোকসজ্জা দেখে খুশী হয়, সরকারকে তারিফ করে।"

কোকোডির তিনদিকে লেগুন। সেই লেগুন পার হয়ে পশ্চিমে গেলে প্লাটো। প্লাটোই ছিল এক সময় আবিজাঁর চৌরঙ্গী, সেখানে ফরাসীরা থাকতো। এখনও অবশ্য বড়লোকরাই থাকে। কোকোডি যেন নিউ আলিপুর। হোটেল ইভয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকটা হোটেল এখানে আছে। আবিজাঁ দেখতে যারা বাইরে থেকে আসে তাদের এক বড় অংশ কোকোডিতে আসবেই। আর কিছু না হোক, হোটেল না দেখলেও, রয়েছে প্রেসিডেন্টের বাড়ী।পাঁচিল ঘেরা সেই প্রাসাদও দর্শনীয়, তবে আহামরি করবার মতো মনে হলো না।

সময় হাতে বেশী ছিলো না, তাই কোকোডি প্ল্যাটার বাইরে ঘুরতে পারলাম না। তবু একটা ধারণা হলো।

ডাডলীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমাদের গ্রুপের তেলের দামের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠলো ইতিমধ্যে নানা মতামতের ঝড় উঠেছে। এই আলোচনায় নানা-পক্ষ। উন্নত দেশ, অনুন্নত দেশ, ওপেক, সমাজতান্ত্রিক শক্তি, তেলের কোম্পানী, সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে আবার আরব-ইহুদী প্রশ্ন চলে এল, প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে, পরে একটু প্রত্যক্ষভাবেই। কোন কোন সময়

উত্তেজনা, চেঁচামেচি চরমে উঠেছে, কিন্তু শেষ অবধি আলোচনা ভালোভাবেই চালানো গেল। এর জন্য এক বড় কৃতিত্ব চেয়ারম্যানের—ডাডলীর।

চেয়ারম্যানের কাজ সহজ নয়। নানা ধরনের চেয়ারম্যান আছে। কেউ কেউ অন্য কারোকে কথা বলতে দেবেন না, সব ব্যাপারে কথা বলবেন, সব কথার জবাব দেবেন, প্রত্যেকের বক্তব্যের দীর্ঘ সারাংশ বলবেন। এই ধরনের চেয়ারম্যান সব থেকে খারাপ। এর উল্টো হচ্ছে সেই সব চেয়ারম্যান যারা একদম কথা বলবে না, শুধু হাত তোলা দেখে বলতে বলবে, আলোচনাকে সুষ্ঠুপথে পরিচালিত করবার কোন চেষ্টাই করবে না। ভালো চেয়ারম্যান সে-ই, যে অন্যদের বলতে দেবে, আলোচনাকে সহজ পথে চলতে দেবে, কিন্তু প্রয়োজনের বেশী মুখ খুলবে না। ডাডলী সেইরকমই চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের সবচেয়ে বড় দরকার রসবোধের। উত্তেজনা, তিক্ততার মুখে একটি রসোত্তীর্ণ ছোট্ট মন্তব্য প্রচণ্ড হাসির দমকা হাওয়ায় সমস্ত বিদ্বেষ উড়িয়ে দিতে পারে। সেটাও ডাডলীর এক বড় গুণ।

এই ডাডলীকে দেখে খুব অবাক হই, কেননা এই ডাডলী সাসেক্সের রাশভারী সদা-চিন্তিত আনমনা অসামাজিক মানুষটা নয়। ইংলিশ চ্যানেল পার হলেই যেন মানুষটার খোলস খসে পড়ে, তখন ঠাট্টা হাসির ঝলকানি। কেউ কেউ বলে, এটা বৃটেনের জল হাওয়ার দোষ। মানুষটা সূর্যের আলো চায়, অনেকখানি জায়গা নিয়ে থাকতে চায়—ওই ছোট্ট দ্বীপের মেঘ ঢাকা আকাশ, কুয়াশা, স্লিট, বৃষ্টি ওর ভালো লাগে না।

হোটেলে ফিরে ডাডলী বললো, "আমি বিকেলে বা সন্ধ্যায় বেরুবো না, আলাদা মিটিং আছে। তুমি যদি চাও আমার গাড়ীটা নিতে পারো।"

কাজেই, আলোচনার শেষে বিকেলে ডাডলীর লিমুজিন নিয়ে খালিক, লিণ্ডা আর আমি বেরুলাম শহর-পরিক্রমায়। এবারে আর কোকোডি প্লাটো নয়—ত্রিচভিল, যেখানে সাধারণ আফ্রিকানদের বাস। ত্রিচভিল এখানকার শ্যামবাজার-বাগবাজার, মূলত নিম্নবিত্ত আফ্রিকানদের জায়গা। যেতে হলো লেগুন পেরিয়ে—সেতু পার হয়ে। লেগুন আর শহর পরস্পরকে জড়িয়ে—সেটা ভালো, চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু কখনো কখনো সেতুর বাধায় যানজট গড়ে ওঠে।

জায়গাটার নাম ভুলে গেছি।। রেলিঙ্গ দেয়া পার্ক। তার সামনেই যেন ত্রিচভিলের মূলকেন্দ্র। এখানে বেশ ভীড়—রাস্তায় ফেরীওলা বসে গিয়েছে। প্রচুর মানুষ কিনছে—দরদাম, ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি, এ রকম হাট বাজারে যা হয়েই থাকে।

এক জায়গায় পর পর কয়েকজন দাঁড়িয়ে। ওদের হাতে নানা ধরনের উডওয়ার্ক। কারো কাছে চামড়ার ব্যাগ, বেল্ট, ঘড়ির জন্য মনিবন্ধ। কেউ রেখেছে নানারকম ঘাসের তৈরী মূর্তি। পশ্চিম আফ্রিকার আর্টের যেটা বিশেষত্ব, মূর্তিগুলো জীবন্ত এবং বলিষ্ঠ।

একটা বড় কাঠের মূর্তি, একটি মেয়ের চুল, মাথা আর মুখ—খুব ভালো লাগলো। জিগ্যেস করলাম, "দাম কত ?"

ছেলেটি, শীর্ণ, লম্বা, হয়তো বাইশ তেইশ বছর হবে। বললো, "পাঁচ হাজার 'সেফা'।"

'সেফা' আসলে সি-এফ-এ, ফরাসী প্রভাবিত আফ্রিকার মুদ্রা। পঞ্চাশ সেফায় এক ফরাসী ফ্রাঙ্ক হয়—এই মুদ্রা ব্যবস্থাও ওই দেশের অর্থনীতির ওপর ফরাসী নিয়ন্ত্রণের এক বড় সূচক। এই মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক জড়িত, তাই এই নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসা আইভরী কোস্টের পক্ষে শক্ত।

পাঁচ হাজার সেফা মানে একশো ফ্রাঙ্ক—তখনকার হিসেবে হয়তো ভারতীয় দেড়শো টাকার

মতো। লিণ্ডা বললো, দামটা একটু বেশী মনে হচ্ছে। তুমি বরং দোকান থেকে কেনো।"

আমি হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু ছেলেটা হাত দিয়ে আগলে দাঁড়ালো। আমি বললাম, কিনবো না। ও খুব চটে গেল, বললো, "তোমার দাম কি বলো ?" ইংরাজীতে বললো, "আই টেল মাই প্রাইস, ফাইভ থাউজেণ্ড সেফা। ইউ নাউ টেল ইয়র প্রাইস।" ও যা বললো সেটার ভাবানুবাদ করলে দাঁড়াবে, "ইয়ার্কি পেয়েছো ! দরদাম একবার শুরু করলে এভাবে কি গুটিয়ে নেওয়া যায় ! তোমাকেও দাম বলতে হবে। তুমি দাম বলো, আমি দাম বলি, আবার তুমি বলো। এইভাবে কিছুক্ষণ চলুক। নাহলে কি রকম খদ্দের তুমি?"

ছেলেটা ছাড়বেই না আমাকে। দরদাম করতেই হবে।

খালিক বললো, "একটা কাজ করো না। এমন একটা দাম বলো যা ও একেবারে মানতে পারবে না। ও গালাগাল করে চলে যাক।"

সেটা মন্দ না।

আমি বললাম, "ফাইভ হানড্রেড সেফা।" ওর দামের দশ ভাগের এক ভাগ।

যা ভেবেছিলাম তাই হলো। ছেলেটা দারুণ চটে গেল—এবং ভীষণ গালাগালি করতে শুরু করলো। সেই গালাগালিতে আমার আপত্তি নেই, যখন তার একবর্ণ বুঝছি না। ও বিদায় হলেই ভালো। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম।

কিন্তু ছেলেটা গেল না। ও আমাদের সঙ্গেই হাঁটতে থাকলো। বললো, "ফোর থাউসেণ্ড নাইন হানড্রেড।" প্রতি পাঁচ গজে একশো সেফা করে কমে, দুশো গজ পথ গিয়ে সেই জিনিষেরই দাম দাঁড়ালো, এক হাজার সেফা।

খালিক বললো, "দিয়ে দাও। ল্যাঠা চুকুক।"

আমার ততক্ষণে খেলাটা ভালো লেগেছে। জেদ তৈরী হয়েছে। আমি প্রতি দশ গজে পাঁচ সেফা করে বাড়াই। আমি বললাম, "ছশো।"

প্রতি কুড়ি পঁচিশ গজ অন্তর ছেলেটা ক্ষেপে যায়, চিৎকার করে আঙুল নেড়ে গালাগালি করে, রেগে গরগর করতে করতে উল্টোদিকে হাঁটে, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। ওর উপায় নেই—কেননা নিয়ম অনুযায়ী যতক্ষণ আমি দর একটু করে বাড়াচ্ছি ততক্ষণ ওকেও একটু করে কমাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত আটশো সেফায় রফা হলো। ছেলেটা টাকা নিয়ে ছুটলো। আমি খুশী—দরদামে জিতলাম। কোথায় পাঁচ হাজার কোথায় আটশো।

কিন্তু গাড়ীতে ঢুকে কিছুটা গিয়ে মনটা দারুন খারাপ হয়ে গেল। এ জেতার মানে কি ? আমি গাড়ীতে ঘুরছি, আমার টাকা আছে, এ জিনিষটা আমার না কিনলেও চলবে। ওর খরচ হয়েছে সামান্যই—কিন্তু তৈরী করতে অনেকখানি সময় আর শ্রম লেগেছে। ওকে এ জিনিষ বিক্রী করতেই হবে— নাহলে ওর পেট চলবে না। তাই খরচের ওপর যেটুকু পায় সেটাতেই খুশী। ওর সময়ের বা পরিশ্রমের কেউ মূল্য দেয় না, মূর্তিটা যতো সুন্দরই হোক। দরদামে আমরা তো জিতবোই—হারাটাই ওদের অভ্যাস।

খালিক আর লিণ্ডাকে বললাম, কি ভাবছি। গাড়ী ফিরিয়ে আবার চললাম। লিণ্ডা জিগ্যেস করলো, "তুমি কি করবে ভাবছো ?"

আমি পাঁচ হাজার সেফার একটা নোট বের করে বললাম, "ওকে দিয়ে বলবো, জিনিসটার দাম ও প্রথমে ঠিকই বলেছিল।"

লিণ্ডা বললো, "খবরদার সেটা করো না। ও খুব অপমানিত বোধ করবে। ওরা গরীব হতে পারে কিন্তু ওদেরও সম্মানবোধ আছে। ওরা তোমার দান বা ভিক্ষা নেবে কেন ?"

"দান কেন বলছো ?"

"দান তা বটেই। দরদাম যে তুমি করলে তার মধ্যে অন্তত আপাতদৃষ্টিতে একটা সমতা আছে। যেন দু পক্ষই সমান—যদিও সেটা একটা ফিকশন। কিন্তু এই ফিকশনটাও ওর মনের দিক থেকে খুব দরকার। দরদাম যেন একটা খেলা। খেলায় হারজিৎ থাকে—ও সেটা নসীব বলে মেনে নিয়েছে। সেখানেই ব্যাপারটা চুকে গিয়েছে। এখন তুমি যদি গিয়ে ওর হাতে পাঁচ হাজার সেফা গুঁজে দাও ও কখনই নেবে না।"

উপায়টা কি ? এই টাকা না দিয়ে ফিরলে যে মনটা খুব খচখচ করবে ? শেষ পর্যন্ত ভেবে একটা ফন্দী ঠিক করলাম। ওরা দুজনই সায় দিলো।

গাড়ী নিয়ে ছেলেটার কাছেই ফিরে গেলাম। ও হেসে অভ্যর্থনা জানালো। ওর জিনিষপত্র আবার ঘাঁটলাম। পছন্দ হলো এক বৃদ্ধ আফ্রিকানের বড় মাথা, গলায় মাদুলী, কাঁধে চাদর। হয়তো কোন 'গ্রিয়টে'র মূর্তি—যারা পুরানো দিনের কথা বলে।

দাম জিগ্যেস করলাম। ছেলেটা বললো, "দশ হাজার।

, বুঝলাম ও আমাকে চিনে গিয়েছে—তাই বেশ কিছুটা বাড়িয়েই প্রথম দাম হাঁকলো।

আমি বললাম, পাঁচ হাজার।"

ও দারুন অবাক হলো, কেননা এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য ও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল।

তারপর দু একবার হাঁটা দিলাম, ও গালাগাল করে হাত নেড়ে চলে যেতে বললো, তারপর আবার ছুটে এলো।

এইরকম কয়েকবার হবার পর আমি বারবার ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকলাম। তারপর যেন সময় নেই, তাই বাধ্য হয়ে কিনতে হচ্ছে, এই ভাব করে, কাঁধ নাড়িয়ে আট হাজারে রাজী হলাম। ছেলেটা দাম পেয়ে যতো না খুশী হলো তার থেকে যেন বেশী আনন্দ উপচে পড়লো দরদামের লড়াইয়ে জিতে। দূর থেকে দেখলাম ওর শীর্ণ মলিন দেহটার ওপরের জ্বলজ্বলে খুশী চোখ দুটো।

এবার লেগুনের সামনের এক রেস্টুরেন্টে। নর্মান গির্ভানও আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলো।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে লিণ্ডা বললো, "ওই ছেলেগুলোই আইভরী কোস্টের সর্বহারা। তোমরা যাকে বলো, 'ইনফরমাল সেক্টর'। কিন্তু এরা কেউই এখানকার লোক নয়—সবাই বাইরে থেকে এসেছে।"

এরা 'সাহেলে'র লোক। এক বড় অংশ হলো জাতে 'মোসি,' উত্তরের দেশ আপার ভোল্টা থেকে এসেছে। মালী, নিজের থেকেও কম আসে নি।

ওরা আসে, যে কারণে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার খরাপীড়িত মানুষ বর্ধমান বা হুগলীতে ছোটে। যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিহারের কিছু জেলার মানুষ রাণীগঞ্জের কয়লাখনিতে বা তরাইর চা বাগানে কাজের আশায় ছুটে যায়।

সাহেলের জীবন বড় কঠিন। সাহারার ঠিক দক্ষিণে এই অঞ্চল। মালী, নিজের, চাদ, সুদান, আপার ভোল্টা আর সেনেগালের এক অংশ নিয়ে। এখানে কাঁটা গাছের ঝোপ, সামান্য কিছু ঘাস। চাষবাস হয় না, যেহেতু বৃষ্টি নেই। পশুপালনই মূল জীবিকা, মানুষের এক বড় অংশ যাযাবর। ওরা জলের আর ঘাসের সন্ধানে গরু নিয়ে প্রতি বছর শত শত মাইল হাঁটে। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য কষ্ট করেও ওদের জীবন চলে। কিন্তু কয়েক বছর অন্তর বিরাট খরা আসে, তখন সামান্য ঘাসও থাকে না। প্রচুর গরু আর মানুষ তখন মরে। খরা যদি কয়েক বছর ধরে চলে

তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর পশু মরে। সত্তরের দশকে তেমনই হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য পাঠিয়েও প্রচুর মানুষকে বাঁচানো যায় নি।

ওই মানুষগুলোই মাতৃভূমি ছেড়ে দক্ষিণের দিকে আসে। আসে সেনেগালে, আইভরী কোষ্টে, ঘানায়। ওরা কাজ করে কফির বাগিচায়, কোকোর বাগানে, তৈরী করে কলা, নারকেল, আরো দশটা জিনিস। ওরা জঙ্গল কেটে বাগিচা বানায়—যেমন সাঁওতালরা বা ওঁরাওরা একদিন পশ্চিমবঙ্গে বানিয়েছিল। ওদেরই অনেকে শহরের রাস্তায় সওদা নিয়ে বসে পড়ে, ওই ছেলেটার মতো কাঠের মূর্তি বা অন্য দশটা জিনিস বিক্রী করে।

এদের সংখ্যা কতো ?

১৯৭২ সালের হিসেবে মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগই এই ধরনেব অধিবাসী। এক আপার ভোল্টার মানুষই প্রায় দশ লক্ষ, মালীর এক লক্ষ, ঘানার দু লক্ষ।

নর্মান গির্ভান বলে, "আইভরী কোষ্টের স্বাচ্ছল্যের ভিত্তি মূলত এরাই। এদেরই পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আইভবী কোষ্টের বাণিজ্যিক অর্থনীতি। ওদের মজুরী সামান্য—কিন্তু বাগিচায় ওরাই মূলত কাজ করে। ওরা না থাকলে এখানকার অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে। যাবা এখনও সাহেলে রয়েছে, তারাও আইভরী কোষ্টের 'রিজার্ভ আর্মির' অংশ—এখানে বাগিচা যতো বাড়বে ওদের ততোখানি টানা হবে। বা বলতে পারো সাহেল হলো এক মস্ত বড় জলাশয়। সেখান থেকে পাইপে করে জলের মত শ্রমিক আসছে। যতোটা দরকার, কল খুললেই পাওয়া যাবে। সাহেলকে বাদ দিয়ে তাই আইভরী কোষ্ট ভাবা যায় না—এরা একই অর্থনীতির দুটো অংশ।"

এরা থাকে কোথায় ?

শহরের দক্ষিণে, পুরানো বন্দরে যাবার রাস্তাব দুপাশেব বস্তীতে। সেই বস্তী কাঠ, কাপড়, টিনের ক্যান, টায়ার, টালি, আরো হাজারো রকমের ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তৈরী। সেখানে বর্ষার জল জমে, মাটি স্যাঁতসেতে। ভিতরে ভীষণ গরম আব ভ্যাপসা। সেই গরমে সেদ্ধ হয়েও ওরা, ওদের বাড়ীর সবাই মিলে তৈরী করে নানা জিনিস। সেই জিনিসই রাস্তায় ওরা বিক্রি করে, পরে বড়লোকের লাউঞ্জের শোভা বর্ধন করে।

বাইরের ট্যুরিস্ট কোকোড্রিতে যায়, ওদের এখানে আসে না। হোটেল ইভয়ারের টাওয়ারের এগারো তলার জানলার পাট খুলে লেগুনের নীলে চোখ ভরে যায়, তার ওপারের অনেক দূরের এই বস্তী চোখে আসে না। এখান থেকেও রাতের অন্ধকাবে হোটেল ইভয়ারের আলোক স্তম্ভ চোখে দেখার উপায নেই। দুটো আলাদা জগত। দি টোয়েইন শ্যাল নেভার মিট।

॥ ছয় ॥

সম্মেলনের শেষ দিন সাধারণত ভাঙা হাটের মতো হয়। সবার মনে তখন ফেরার ভাবনা, দেশে ফিরে কি সমস্যা আসবে আবার কোন সফরে যেতে হবে, কি লিখতে হবে তার পর্যালোচনা। আরও আশু দরকার দেশে ফেরার টিকিট কনফার্মড হলো কিনা। তারপর ভাবতে হয় বউর কথা, বাচ্চাদের কথা—ওদেরও একটা প্রত্যাশা থাকে। বড় হোটেলে জামা কাপড়, ফ্যান্সী ঘর সাজাবার জিনিস সবই পাওয়া যায়। তবু মানুষ চায় আরও দশটা দোকানের জিনিস দেখে বাজিয়ে নিতে। সেই নিয়ে বেশ কিছুটা সময় যায়।

তারপর সময় লাগে ঠিকানা বিনিময়ে। ছোট সেমিনারে বা ওয়ার্কশপে সাধারণত উদ্যোক্তারা ছাপিয়ে নাম-ঠিকানার তালিকা বিলি করে। সেই তালিকা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে পারস্পরিক যোগাযোগ থাকে। কিন্তু এত বড় সম্মেলনে, যেখানে দেড় হাজার মানুষ, সেখানে নাম-ঠিকানার তালিকা ছাপিয়ে বিলি করবার সাধারণত কোন প্রথা নেই। তাই কাগজের স্লিপে, খামের পিছনে, চিঠির নীচের সাদা অংশে ঠিকানা লিখে নেয় পরস্পরের। এই ধরনের সম্মেলনে যারা আসে তাদের অধিকাংশরই নাম-ঠিকানা পদ লেখা ছাপানো কার্ড হাতে। পুরো সম্মেলন ধরেই হাতে হাতে ওরা কার্ড বিলোয়।

অনেক সময় ভাবি, এই ধরনের সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি ? লাভ কি ? এতে কার কি এসে গেল ? এই সম্মেলন না হলে কি পৃথিবী রসাতলে যেতো ? হয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে কতো মিলিমিটার অবদান রাখলো ? এই প্রশ্নের জবাব হবে নানারকম—নানাজন নানাভাবে দেবে, সেইটাই স্বাভাবিক।

একটা অবশ্য দিক, ভাব-বিনিময়, জ্ঞানের আদান-প্রদান। আমরা যারা গবেষণা করি তারা হয়তো একটা বিষয় নিয়ে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবি। সেই চিন্তায় বহু সময়ই অনেকগুলো ব্লাইণ্ড স্পট থেকে যায়। তাই কতোগুলো যুক্তির ফাঁকি যেন চোখে পড়েও পড়ে না, বুঝেও বুঝি না। নিঃসঙ্গ গবেষকের সেটাই এক বড় বিপদ। সম্মেলন বা আলোচনায় অন্যদের মুখেই যখন এই কথাগুলো শোনা যায় তখন মনে হয়, আশ্চর্য তো! এটা ভাবি নি কেন ?

সম্মেলনে বা আলোচনায় অনেকে অনেক কিছু বলে যা ভুল, বা আপাত-সত্য কিন্তু অগভীর, বা পপুলিস্ট, গভীর চিন্তার দর্পণে যার দৈন্য ধরা পড়ে কিন্তু সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা যায়। কিন্তু এই ভুলগুলোরও একটা মূল্য আছে। বোঝা গেল বেশ কিছু লোক এইভাবে ভাবছে বা ভাবতে পারে—এবং যে কারণেই হোক যুক্তি বা তথ্য দিয়ে তাদের বোঝাতে পারা যায় নি। তখন আমাকেই নতুন করে ভাবতে হবে, আমার প্রকাশভঙ্গিতে কি ত্রুটি আছে, কেন বোঝানো গেল না। সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ। এই সম্মেলনের আলোচনা কোন ভোটে নিষ্পত্তি হয় না—কিন্তু নিজেদের শিখবার বা বুঝবার অনেক কিছু থাকে।

তারপর অনেক কথা জানা যায় শোনা যায় যা তখনও লিপিবদ্ধ হয় নি। গবেষকদের একটা

বড়ো পদ্ধতিই হলো লেখা ছাপাবার আগে সম্মেলনে বা আলোচনা সভায় উপস্থাপিত করা, সেখানকার সমালোচনার আলোকে সংশোধন করে তারপর ছাপানো। যারা নতুন কোন তত্ত্ব খাড়া করেন তাদের পক্ষে এই ধরনের আলোচনা খুবই দরকারী। তারপর, আপনি হয়তো আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "উই ইন ইণ্ডিয়া...", যেন ভারতই জগত, ভারতে ঘা ঘটেনি তা কোথাও ঘটতে পারে না, তখন আর একজন হয়তো বললো, "ইন জি-বু-তি-ই...", সেখানকার অভিজ্ঞতা একেবারে উল্টো। বোঝা গেল, ভারত একটা ব্যতিক্রম, পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাধিক্য দেশই ভারতের থেকে অনেক ছোট, ওদের সমস্যার চরিত্র আলাদা।

সম্মেলনে নানা ধরনের মানুষ আসে ঠিকই, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এখানে একটা 'ন্যাচারাল সিলেকসনে'র নিয়ম কাজ করে। মেজাজ, চিন্তা, মতামত ধরে ধরে মানুষ মানুষের কাছে আসে—ছোট ছোট গ্রুপ গড়ে ওঠে। কে কাকে টানছে, কেন একজন এই দিকে না গিয়ে অন্যদিকে বসলো সেটাও দেখবার। একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে আঞ্চলিকতার। ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, শ্রীলংকার লোকেরা একসঙ্গে এঁটে থাকবে, যেমন আরবরা, ল্যাটিন আমেরিকানরা, বা পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার মানুষ। আমার নিজের কাছে এই ঝোঁকটা ভালো মনে হয় না। সম্মেলনে গিয়ে যদি আর দশটা দেশের মানুষের সঙ্গে না মিশলাম, কথা না বললাম, তাহলে তো বাড়ীতে বসে থাকলেই চলতো। তবে এটাও ঠিক যে আলোচনার ক্লান্তির পর অনেকেই মনটাকে বিশ্রাম দিতে চায়—দেশোয়ালীদের সঙ্গে কাঁচা আড্ডায় আনন্দ পায় বেশী।

সম্মেলন যেন একটা বাজার। খোঁজ খবর পাওয়া যায়। তুমি শ্রীলংকার! নিউটন গুনসিংগেকে চেনো? শুশান্ত গুনতিলক কি ব্যাঙ্কে এখনো? গডফ্রে এখনও মার্গাই চালাচ্ছে? কুমারী কি দেশে না স্বামীর সঙ্গে বিদেশে! তুমি হল্যাণ্ডের? প্রফেসর ভারথাইমের বইটার ইংরেজী বেরিয়েছে? ইয়ান ব্রেমান কি এখনও মাইগ্রেশন নিয়ে লিখছে? রেমণ্ড এ্যাপথর্বের দুধের ওপর গবেষণা শেষ হলো? তুমি ইটালীর? ফ্রাঙ্কো ভিচিয়ানির ডির্ভোস হয়ে গেছে? ও কি এখনও গার্লফ্রেণ্ডকে রোজ লাসানিয়া তৈরী করে খাওয়ায়? তুমি কেনিয়ার? ফিলিপ এমাবিথি এখন ভাইস চ্যান্সেলার? ওকে আমার কনগ্রাচুলেসন্স জানিও। সম্মেলন মানে বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ নেয়া, নতুন বন্ধুত্ব করা, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। বইয়ের খবর, লেখার খবর, তত্ত্বের খবর, চাকরীর খবর, মানুষের খবর—এইসব বিনিময়ের এক বড় বাজার এই সম্মেলন।

শেষ দিন হলেও তেলের ওপর অলোচনা দারুণ জমলো। মূলত অভিমত হলো—তেলের দাম বাড়ানো ঠিকই হয়েছে। এতদিন পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিক্রী করা যন্ত্রপাতি বা শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়তো, অনুন্নত দেশগুলোর বিক্রী করা কৃষিজাত বা খনিজ দ্রব্যের দাম কমতো। বিনিময়ে, যতো দিন যেতো লাভ হতো বড়লোক দেশগুলোরই। এই প্রথম, তেলের ক্ষেত্রে, অনুন্নত দেশগুলো একজোট হয়ে দাম বাড়াতে পেরেছে। সেটা খুবই ভালো। এখন দেখতে হবে যাতে বক্সাইট, তামা, পাট, চায়ের ক্ষেত্রেও এটা করা যায়। এই দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে পড়ুক। ওপেক দেশগুলো যেন অনুন্নত দেশগুলোকে অল্পদামে তেল দেয়, ওদের অর্থনীতিতে লগ্নী করে—তেলের সঞ্চিত টাকা যেন পাশ্চাত্য দেশের ব্যাঙ্কে না জমায়। তেলকে দিয়ে শুরু—এখন যেন এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের বেশ কিছু সদিচ্ছা মেলেনি। তেলের দেশগুলো ওদের না খরচ করা টাকা পাশ্চাত্যের ব্যাঙ্কেই রেখেছে—অনুন্নত দেশে বিশেষ লগ্নী করে নি। অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলো জোট বেঁধে নিজেদের তৈরী কাঁচামালের দাম তুলতে পারে নি। তবু বলা

যায়, তেলের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি।

আলোচনায় সবচেয়ে ঝামেলা করলো রবার্ট ম্যাক্সওয়েল, বৃটিশ লেবার দলের একজন প্রাক্তন এম-পি, কোটিপতি, সংবাদ-পত্রের মালিক। ম্যাক্সওয়েল ইহুদী, আরব বিদ্বেষী, এবং বারবার চেষ্টা করলো আলোচনাটাকে আরব-ইসরাইলী দ্বন্দ্বের কাঠামোয় ফেলতে। বেশ খানিকটা উত্তেজনাও হলো তার ফলে। ডাডলী সামলালো। আমি আলোচনার একটা রিপোর্ট তৈরী করে দিয়েছিলাম, সেটাই কিছুটা পরিবর্তন করে গৃহীত হলো। ডাডলী পরে বললো, "আসল কাজ রিপোর্ট লেখা। নামাজন নানা কথা বলে আলোচনায়, কিন্তু রিপোর্ট লেখকই পারে নিজের মতটাকে সম্মেলনের মত বলে চালিয়ে দিতে।"

সেই সন্ধ্যায় আবার ব্যাঙ্কোয়েট—ভোজসভা। প্রেসিডেন্ট ছিলেন, না আবিজাঁর মেয়র ছিলেন, সেটা মনে নেই। আমরা ঠিক করলাম খাবো না। এটা কোন রাজনৈতিক বয়কটের ব্যাপার না— মোদ্দা কথা, আর খেতে পারছিলাম না। ভালো খাওয়া মাঝে মধ্যে একদিন ভালো লাগে। কিন্তু রোজ দুবেলা খেতে গিয়ে সেই ভালো খাওয়াতেও অরুচি আসে। এতো লোকের ভীড়, হৈ চৈ, হট প্লেটের গরম, লাইন দিয়ে খাবার নাও, প্লেট কাটলারি খাবার রুমাল সামলে লোক বাঁচিয়ে হাঁটো—আর না।

লেগুনের ধারের ওই ছোট্ট কফির দোকানটা আমাদেব ভালো লেগেছিল। সেখানেই গেলাম। কফির দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনিও কিছুক্ষণ বসলেন আমাদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত ধর্মের কথা উঠলো। উনি জানালেন, উনি মুসলমান। আইভরী কোস্টের সিকিভাগ মানুষ মুসলমান, দশ বারো ভাগ খৃষ্টান, কিন্তু প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 'এ্যানিমিস্ট', পুরনো ধর্ম এবং সংস্কারে বিশ্বাসী।

আলাপ পরিচয় হলো। আমরা আমাদের নাম বললাম। খালিক তার নাম বলতে গিয়ে বললো, "সৈয়দ খালিক নাকভি।" সৈয়দ ? এভাবে পরিচয় তো খালিক কখনো দেয় নি, ওর লেখা বা চিঠিতেও সৈয়দ অনুপস্থিত ! কিন্তু ফল হলো।

কফি হাউসের মালিক নীচু হয়ে প্রণামের মতো ভাব করলেন তারপর খালিকের দু হাত চেপে ধরলেন। ওর মুখে যেন খই ফুটতে শুরু করলো। সেই ভাষা ফরাসী এবং আরাবিক মেশানো। ম্যারাবুরা আরাবিক শেখায়, ইসলাম ধর্মের নানা নিয়ম বোঝায়—উনিও শিখেছেন ওদের কাছে।

মালিক নিজে বসে থেকে আমাদের খাওয়া দেখলেন। আফ্রিকান খাওয়া, ইয়াম, ম্যানিওক, ভুট্টা, মাংস শব্জী, ঝোলো ঝোলো, হোটেল ইভয়ারের রাজসিক ভোজসভার পব অমৃত মনে করে খেলাম। মালিক একটা পয়সা নিলেন না। একজন সৈয়দকে খাওয়াতেপেরে উনি ধন্য।

খালিককে এক ফাঁকে বললাম, "খাওয়ালো ভালোই। কিন্তু ওই মিথ্যেটা কি না বললে হতো না ! তুমি কোন্ মুলুকের সৈয়দ !"

খালিক গম্ভীর হয়ে বললো, "সত্যিই বলেছি—আমরা সৈয়দ। পয়গম্বরের বংশধর। আরাবিয়ার মানুষ। আমাদের পরিবারে সবাই সৈয়দ লেখে শুধু আমি আর সফিক ছাড়া।" সফিক খালিকের দাদা—আমার পরিচিত।

ওকে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারি না, বলি, "রাখো ও-সব। খোঁজ করে দেখো, তোমরা পুরোপুরি ভারত সন্তান। আরাবিয়া থেকে কজনই বা এসেছিল বলো ? তাদের মধ্যেও পয়গম্বরের গাদা গাদা বংশধর থাকবার কথা নয়। তোমরা আসলে চাও প্রিভিলেজ। পয়গম্বর জাতিভেদ মানতেন না, ওর কাছে মুসলমান হলে সবাই ছিলো সমান। এখন তোমরা এই সব সৈয়দ-টৈয়দ তুলে ইসলামের মধ্যেও জাতিপ্রথা ঢুকিয়েছো। বলতো, ওই মানুষটা তোমাকে

যেমন করলেন, হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের কি একইভাবে দেখে না ? ভালোর মধ্যে ভালো খাওয়া ফ্রিতে পেলাম, কিন্তু সৈয়দ-টৈয়দ বোধহয় না বললেই পারতে।"

খালিক একটু আহত হলো। ওর স্বভাবসিদ্ধ তর্কে গেল না। বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলো। অনেকক্ষণ পরে বললো, "ভেবো না আমি সত্যি সত্যিই সৈয়দ বলে নিজেকে জাহির করতে চাই। তাই যদি হতো তাহলে তো তোমরা আগেই জানতে। আমাকে কখনো সৈয়দ বলতে দেখেছো ? অথচ কতো লোক নিজের নামের আগে সৈয়দের পতাকা তুলে রাখে ! কিন্তু এখানে এসে, সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকায় এসে, ইসলামের কথায় যেন মনটা কেমন করে। এ যেন অপ্রত্যাশিত। আমাদের চিন্তায় কখনো ইসলামের সঙ্গে আফ্রিকার যোগ থাকে না। উত্তর আফ্রিকা, আরব-আফ্রিকা মুসলিম, সাহারার দক্ষিণে সবাই এ্যানিমিষ্ট বা খৃষ্টান এটাই ধারনা। তাই এখানে এসে ইসলামের কথা শুনে মনটা উদাস হয়ে গেল। ট্রপিকাল আফ্রিকায় হোটেল ইভয়ার যেমন ভাবা যায় না তেমন ইসলামও ভাবা যায় না। তাই সৈয়দটা আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।"

"তুমি কতোটা ধার্মিক ?" জিগ্যেস করি।

সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে লেগুনেব দিকে তাকিয়ে খালিক বলে, "অনেকখানি। তবে সাম্প্রদায়িক নয। অনেকটা ধরো মোহনদাস গান্ধীর মতো—ধর্ম মানি, কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষেব প্রতি বিদ্বেষ নেই, সরকারী কাজে ধর্ম আসুক এটা চাই না। রাষ্ট্রগত ধর্মনিরপেক্ষতার আমি পক্ষে—ব্যক্তিগত ধর্মের স্বাধীনতারও পক্ষে। তারপব, যেহেতু প্যান-ইসলামিষ্ট, পাকিস্তানে বিশ্বাস করি না। তুমি তো জানো, দেশ ভাগের সময় যারা সত্যিকারের ধার্মিক মুসলমান তারা পাকিস্তান চান নি। জিন্না চেয়েছিলেন—কিন্তু জিন্না ছিলেন সাম্প্রদায়িক, ধার্মিক নন, ইসলামের নিয়ম উনি মানতেন না। আমরা যারা সত্যিকারের ইসলামে বিশ্বাসী তাদের কাছে সীমানার বন্ধন থাকতে পারে না। পাকিস্তান করে দিলাম, মুসলমানেব আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেল, এই দর্শন আমি মানি না। আমাব ইসলাম চেতনা আন্তর্জাতিক, তাই আফ্রিকায় এসে ইসলামের কথা শুনে মনটা ওইরকম হয়ে গেল।"

খালিক বলেই চললো। আমবা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। স্বভাবতই এই ব্যাপারে খালিকের মত আর আসার মত এক হবে না। আমার কোন ধর্ম নেই, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে ধর্মটাও বুঝতে চাই। মানুষ কেন ধর্মে বিশ্বাস করবে, কি চায়, কি পায়, মনেব কোন্ অভাব সেই চেতনায় মেটে, এটা জানতে চাই। সততার মূল্য দিই, মত না মিললেও। খালিকের বক্তব্য সৎ এবং স্পষ্ট। কিন্তু এই খালিক দিল্লীর জাঁদরেল অধ্যাপক ডঃ নাকভি নয়, যেমন আবিজঁর ডাডলী সাসেক্সের প্রফেসর সিয়ার্স নয়। খালিককে চিরকাল ভেবে এসেছি একজন 'র‍্যাশনালিস্ট' হিসেবে। ও হিন্দু না মুসলমান না অন্য কিছু সেই চিন্তাও কখনো মনে আসে নি। বরং সমস্ত তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও অনেকবার আমার মনে হয়েছে, ওই একটা ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মিল—আমরা দুজনই সংস্কার, ধর্ম মানি না, আমরা র‍্যাশনালিস্ট। আবিজঁ না এলে জানতামও না সেই ধারণা কতোখানি ভুল।

রাত বাড়লো, আলোচনার গতি ঘুরলো।

"একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে এখানে," নর্মান বলে, "এখানে জাতি সমস্যা বড় হয়ে ওঠে নি। কেনিয়া বা নাইজিরিয়ার সমস্যা আইভরী কোষ্টে নেই। এই যে এতো মোসী এখানে থাকে, প্রায় পাঁচ জনে একজন, ওদের নিয়ে বড় রকমের কোন ঝামেলার কথা শোনা যায় না। তারপর ধরো আকানরা—এখানেও আছে ঘানাতেও আছে—কিন্তু সেই নিয়ে কোন জটিলতা নেই। এখানকার বেশ কিছু জাতি মালী, লাইবেরিয়াতেও ছড়িয়ে। সেটাও কিন্তু দেখবার

মতো—আফ্রিকার বিচারে।"

আমি একমত। এটা অল্প সময়ের মধ্যে আমিও লক্ষ্য করেছি। নাইজিরিয়ার বাতাসে জাতি সমস্যা। ওখানে গিয়ে এক লহমাও লাগে না জানতে কে কোন জাতি, কাদের সঙ্গে কাদের ঝগড়া। আইভরী কোষ্টের আলোচনায় ওই কথাগুলো ওঠেই না। একটা কারণ হয়তো স্বচ্ছলতা। স্থানীয় চাষী তুলনামূলকভাবে ভালো আছে। সেই বরং চায় সাহেল থেকে, আপার ভোল্টা থেকে সস্তা কাজের লোক আসুক—কফির কাজ করবে, আরও দশটা ব্যাপারে হাত লাগাবে।

কিন্তু ভবিষ্যত কি ?

আইভরী কোষ্টের সমাজ জীবন দ্রুত পাল্টাচ্ছে। এত চটপট আফ্রিকার অল্প সমাজই পাল্টেছে। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ক্লড মেয়াসুঁর লেখা থেকে কয়েক বছর আগের সনাতনী আইভরী কোষ্টের সমাজের এক চিত্র পাই—বিশেষ করে শুরে জাতি সম্বন্ধে। এই সেদিনও, ১৯৭০ সালে, 'বেটে' জাতির লোকেরা, যারা জঙ্গলে থাকে, তারা প্রায় বিদ্রোহ করেছিল, যখন সরকার চাইলো সামাজিক মালিকানার জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে বেঁটে দিতে। চার পাঁচ বছরেও অনেকখানি পাল্টেছে। আজ হয়তো সেই বিদ্রোহ আর হবে না—ওরা ব্যক্তিগত মালিকানার জমিই চাইবে।

কফি-কোকোর দাম যতো বাড়ছে, জঙ্গল সাফ করে যতো বাগিচা হচ্ছে, দূব দূরান্তর থেকে কাজের মানুষ যতো আসছে, সনাতনী সমাজও ততো ভাঙছে। বড়ো কফির চাষীরাই আজ দেশের সমাজ জীবনের এক বড় ভিত্তি—ওবাই শাসক দলেব মেরুদণ্ড। প্রেসিডেন্ট হুফে বয়নি ওদেরই লোক।

"একদিন আসবে যেদিন আপার ভোল্টার অভিবাসী কৃষি-শ্রমিক সমান অধিকার চাইবে, সংগঠন তৈরী করবে," নর্মান বলে, "সেইদিন এলো বলে। এদেশের সমাজের সবচেয়ে নীচের তলার লোক ওরা। সদ্য এসেছে, তাই ওদের অবস্থান চুপ করে মেনে নেয়। তর্ক করে না। যা পায় মাথা পেতে নেয়। কিন্তু এটা পাল্টাবেই। কিন্তু তখন এক বড় প্রশ্ন হবে—ওরা নিজেদের কিভাবে দেখবে ? ওরা কি ভাববে আমবা মোসী আপার ভোল্টার লোক, আলাদা জাত ? না ওরা ভাববে, আমরা শ্রমিক, সব জাতের ধর্মের শ্রমিক মিলে একটা সংগঠন করবো। ভবিষ্যৎটা নির্ভর করবে এই প্রশ্নের ওপর।"

সেইদিন একটু তাড়াতাড়িই আমরা হোটেলে ফিরলাম। পরদিন সকালে আবার বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। আইভরী কোষ্টের সরকার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই সম্মেলনের পরেও ওদের উদ্যোগ শেষ হয় না। ওরা আমাদেব দিয়ে ভালো বলাবেই। তাছাড়া গোছগাছের ব্যাপারটাও রয়েছে। এখানকার পাট চুকলো, ফেরার পালা।

॥ সাত ॥

আটলাণ্টিকের সমুদ্রে ভাসমান ওই ছোট্ট দ্বীপ।

আটলাণ্টিক বলা হয়তো ঠিক নয়, কারণ ভৌগলিক নাম গালফ অফ গিনি—যেখানটায় আটলাণ্টিক মহাসাগর আফ্রিকার পূর্বদিকে অনেকখানি ঢুকে গিয়েছে। নাম যাই হোক, সমুদ্রটা খাঁটি আটলাণ্টিক।

এই দ্বীপ সেনেগালেব গোরি দ্বীপেব মতো অভিশপ্ত নয়। খুব সম্ভবত দাসব্যবসার যুগে এই দ্বীপের হদিস কেউ জানতো না। জানলেও, দাসব্যবসাব জন্য ব্যবহাব হলেও, সেই অন্ধকার ইতিহাসের কোন চিহ্ন এই দ্বীপে নেই।

বেশ খানিকটা সময় লাগলো এই দ্বীপে পৌছতে। উপকূলেব এই অংশটা সমুদ্রেব আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত। জল—ছোট নালা, বড় খাড়ি, নদীর মতো লেগুন—নানাভাবে ঢুকেছে। আমরা কতো ব্রিজ পার হলাম তাব হিসাব নেই। অনেকগুলো লাক্সারি কোচের কনভয় এক একটা ব্রিজের নাভিমূল কাঁপিয়ে দিযে ছুটল।

ল্যাণ্ডস্কেপটা অনেকখানি কোচিনের মতো। জলের সঙ্গে জঙ্গলেব জাল বোনা। ছোট্ট খালের মত জলরেখা যখন ব্রিজে পার হই তখন যেন মনে হয় দুপাশের ঘন জঙ্গলেব ক্যানোপি উপচে পড়ে ওই জলে চুমু খাচ্ছে। সবুজ আর সবুজ।

শেষ পর্যন্ত লাক্সারী কোচ ছেড়ে বোটে—এবং ওই দ্বীপে।বেশ কিছু মান্যগণ্য মানুষ স্যুটিয়ে-ব্যুটিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারপরই, বাজনাব আওয়াজ আর নাচ। সেই ছোট ছোট মেয়েরা, যাদেব এখানে সময় না নষ্ট করে স্কুলে যাওয়া উচিত, তারাই পাট-পাট করা নানা ভাগ করা চুলে পুঁথি আর রিবন লাগিয়ে নাচছে। আমার যতোটা একঘেয়েমি লাগলো, তার থেকে খারাপ লাগলো ওই ছোট মেয়েগুলোর কথা ভেবে।

এই প্রমোদ দ্বীপে নানারকম খেলাধূলোর ব্যবস্থা। কয়েকজন তৈরী হয়েই এসেছিলেন, জামাকাপড় পাল্টে সর্ট পরে টেনিশ কোর্টে নামলেন। অনেকেই বলবয় হয়ে চারপাশে দাঁড়ালো। যতো না খেলা তার থেকে কায়দা বেশী। কেউ বাঁ হাতে রড লেভারের মতো ক্রশকোর্ট সট মারে, কেউ কোনর্সের কায়দায় হুংকার দিয়ে ওভারহেড স্ম্যাশ চালায—দুটোর একটাও ঠিক যায়গায় না গিয়ে জালে আটকায়। কেউ গেল বাস্কেট বলের কোর্টে, লম্বা লম্বা লাফে বল ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টায়। কয়েকজন ব্রাজিলিয়ানদের কায়দায় সমুদ্র সৈকতে বল নিয়ে ছুটে বেড়ালো। অধিকাংশের ততোটা প্রাণশক্তি ছিলো না। ওরা বড় বড় রঙীন ছাতার নীচে শুয়ে কোকাকোলার বোতলে স্ট্র ঢুকিয়ে সিপ করলো, বা গোল হয়ে আড্ডায় বসলো। একদল ছুটে গেল সমুদ্রের দিকে। কেউ জলে হাত দিয়ে পা ডুবিয়েই খুশী। কেউ ট্রাউজার গুটিয়ে জলে কিছুটা ঢুকলো। কিন্তু সাঁতার কেউ কাটলো না। আটলাণ্টিক ভয়ংকরভাবে ফুঁসছে, বিরাট বিরাট ঢেউ। এই সমুদ্র দূর থেকে দেখতেই সুন্দর।

আমরা চারজন খাবার পর রোদ্দুর কমলে সমুদ্রের ধারে গেলাম। ওখানে একপাশে

অনেকগুলো ছোট বড় নৌকো পড়ে রয়েছে। সেই নৌকোর খোলের ভেতরের পাটাতনে বসে গল্পগুজব। ওখান থেকে বালির ওপর চারপাশে ছড়ানো নানা রঙের নানা জাতের মানুষগুলোকে পরিস্কার দেখা যায়।

"আফ্রিকায় এলে আমার মনটা খুব ভালো লাগে প্রথম, তারপর দারুন খারাপ হয়ে যায়।" লিণ্ডা বলে, "এই যে এলাম, এরপর বেশ কিছুদিন আফ্রিকার গন্ধ আমার নাকে থাকবে, আফ্রিকার ছবি আমার চোখে আঁকা থাকবে। তারপর মনটা চাইবে আবার ছুটে আসতে।"

"দক্ষিণ আফ্রিকায় তুমি কি যাও?"

"না। ১৯৬৯ সালের পর থেকে যাই না। যেতে ভালো লাগে না। না, ঠিক বললাম না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার যেতে বরং ভালোই লাগবে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ওখানে প্রকৃতির সমস্ত রকম রূপই তুমি দেখবে। কালাহারি মরুভূমি, ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত, ভেল্ড, সমুদ্র সবই খুব সুন্দর। ভেল্ড মানে যাকে তোমরা 'সাভানা' বলো, ঘাসের বন। প্রকৃতি সব কিছুই দিয়েছে। কতোবকমের খনিজ সম্পদ ভেবে দেখেছো— সোনা, হীরে থেকে কয়লা পর্যন্ত সবই অফুরন্ত। এক তেল আমাদের ওখানে নেই, তাই কয়লা থেকে তেল তৈরীর কায়দাটা ভালো করে রপ্ত করা হয়েছে। অবশ্য অঞ্চলটাও খুব বড়, চার লক্ষ একান্ন হাজার বর্গমাইল, তোমাদের ভারতবর্ষের আদ্ধেকের চেয়ে খানিকটা কম। তবে যদি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ধরো, যাকে আমরা 'নামিবিয়া' বলি, সেটাও দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণে, তাহলে দুটো যোগ করে হবে ভারতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ। কম না, তাই না! কিন্তু এতো বড় দেশেও লোকসংখ্যা আড়াই কোটির কম। তারপর বন্যপ্রাণীও প্রচুর। তোমরা তো কেনিয়া-টানজানিয়া দেখে মুগ্ধ হয়ে যাও, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলে দেখবে আমরাও কম যাই না। কেনিয়ার গেমপার্কে তুমি যা যা দেখবে তার সবই তুমি দেখবে ওখানে। না, দক্ষিণ আফ্রিকা আমি ভালোবাসি, ওখানে যেতেও চাই, সুযোগ থাকলে অবস্থা পাল্টালে কালই যাবো।"

"তোমার বৃটেন ভালো লাগে না?"

"লাগে। নিশ্চয়ই লাগে। বৃটেনে আমার প্রচুর বন্ধু। তারপর অনেক দিন তো হয়ে গেল। সেই যে ডারবান ছেড়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, তেরো বছর আগে, তারপর থেকে বৃটেনই আমার ঘর। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা বাধা আছে। আমি বৃটিশ নাগরিক, এতদিন রয়েছি, তবু বৃটিশ হতে পারলাম না। কারণটা হয়তো খানিকটা প্রাকৃতিক খানিকটা সাংস্কৃতিক। কোথায় ঝলমলে রোদ্দুর মুক্ত প্রান্তর, কোথায় মেঘে ঢাকা আকাশ আর প্যাচপেচে বৃষ্টি। সাংস্কৃতিক তফাৎটা অবশ্য অন্যরকম। লণ্ডনের সাংস্কৃতিক জীবনের তুলনা নেই—কতো থিয়েটার, অপেরা, নিউওয়েভ ফিল্ম, আর্ট এক্সিবিশন দেখে কেউ শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তবু যেন আমার সংস্কৃতি নয়। আমরা আলাদা। আমি তেরো বছর বৃটেনে থেকেও আফ্রিকানই রয়ে গিয়েছি।"

"আফ্রিকানারদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারনা?"

"তোমার কথার জবাব দেয়া খুব শক্ত। আমরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার 'এ্যাপারথিড' নিয়ে ভাবি, তখন স্বভাবতই 'ডাচ', 'বুয়োর' বা 'আফ্রিকানারদে'র সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব আসতেই পারে। বর্ণবিদ্বেষীদের মধ্যে অবশ্য ডাচেরাই একটু বেশী গোঁড়া, ওরাই এখন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার চালাচ্ছে—কিন্তু তাই বলে ভেবো না বৃটিশরাও কম যায়। এক অর্থে বলতে পারো, বেশী বর্ণবিদ্বেষী হলেও 'আফ্রিকানার'রা সত্যি সত্যি অনেক বেশী আফ্রিকান—সাদা আফ্রিকান। আমাদের পূর্বপুরুষ বৃটিশ, এখন আবার বৃটিশ হয়েছি—কিন্তু আফ্রিকানারদের

সেইভাবে আজ হল্যাণ্ডে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। হল্যাণ্ডের মানুষ, রাজনৈতিক দলগুলো ওদের চায় না, ওখানে গেলেও ওরা মানিয়ে নিতে পারে না। এই লোকগুলোর আফ্রিকা ছেড়ে যাবার কোন জায়গা নেই। এবং সেইখানেই এক মস্তোবড় ট্র্যাজেডীর বীজ। ওরা যদি এখনই সংখ্যাধিক্যের শাসন মেনে নেয়, সাদা-কালো মিলে দেশটা চালায়, সেটা সকলের পক্ষে ভালো। কিন্তু ওরা যদি অধিকারের এতটুকু না ছাড়ে, কালোদের বিদ্রোহের ভয়ে জবরদস্তী বাড়ায়, তাহলে যেটা চাইছে না সেটাই হবে। আজ হোক কাল হোক, এই সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসন বববাদ হবেই। কিন্তু বিপ্লবেব মধ্য দিয়ে যদি এই পরিবর্তন আসে তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মববে, দু চারজন বাদ দিয়ে বাকি শ্বেতাঙ্গরা বাধ্য হবে ওদেশ ছাড়তে। কিন্তু কোথায় যাবে ? ওদের যে যাবাব জাযগা নেই! তোমরা হয়তো বলতে পারো 'সো হোয়াট'—কিন্তু ওদের মধ্যে যে আমার গাদা গাদা বাল্যবন্ধু আর আত্মীয বযেছে! ওরা যদি মূর্খতা বন্ধ করে, দেয়ালের লেখন স্পষ্ট দেখতে পায, তাহলে ভালো—না হলে যে ভীষণ রক্তক্ষয় হবে সে কথা ভাবতেও শিউরে উঠি।"

"তুমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়লে কেন ?"

লিণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "কাবণ অনেকগুলো। এই ধবণেব সিদ্ধান্ত মানুষ হঠাৎ করে না। অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে নানা ধবনেব চিন্তা আব দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। তাৎক্ষণিক কারণটা বলতে পারো শার্পভিল। ১৯৬০ সাল, আমি ডারবান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। না, রাজনীতি করি নি কখনো, বড্ড লাজুক ছিলাম তখন, এখন যা তোমরা বিশ্বাস করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা-কালো সমস্ত ধবনের ছাত্রদের এবং অধ্যাপকদেব এক অংশ নানা সময নানা প্রতিবাদ, শোভাযাত্রা এসব করেছে, যার মধ্যে কখনো যাই নি। আমি আমার পড়াশুনো নিয়েই থেকেছি। ওই সময কালোবা, প্যান আফ্রিকান কংগ্রেস, পাশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করলো। সমস্ত কালোকেই সব সময় সঙ্গে পাশ রাখতে হতো। সেই পাশে লেখা থাকতো নাম, ঠিকানা, কাজের মালিকের নাম, যতোবার কাজ পাল্টাত ততোবারই নতুন মালিকের নাম ঠিকানা। এই পরিচয়পত্র সঙ্গে না রাখলে জেল হবে। অথচ সাদাদের কোন পাশ লাগবে না। শতকরা একাশি ভাগ মানুষের বিরুদ্ধে এই নিয়ম। কালোরা বললো, এই পরিচযপত্র আমরা মানবো না—এটা দাসত্বের চিহ্ন। ওই পাশ ছাড়াই আমাদের শহরে ঢুকতে দিতে হবে। সব জায়গাতেই কালোরা সংগঠিত ভাবে ওই পরিচয়পত্র এক জায়গায় স্তূপাকার করে আগুন জ্বালালো। পাশ পোড়ানো যেন দাসত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি—অন্তত মানসিকভাবে মুক্তি। পুলিশও যেখানে পারলো ওদের পেটালো, গ্রেপ্তার করলো, জেলে দিলো।

"সবচেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটলো শার্পভিলে। এক ছোট্ট শহর—সেখানে পাশের বিরুদ্ধে এক ভালো জমায়েত হলো। হাজারে হাজারে মানুষ, ওদের হাতে কোন অস্ত্র ছিলো না। জমায়েত ছাড়া কোন কার্যসূচী ছিলো না। তবু, কেন ওরাই জানে, পুলিশ লো-ফ্লাইং এয়ারক্রাফটে করে ওখানে এলো, ওপর থেকে মেশিনগান চালিয়ে সত্তব জন মানুষকে খুন করলো। যেন ওই মানুষগুলো মানুষ নয়, ওদের জীবনের কোন মূল্য নেই। আমরা অনেকেই শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। একটা দারুণ অপরাধবোধ মনকে আচ্ছন্ন করলো, সাদা হবার অপরাধ। আমি আর ওখানে থাকতে চাইলাম না। অবশ্য শার্পভিলই একমাত্র কারণ নয়। আরো দু একটা ঘটনাও ছিল। যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়লাম। যদি শক্ত হতাম, রাজনীতি করতাম তাহলে হয়তো ওখানেই থাকতাম, কালো আর সাদা একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যে লড়াই চলছে তার সঙ্গে সামিল হতাম। আমি কাপুরুষ, এসকেপিস্ট—তাই পালালাম ওখান থেকে। পূর্বপুরুষের জন্মসূত্রে গেলাম বৃটেনে, ভর্তি হলাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। নতুন জীবন শুরু করলাম। আমার

ওখানে ফিরে যাবার এমনি কোন বাধা নেই—পুলিশ আমায় ধরবে না। কিন্তু মন চায় না। বাবা লণ্ডনে এসে মাঝে মধ্যে বকাবকি করেন, আফশোস করেন। আমিও দারুণ 'মিস' করি সাউথ আফ্রিকাকে। তবু...”

“কবে তোমার প্রথম মনে হলো বর্ণবৈষম্যের এই নীতি খারাপ ?”

“দিনক্ষণ ঠিক করে বলা যাবে না। আমার যতদূর মনে পড়ে, ছোটবেলায় বৈষম্যটাকে খুব স্বাভাবিক একটা কিছুই বলে মনে হতো। আমরা সভ্য ওরা অসভ্য, আমরা এগিয়ে ওরা পিছিয়ে, আমরা ওদের পোষাক পরিয়েছি, ধর্ম দিয়েছি, আধুনিকতার স্বাদ দিয়েছি, ভগবান এই হতভাগ্য মানুষগুলোর উন্নতির জন্যই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন—এই সবই ছিল ধারণা। ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্টান্ট ধর্মের একটা প্রভাব ভীষণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদাদের মধ্যে আছে। তুমি কথা বলে দেখো, এদের এক বড় অংশের মনে কোন পাপবোধ নেই, বরং ভাবটা এই যে আমাদের সান্নিধ্যে এসে কালোদের ভালোই হয়েছে। ওরা যে আমাদের চাকর, আমাদের সেবা করবে, ভগবান এটাই চান। সমাজে ওটাই ওদের অবস্থান। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। আমাদের মনে এই ধারণা কখনো আসে নি যে এটা ওদেরই দেশ, ওরা ওদের মতোই ছিল, আমাদের এই সমাজে অবস্থান অনধিকার প্রবেশ। শতকরা সতেরো ভাগ মানুষের যে ভালো জমি, খনিজ সম্পদ আর শহরবাসের একচেটিয়া অধিকার অন্যায়, সেটা আদপেই মনে আসে নি। এমনকি ওদের সঙ্গে রুক্ষভাবে কথা বলা, প্রয়োজনে দু চারটে চড়-চাপড় দেয়াও ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কালোরাও সেটা মেনে নিতো। সমাজে একটা ভারসাম্য ছিলো। সেই ভারসাম্যের ভিত্তি নিশ্চয়ই বৈষম্য, অন্যায়—কিন্তু ভারসাম্য ছিল। সাদাদের মধ্যে অল্প মানুষই এই সব নিয়ে তলিয়ে দেখেছে, দেখবার প্রয়োজন ছিল না।”

“সেই অবস্থা কিভাবে পাল্টালো ?”

“পাল্টালো কালোরা নিজেরা। ওরা যতদিন ওই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে ততদিন সাদাদেরও ভাববার দরকার হয় নি। ১৯৪৮ সালে ঘোষণা হলো, 'এ্যাপারথিড', তখন আমার আট বছর বয়স, পুরোটা বোঝবার মতো নয়। 'এ্যাপারথিড' মানে আলাদা উন্নয়ন। সাদা আর কালো দুজন দুজনের মতো আলাদা থাকো, নিজের সংস্কৃতি আর আচার ব্যবহার আলাদা করে বাঁচিয়ে রাখো। ভালো কথা, কিন্তু কে কোথায় থাকবে? কালোদের জন্য তৈরী হলো কিছু 'বাণ্টুস্থান', বন্য জন্তুদের 'রিজার্ভ' অঞ্চলের মতো, বাকি সব অঞ্চলটাই সাদাদের। বলা হলো, সমস্ত কালোরই নাগরিকত্ব হবে কোন না কোন 'বাণ্টুস্থানে', সেখানে ওদের ভোটের অধিকার--যে শহরে বা শহরতলীতে ওরা সত্যি সত্যি থাকে সেখানে নয়। মোদ্দা কথা নাগরিকত্বের কোন অধিকার ওদের থাকলো না। বড় শহরে সূর্যাস্তের পর থাকবার অধিকার নেই। 'বাণ্টুস্থানে'র নাম করে সমস্ত অধিকার থেকে ওদের সরিয়ে দেয়া হলো। এই নীতির প্রতিবাদে সংগঠিত হলো কালোরা, অনেক সাদা মানুষও যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। ওদের আন্দোলন, মিছিল, নানা অত্যাচার—পুলিশ ডগ, বেটন, বেয়নেট, রাইফেল,—পঞ্চাশ দশকের ওই হৈ চৈ আমাদের অনেকের চোখ খুলে দিলো। আমরা ওদের সম্মান করতে শুরু করলাম। বুঝলাম আমাদের নিজেদের ধর্মবোধ এক মস্তো বড় ফাঁকি, ওদের সভ্য করবার কথা এক বড়ো ধাপ্পা। বাণ্টুস্থান হলো শ্রমিক তৈরীর জায়গা। ওদের কাজ আমাদের খনিতে খামারে খাটা, আমাদের লাভের অঙ্ক বাড়ানো। আমাদের সভ্যতার নীতিবোধের মুখোস কালোরাই টুকরো টুকরো করে দিলো।

“ভাবতে শুরু করে বুঝলাম, এ্যাপারথিডের থেকে বড় কোন পাগলামি থাকতে পারে না। সোয়া তিনশো বছর আগে, ১৬৫২ সালে ডাচেরা প্রথম কেপ কলোনীতে এলো। এর আগে পর্তুগীজরা ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু পর্তুগীজরা ভিতরে ঢুকতে চায় নি ; উপকূলটাই ধরে রাখতে

চেয়েছে। ডাচেরাও প্রথম দিকে ভাবে নি ঢুকবে। ওদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন মূল্য ছিল না। আসল লক্ষ্য ছিল ইন্দোনেশিয়া, তখনকার সুগন্ধি মশলার বাণিজ্য। কেপ অন্তরীপ ছিল ওদের জাহাজ থামাবার বিশ্রাম করবার জায়গা। একপাশে আটলান্টিক, আর একপাশে ভারত মহাসাগর—আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ঘুরে পূর্ব উপকূল হয়ে ইন্দোনেশিয়া যাবার পথে এক ভালো জাহাজঘাটা। দীর্ঘপথ, অতো খাবার জাহাজের খোলে নিয়ে যাওয়া শক্ত। তাই ওরা চাইলো কেপ-এই কিছু শস্য তৈরী করবে। নিজেরা করতে গিয়ে দেখলো নানা ঝামেলা, ওখানকার মাটি-প্রকৃতি ভালো বোঝে না। ওরা তাই কালোদের দিয়ে শস্য বানালো জোর করে। যত দিন গেল, জাহাজ বাড়লো, খাবারের দরকার বাড়লো, জমি বাড়লো, কালো শ্রমিকের প্রয়োজন বাড়লো। তখন ওরা ঢুকলো উপকূল ছেড়ে ভিতরে। জুলুদের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো, কখনো কখনো হারলো, শেষ পর্যন্ত জিতলো। 'বুয়োর' বা 'আফ্রিকানার'রা দক্ষিণ আফ্রিকার এক বড় অংশ দখল করলো তারপর বৃটিশরা এলো, সেই নিয়ে ওদের দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। যাই হোক, মূল কথা, এই কয়েকশো বছরে সাদা আর কালো রক্ত কম মেশেনি। দৈহিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। এ্যাপারথিড করলেও সেই জৈবিক সত্য বা ইতিহাস তো অস্বীকার করা যাবে না। এ্যাপারথিডের পাগলামিটা তাই একটু ভালো করে দেখলেই ধরা পড়বে।"

"কেমন?"

"যেমন ধরো কালার্ড বা মিশ্র জাতি। এদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ, একশোজনে নজন, যেখানে সাদা সতেরো জন, এশিয়ান তিনজন। এদের মধ্যে অনেককেই দেখবে সাদাদের থেকেও সাদা। তারপর উল্টো ঘটনাও ঘটে। হয়তো হঠাৎ লিলি হোয়াইট পরিবারেও জন্মালো এক কালচে বাচ্চা। কোন 'জিন' কোথায় মিশে কখন কি দাঁড়াবে কে বলতে পারে? তখন ওই সাদা পরিবারের কালচে ছেলেটাকে নিয়ে নানা যন্ত্রণা। সরকারী মহল ওকে সাদা পরিচয় দিতে চাইবে না, কিন্তু ও তাহলে যাবে কোথায়? বান্টুস্থানে? এসব আকছার ঘটছে। কোন কোন পরিবার হয়তো বাচ্চটাকে আঁতুড় ঘরেই মেরে ফেলে ভবিষ্যতের যন্ত্রণা কমাবে, কিন্তু অনেকে আবার সেটাও চাইবে না। তারপর, তুমি যতোই ঠেকাও, দৈহিক সম্পর্ক পুরোপুরি বন্ধ হবে না, যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে সেটা বেআইনী, দুজনেরই জেল হতে পারে। ওরা গর্বে অন্ধ হয়ে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে চাইছে। কিন্তু পারবে কেন?"

"এ্যাপারথিডে কাজ কর্মের অসুবিধা হয় না?"

"হবেই তো। দুই জাতির জন্য আলাদা পোস্টম্যান, নার্স, শিক্ষা, হাসপাতালের ব্যবস্থা। হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হবে—হার্ট পাওয়া গেলেও জানতে হবে কালো না সাদা। তুমি দুর্ঘটনায় সমস্ত দেহ কেটেকুটে রাস্তায় পড়ে, এবং হয়তো কালো এ্যাম্বুলেন্সের লোক সামনেই, তবু অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সাদাদের এ্যাম্বুলেন্স আসে—এর মধ্যে রক্ত ঝরে যদি মরে যাও, মরবে। এ তুমি পাগলামি ছাড়া আর কি বলবে বলো!"

এবার নর্মান জিগ্যেস করে, "আচ্ছা, এই যে বয়কট চলছে, ওদের ক্রিকেট-রাগবী এসব অন্য দেশে খেলতে দেবে না, তার কি কোন ফল হচ্ছে?"

"ফল তো হচ্ছেই। দেখছো না ওরা কেমন পাগলের মতো সমস্ত পৃথিবী থেকে কালো খেলোয়াড় যোগাড় করে ওখানে খেলাতে চাইছে—সাউথ আফ্রিকান মানুষ খেলা প্রিয়, খেলেও ভালো। ওদের মনে এই একঘরে হওয়াটা এক বড়ো দাগা দিয়েছে। এই যে বেশ কিছু সাদা মানুষ এখন অন্যভাবে ভাবছে, তার এক বড়ো কারণ এই বয়কট।"

নর্মান বলে, "তবে অর্থনৈতিক বয়কট করা গেল না। বৃটেন বা আমেরিকা সেটা চায় না।

ওদের অনেক টাকা ওখানে খাটছে। তারপর, যুদ্ধনীতির বিচারে, দুই মহাসাগরের সঙ্গমের ওই জায়গাটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। ওরা চায় না ওখানে অন্য কোন ধরনের সরকার আসুক। তাহলে বিশ্ব সম্পর্কের দাবার ঘুঁটি আবার নতুন করে সাজাতে হবে।"

সমুদ্রের গর্জন বাড়ছে বলে মনে হলো। ঢেউগুলো যেন আরো অনেক বড়। সেনেগালের সমুদ্রতটের সেই ঢেউয়ের থেকেও অনেক বড় বলে মনে হয়। একটা বড় তফাৎ অবশ্য এই দুই সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে। সেনেগালের সমুদ্রের উলঙ্গ কালো বাচ্চাগুলো এখানে অনুপস্থিত। এই দ্বীপ যেন আফ্রিকা হয়েও আফ্রিকা না। বা আর একটা দক্ষিণ আফ্রিকা। হয়তো চেষ্টা করলে আমরা সবাই মিলে এই দ্বীপটাকে ঠেলে উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

লিণ্ডা সমুদ্রের দিকে তাকালো। ওর চোখে উদাস দৃষ্টি। এমন ভাসা ভাসা দৃষ্টি এর আগে দেখি নি। কোন প্রাকটিকাল প্রফেশনাল মহিলা সচেতনভাবে ওই চোখ দিয়ে তাকাবে না। হয়তো বা উপকূল ধরে দক্ষিণের অনেক দূরে ওর নিজেব অচ্ছুৎ দেশটা দেখবার চেষ্টা করছে।

"একটা মেয়ের কথা মনে পড়ছে।" লিণ্ডা বলে, "আমার পরিচিত, ডারবান বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তো। একজন কালো ছাত্রের সঙ্গে ওর আলাপ হলো। ওর ভালো লাগলো। কেন মরতে এই রকম উদ্ভট ভালো লাগলো জানি না। কিন্তু সেটাই কাল হলো। বাঁধের ফুটোটা একটু একটু করে বাড়লো, তারপর একদিন সেই ফাটল বড় হয়ে বাঁধটাকেই ধসিয়ে দিল। ওরা দেখা করে লুকিয়েই। খুব অল্পই দেখা হয়। কিন্তু সেই অল্প সময়ের দেখার ঘনত্ব তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। পরিণতি যে ভয়ংকর ওরা জানতো—ওই দেখার মিষ্টতাও ছিল তাই ষোল আনা, পাগল করা। তারপর একদিন···"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিণ্ডা বলে, "তারপর একদিন রাত্রে ছেলেটা ওর বাড়ীতে এলো। ভাগ্যিস ওব বাবা-মা সেদিন অন্য জায়গায় ডিনার খেতে গিয়েছিল। মেয়েটা বললো, তুমি ফিরে যাও—ধরা পড়ে গেলে মুশকিল। ছেলেটা বললো—রাত হয়েছে বলেই যাবার উপায় নেই, পথে পুলিশ ধরবে। সূর্যাস্তের পর কালোদের এখানে থাকা বারণ। আমি লুকিয়ে থাকি তোমার ঘরে, খাটের তলায়, ভোরে কেউ ওঠার আগেই চুপি চুপি পালাবো। সেই মতো সব কিছু হলো। কিন্তু তবু ধরা পড়ে গেল বেরুবার সময়। মেয়েটার বাবার রাইফেলের গুলি ওর গায়ে বিঁধতো, যদি না মেয়েটা ব্যারেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু দারুণ মার খেল, পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো।"

"তারপর।"

"তারপর আর কিছু নেই। ছেলেটা ফিরে এলো না। ওর আত্মীয়রা খোঁজ করতে গিয়ে দেখলো পুলিশ রেকর্ডে ওর নামই নেই। ওই নামে কেউ গ্রেপ্তারই হয় নি। কেউ কেউ বললো, লক-আপেই ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। হয়তো বা। একটা তো মাত্র কালো মানুষ, কার অতো মাথাব্যথা বলো!

ভারী দীর্ঘশ্বাস কানে এলো। আমরা বাকি তিনজন জিগ্যেস করতে পারলাম না মেয়েটির কী হলো, বা লিণ্ডার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয়ের কি সূত্র!

অনেক দূর থেকে সমবেত উল্লাসের আওয়াজ। একটা টেনিশ খেলা শেষ হলো। কেউ জিতলো কেউ হারলো। গেম সেট এ্যাণ্ড ম্যাচ—ওভার।

ডাডলী এসে ডাকলো, "টেবিল-টেনিশ খেলবে?"

ডাডলীর পরনে গেঞ্জী, পাৎলা ট্রাউজার। ও যেন তৈরী হয়েই এসেছে। বালিতে পা ডুবিয়ে আমরা খেললাম। সুবিধে যে জোরে মারলেও বল বেশী দূর যাচ্ছে না। সমুদ্রের গর্জন কানে আসছে। গর্জনের সঙ্গে যেন ডাডলীর তেজও বাড়ছে—কিন্তু বলগুলো ঠিক লাগছে না।

অন্যদিনের মতো সহজে আমাকে হারাতে পারলো না। বোঝা গেল খেলায় ওর মন পুরো নেই। বারবার সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছে।

কয়েক রাউণ্ড খেলে ডাডলী বললো, "চলো একটু হাঁটি।" হাঁটতে হাঁটতে গল্প। টেনিশ কোর্ট, বাস্কেট বল, রিফ্রেশমেন্ট... রিফেকটরী লাউঞ্জ, রঙীন ছাতার ভীড় ছাড়িয়ে ডাডলী অনেক দূরে হেঁটে চললো আমাকে নিয়ে।

দূরে নৌকোর খোলের মধ্যে খালিক, লিণ্ডা, নর্মান, তিন মহাদেশের তিনটি মানুষ তখনো কথা বলছে দেখতে পাচ্ছি। সম্মেলন যেন দূরপাল্লার রেলের গাড়ী, যতক্ষণ একসঙ্গে আছো ততক্ষণ কতো আলাপ গল্প। টার্মিনাসে পৌঁছেই প্লাটফর্মে নেমে সবার ঘর-মুখো মন, ছাড়াছাড়ি, হয়তো আর দেখাই হয় না। এর পরে নর্মানের সঙ্গে বার দুয়েক দেখা হয়েছে, খালিকের সঙ্গে বেশ কয়েকবার, লিণ্ডার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় নি। এখন ওদের শুধু মুখ নাড়া দেখছি—কথা শুনছি না। তারপর মুখও অস্পষ্ট। তারপর তিনজন তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দিগন্তের এক কোণের এক ছোট্ট বিন্দুর মধ্যে ভেসে রইলো ওরা তিনজন আর নৌকোটা।

ডাডলী ততক্ষণে অনেক দূরে দ্বীপের এক কোণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় তিন পাশেই জল। সম্মেলনের মানুষের খেলা আর কথা বলার শব্দ কানে আসছে না। ওদের দেখাও যায় না। ওরাও আমাদের স্পষ্টভাবে দেখবে না। সৈকতের হলুদ বালি আটলান্টিকের নীল গায়ে দাগ কেটে দিয়েছে। আধ পোষা দানবটার ক্রুদ্ধ কানফাটা চিৎকার। বিরাট ঢেউ উত্তাল হয়ে ছুটে আসছে।

ডাডলী বললো "স্নান করবে?"

"স্নান?" অবাক হই, আমি তো তৈরী হয়ে আসি নি। ডাডলীর হয়তো ট্রাউজারের নীচে সুইমিং ট্রাঙ্ক আছে। একটু আফশোসই হলো। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, সুইমিং ট্রাঙ্ক এনেও লাভ কি হতো! যা ঢেউ!

ডাডলী বলে, "সুইমিং ট্রাঙ্ক আনোনি আমিও আনি নি। তাতে কিচ্ছু এসে যাবে না। এখানে কেউ তোমায় দেখবে না।"

ও খুব তাড়াতাড়ি জামা কাপড় খুলতে শুরু করলো। এক মিনিটও লাগলো না ওই বিরাট চেহারার বয়স্ক মানুষটার সম্পূর্ণ নগ্ন হতে। ওর মুখ ভাবলেশহীন। বরং আমিই একটু লজ্জা পেয়ে একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। দ্বীপের ওই নির্জন অংশটায় সত্যিই আমরা ছাড়া কেউ নেই। ট্রাউজারের বেল্টে হাত দিলাম—কিন্তু দীর্ঘদিনের বাঙালী মধ্যবিত্ত সংস্কারের দেওয়াল ভাঙতে পারলাম না। ডাডলীকে বললাম, "আমার স্নান করতে ভালো লাগছে না। একটু মাথা ধরেছে। তুমি যাও। আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি।"

বিকেলের পড়ন্ত রোদে মহাসাগরের ওই রুদ্র রূপ অনন্য। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী ও যেন গলা ফাটিয়ে আমাদের কিছু বলতে চাইছে। সেই ভাষা কি আমরা বুঝছি?

ডাডলী সমুদ্রে নামলো।

কিছুটা এগোবার পর ওর গায়ে আছড়ে পড়লো এক মাঝারি ঢেউ। সেই ঢেউ সামলাতে না সামলাতে এলো আরো বড় মাপের এক ঢেউ। ওই ঢেউয়ের নাগরদোলায় চড়ে গেল আরো বড় ঢেউয়ের রূপালী চূড়ায়। অনায়াসে—সেনেগালের আটলান্টিকের ওই কালো উলঙ্গ বাচ্চাগুলোর মতোই। বৃদ্ধ শিশুর একরাশ পাকা চুল ঢেউয়ের সাদা ফেনায় মিশে গিয়েছে। নীল তরঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে ওর সাদা সোনালী ভারী দেহটা। দূর থেকে মনে হচ্ছে, কোন বড় আকারের মাছ ডিগবাজি খাচ্ছে।